শ্রমিক-শ্রমিক

পৃথিবীর ধনী-দরিদ্রের মাথা পিছু আয়

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

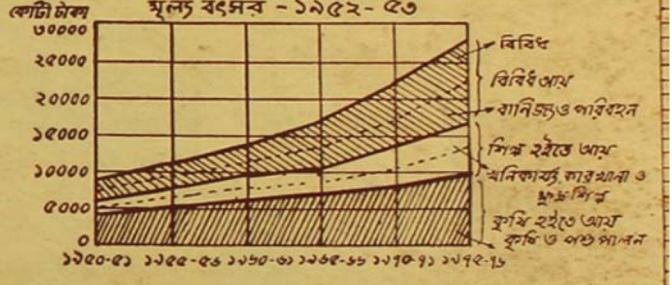

ষষ্ঠ বর্ষ • দ্বিতীয় সংখ্যা] চৈত্র • ১৩৬৩ [মার্চ-এপ্রিল • ১৯৫

লক্ষ্মী ঘি'য়ে
লক্ষ্মীশ্রী

॥ লক্ষ্মীদাস প্রেমজী · কলিকাতা ॥

আর্থিক প্রসঙ্গ

ষষ্ঠ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা

সম্পাদক

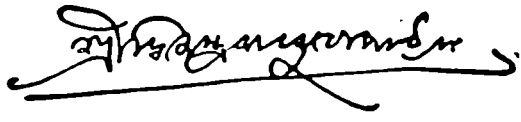

চৈত্র : ১৩৬৩
মার্চ—এপ্রিল : ১৯৫৭

কার্য্যালয় :
২, প্রাইভেট রোড, দমদম, কলিকাতা—২৮
সিটি অফিস
১০৪, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলি-৯

এই সংখ্যার মূল্য দশ আনা

স্থায়িত্বে ও অর্থমূল্যে শ্রেষ্ঠ

লিলুয়া ও স্যাটলস

ব্রাইটেক্স

ড্যাজ্‌ল প্রোডাক্টস্ লিঃ

১৩৮, কার্নিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

- WATER PROOF
- SHOCK PROOF
- ANTIMAGNETIC
- UNBREAKABLE MAIN SPRING
- CHROME-STEEL BACK CASE

JEWELLED-LEVER

PHONE : 22-6036

একমাত্র পরিবেশক

ইম্পিরিয়াল ওয়াচ কোং

১৫৪, রাধাবাজার ষ্ট্রীট • কলিকাতা • ১

সৌন্দর্য্যে ও সংরক্ষণে
ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেণ্ট য়্যাণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা : আসানসোল : শিলিগুড়ি : মাদ্রাজ

আর্থিক প্রসঙ্গ

ষষ্ঠ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা]

সূচীপত্র

[চৈত্র, ১৩৬৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাল-তামামি	১০১
এবারের বাজেট	১০২
দ্বিতীয় পরিকল্পনা ও বেসরকারী ক্ষেত্র	১০৫
পয়সার হৃতমানের পুনরুদ্ধার—শ্রীপিতাম্বর পন্থ	১০৮
সম্পদ ও সভ্যতা—ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ	১০৯
চিনি রপ্তানি	১১২
অনুন্নত অর্থনীতিতে জাতীয় আয় নির্ধারণে কয়েকটি সমস্যা—অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়তোষ মৈত্রের	১১৩
বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে অর্থনীতিক অগ্রগতির সমস্যা—ডাঃ আর্থার রবার্ট বার্ণস	১১৫
ভারতীয় অর্থনীতিতে কুসংস্কার—অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়জীবন বসু	১১৯
ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অ, আ, ক, খ—শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ	১২৬
সংগ্রাম—স্বাধীনতা—গণতন্ত্র—উড়োপাখী	১৩৫
মূলধনজাত লাভকর—শ্রীঅচ্যুতকুমার ভট্টাচার্য	১৪১
সেলস্‌ম্যান কে?—শ্রীকুমারেশ ঘোষ	১৪৩
আর্থিক দিকদর্শন—তথ্যসেবী	১৪৮
গ্রন্থ পরিচয়	১৫০
আর্থিক সংবাদ	১৫২
ছোট কয়লাখনি সমূহের একত্রীকরণ	১৫৪

১০'র বদলে ১৫

২০ র বদলে ৩০

হ্যাঁ, যাদুকরের কৌশল ছাড়াও এ সম্ভব হ'তে পারে। আজ আপনি জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেটে দশ টাকা খাটালে বার বছর পরে পনের টাকা পাবেন। আপনার টাকা নিরাপদে থাকবে, এবং সুদের জন্যে সরকার দায়ী থাকবেন।

• দ্বিগুণ লাভ

পাঁচশালা পরিকল্পনার নানা প্রচেষ্টা গড়ে তোলা এবং সমগ্র দেশের জনসাধারণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের কাজে আপনার সঞ্চয়কে লাগানো হবে। সুদ পাওয়া ছাড়াও আপনি হবেন দেশের বর্ধমান সমৃদ্ধির অংশীদার এবং সাহায্য করবেন

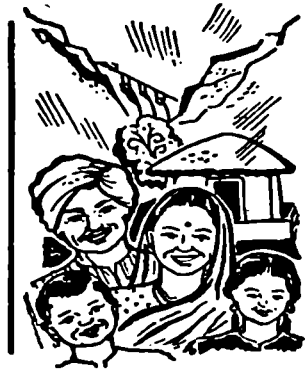

নতুন ভারত গড়ার কাজে।

এইভাবে টাকা খাটানোর সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ এবং/অথবা নিয়মাদি জানতে হ'লে অনুগ্রহ করে ন্যাশনাল সেভিংস কমিশনার, সিমলা, অথবা আপনার রাজ্যের রিজিওন্যাল ন্যাশনাল সেভিংস অফিসারকে লিখুন।

DA 56/161

আর্থিক প্রসঙ্গ

ষষ্ঠ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা] [চৈত্র, ১৩৬৩

সাল-তামামি

৩০শে চৈত্র আমাদের চল্‌তি বৎসরের অবসান ঘটিল। বিদায়ী বৎসর কোন কথা না বলিয়া, কোন অভিযোগ না করিয়া, কোন দাবী না রাখিয়া যেমন নীরবে, নিস্তব্ধে আসিয়াছিল তেমনি নীরবে সকলের অজ্ঞাতে বিদায় লইল। দীর্ঘ ৩৬৫ দিনের দুঃখ-সুখ, অভাব-অভিযোগ, কর্ম ক্লান্তি কখনও-বা বিলাস-আড়ম্বরের আতিশয্য, ধনাঢ্যের মদমত্ত অহংকার সব কিছুই বর্ষশেষের শেষ দিনের নিশীথ রাত্রে নিবিড় অন্ধকারের অতল গহ্বরে আশ্রয় লইল তাহা কেহ জানিতেও পারিল না।

নব বৎসর কি প্রতিশ্রুতি, কত আশা-আকাঙ্ক্ষা কি সম্ভাবনার সমৃদ্ধি বহন করিয়া আনিয়াছিল তাহা আজ মনে নাই! বিস্মরণের অধ্যায়ে অনেকগুলি অবলুপ্তি লাভ করিয়াছে এবং কতকগুলি হয়তো স্মৃতির পাতায় এমন স্বাক্ষর রাখিয়া গেল যাহা হয়তো বর্ষ-বর্ষান্তের বিবর্তনেও মুছিয়া যাইবে না। প্রতি বৎসরের কাহিনী এমনি দুঃখ-সুখের কান্ত-ক্লিষ্ট মানুষের নির্মম কাহিনী! বৎসরের শেষ দিনে সেই জন্যই যখন সমগ্র বৎসরের একটা হিসাব-নিকাশ করিতে মন উন্মুখ হইয়া উঠে—কি পাইলাম, কতখানি পাইলাম, কি হারাইলাম—কতটুকু হারাইলাম; পাওনা গণ্ডার পুরোপুরি পাইলাম, কি না, আর কতটুকুই-বা জের রহিল তাহার সাল-তামামি করিতে গিয়া মন কখন কখন বলিতে চায় "হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজী"। কিন্তু মন যাহাই বলুক বাস্তব জগতের ঘটনা সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে নিষ্ঠুর সত্যকে স্বীকার করিতেই হইবে। যাহাদের হারাইয়াছি, আর কখনও পাইব না, ইহাও যেমন সত্যি, তেমনি যাহাদের পাইয়াছি তাহাদের ঘটনা বিবর্তনে নিশ্চিতই হারাইতে হইবে ইহাও তেমনি সত্যি।

• • • •

আমরা বাঙ্গালী—আমরা ভারতবাসী! বাঙ্গালী হিসাবে বাংলা বৎসরের শেষ দিনে নূতন হিসাবের খতিয়ানে জের টানিতে হইবে। বিদায়ী বর্ষ একটি বৎসরের মধ্যে কত না পরিবর্তনই আনিয়াছে। নূতন বৎসর সুরু হইবার পূর্বে আমরা নয়া পয়সার নূতন খেলা দেখিতে অভ্যস্ত হইতেছি। শুনিতেছি যাহা এতদিন নিতান্ত পুরাতন ছিল, যাহার সহিত আমরা বংশ পরম্পরায় লেনদেন করিয়াছি তাহা আজ বিদায় লইয়া নয়া পথের খেই ধরাইয়া দিল। আমরাও আজ নূতনের প্রত্যাশী। তাহার চেয়েও সত্য নয়া-পিপাসু। নয়া দিল্লী হইতে নয়া পয়সা, নয়া ওজন, নয়া মন্ত্রীসভা, নয়া আইন-সভা এমনি আরো কত 'নয়া' আগামী বৎসরে আবির্ভাব হইবে!

এই বৎসরে দ্বিতীয় পরিকল্পনার একটি বৎসর সমাপ্ত হইল। পরিকল্পনার বিভিন্ন দিকে যেমন অগ্রগতি হইয়াছে, তেমনি বিভিন্ন দিকে কর-বৃদ্ধি, মুদ্রা স্ফীতি সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রাকে ব্যতিব্যস্ত ও বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। একদিকে যেমন শিল্পোন্নতি, কৃষি-শিল্পের উপাদন বৃদ্ধি ও কুটির শিল্পের পুনরুদ্ধার ও সম্প্রসারণ, ভূমি-সংস্কার, পথ-ঘাট নির্মাণ, সমবায় উদ্যোগের প্রসার,

অন্যদিকে তেমনি বিরাট বিশাল জলাধার নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, জলসেচের উন্নতি প্রভৃতি সামগ্রিক উন্নয়নের একটা বিরাট প্রচেষ্টা। দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছে অন্যদিকে ভয়াবহ বেকার সমস্যা, শিক্ষার অভাব, নিরক্ষরতা, রোগ ব্যাধি-দারিদ্র্য সমাজের বিভিন্ন অঙ্গে ক্ষতের ন্যায় জীর্ণ করিয়া তুলিতেছে। মানুষের জীবন যাত্রার সহজলভ্য উপকরণগুলি যেন ক্রমশঃই দুর্লভ ও দুর্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। পথের ভিখারী আজও নিরন্ন-নিরাশ্রয় হইয়া পাদপথে মৃত্যুবরণ করিতেছে। বিরাট অগ্রগতি ও সম্ভাবনার মধ্যেও সাধারণ মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবার সময় পাইতেছে না। তাহারা অনাগত ভবিষ্যতের অনিশ্চিত সম্ভাবনার দিকে আজও চাহিয়া আছে, কবে তাহারা মানুষের মর্যাদা পাইবে? সেই আশ্বাসেই ও এমনি বিশ্বাসেই হয়তো বলিতেছে, "We shall sing, sweetness, to the last palpitations of the evening and the breeze." এত দুঃখ-সুখের মধ্যে সাধারণ মানুষ যে বাঁচিয়া আছে ইহাই তাহার একমাত্র অবলম্বন।

বৎসরের শেষ দিনে একান্ত মনে আশা করি চিরলাঞ্ছিত মানুষের যেন সুদিন আসে, পথের মানুষ যেন মনুষ্যত্ব ফিরিয়া পায়, যেন আশ্রয়-হারা না হইয়া মৃত্যুর দিকে পরিচালিত না হয়। নিভৃত অন্তরালে মানুষটিও যেন কক্ষচ্যুত না হইয়া দুয়ার বাহিরে আসিয়া পথের ভিখারী না হয়! উপরের তলার মানুষ নীচের তলার লোকটিকে অবহেলা উপেক্ষা ভরে পদদলিত না করে। স্নেহ-করুণা, দয়া-মায়া, শ্রদ্ধা-প্রীতির অচ্ছেদ্য বন্ধনে মানব সমাজের অন্তর্নিহিত ঐক্যতানের সুরটি আবার যেন বাজিয়া উঠে ঈশ্বরের পরম করুণা ধারায়!

এবারের বাজেট

নির্বাচনের যবনিকা-পতন হইতে না হইতেই নূতন বাজেটের সময় আসিয়া পড়িল। এদিকে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন না হওয়ায় স্বল্পমেয়াদী বাজেট বরাদ্দ করিয়াই কাজ চালাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। তাই কয়েক মাসের মত এই বাজেটের পরমায়ু। সেইজন্যই এই বাজেটে বিষ নাই, দাঁত নাই, কামড় নাই, এমন কি থাবা মারিবার নখর নাই। ভারতীয় কৃষ্ণ বাজেট উত্থাপন করিতে গিয়া গাহিয়াছিলেন, মনে পড়ে—

দেরি করিব না মিছে
ফিরে চাহিব না পিছে
দিন শেষে বিদায়ের ক্ষণে।

তিনি নির্বাচনে জিতিয়াছেন। ভয়-ভাবনা ছিল কিনা তিনিই বলিতে পারেন। বোধ হয়, সেইজন্যই গত ডিসেম্বর জানুয়ারী মাসে তিনি করবৃদ্ধি, মুনাফা প্রত্যর্পন ও সঞ্চয় তহবিলের উপর টান দিয়াছিলেন। তখনকার সুরটি ছিল—

আজিকার দিন না ফুরাতে
হবে মোর এ আশা পূরাতে
শুধু এবারের মতো
বসন্তের ফুল যত
যাবো মোরা (সকলে) কুড়াতে।

তাহার নির্বাচনী এলাকায় বলিয়াছিলেন—

তোমার কানন তলে ফাল্গুন আসিবে বারম্বার
তাহারি একটি শুধু মাগি আমি দুয়ারে তোমার।

তিনি অবশেষে জিতিয়াছেন। কিন্তু মন্ত্রীসভা তো হয় নাই। সুতরাং এই বাজেটেও ক্ষান্ত থাকিতে হয়। তাই এবারের বাজেট একেবারে গতানুগতিক, প্রাণহীন। সংসদ-সদস্যদেরও এবারে তেমন জৌলস নাই। বিরোধীদলও তেমন জোর পান নাই। কেন্দ্রীয় বাজেটের এবারে কোন কর ধার্যের প্রস্তাব করা হয় নাই—

১৯৫৭-৫৮ সালে রাজস্ব খাতে ২৬ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি—অর্থমন্ত্রী যে আয় ব্যয়ের বরাদ্দ পেশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৫৭-৫৮ সালে ভারত সরকারের রাজস্ব খাতে আয় হইবে ৬৩১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হইতে ৬৬৩ কোটি ৯ লক্ষ টাকা। ইহার ফলে রাজস্ব খাতে ২৬ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে। সর্বসাকুল্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ৩৬৫ কোটি টাকা।

১৯৫৬-৫৭ সালে ৩৭ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত—১৯৫৬-৫৭ সালের বাজেট এবং ১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেট বরাদ্দের পর্যালোচনা করিয়া অর্থমন্ত্রী বলেন, চলতি বৎসরে ভারত সরকারের রাজস্ব খাতে ৩৭ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। চলতি বৎসরের বাজেটে ১৮ কোটি ৪ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া দেখান হইয়াছিল। রাজস্ব আদায়ের উন্নতি এবং চলতি বৎসরে সুতী বস্ত্রের উপর অতিরিক্ত শুল্ক ধার্যের ফলেই প্রধানতঃ এই উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ব্যয় ৪১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি—অর্থমন্ত্রী অনুমান করেন যে, ১৯৫৭-৫৮ সালের মোট ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ব্যয় দাঁড়াইবে ২৫২ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা এবং অসামরিক খাতে ব্যয় হইবে ৩৭২ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য ব্যয়ের পরিমাণ ৪৪ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইবে। স্থলবাহিনী এবং বিমান বহরের জন্য অত্যাবশ্যক সাজসরঞ্জাম ক্রয়হেতু প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে।

অসামরিক ব্যয় বৃদ্ধি—১৯৫৭-৫৮ সালে অসামরিক ব্যয় চলতি বৎসরের সংশোধিত হিসাবের তুলনায় ৩১ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইবে। সমাজ উন্নয়ন এবং জাতি গঠনমূলক প্রচেষ্টাসমূহের জন্যই প্রধানতঃ এই অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হইবে। এবারকার বাজেটেও কয়েকটি সঙ্কট ও শঙ্কার কথাও বলা হইয়াছে। যথা—

(১) ঘাটতির ভয় দেখান হইয়াছে ৩৬৫ কোটি টাকার মত। (২) প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইতে ২৫২ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। (৩) বৈদেশিক মুদ্রার অবস্থা সঙ্কটজনক। রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানী হ্রাস সম্পর্কে কঠোর ইঙ্গিত আছে। গত বৎসর ২৬০ কোটি টাকার মত অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে। এখন আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে।

(৪) মূলধন খাতে ব্যয়—আগামী বৎসরের বাজেটে মূলধন খাতে ব্যয় এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে ঋণ দান বাবদ মোট ৭৭২ কোটি ২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। চলতি বৎসরে এই বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৬৩৬ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। ইস্পাত কারখানা এবং রেলওয়ের জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে; এই কারণে এই বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। (৫) ঘাটতি পূরণের জন্য অর্থসংগ্রহের উৎস নির্দেশ:—আগামী বৎসর বাজার হইতে ১০০ কোটি টাকা ঋণ, স্বল্প

সঞ্চয় বাবদ ৮০ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য বাবদ ১৩৫ কোটি টাকা এবং অন্যান্য বিবিধ খাতে ১১৯ কোটি টাকা সংগৃহীত হইবে। এই সকল হিসাব ধরিয়াও মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ৩৬৫ কোটি টাকা।

আয় ও ব্যয়বরাদ্দের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধানের মধ্যে যে ৩১৫ কোটি টাকা ঘাটতির হিসাব দেখানো হইয়াছে, তাহা পূরণের বা হ্রাসের কোন নির্দেশ নাই। বোধ হয় যাহা বলা উচিত ছিল তাহার সময় এখনও আসে নাই বলিয়া চাপিয়া যাওয়া। অর্থাৎ মে মাসে যখন নূতন মন্ত্রীসভার নূতন বাজেট আসিবে। তখন করধার্য শুল্ক বৃদ্ধি ইত্যাদি জাতীয় নখর-প্রয়োগ দর্শন, ছোবল ইত্যাদি বসাইলেই চলিবে। তাহা ছাড়া নোট ছাপান ব্যতীত গত্যন্তর নাই। তাহাও যেন বলা নিরাপদ নয়!

রেল বাজেট—রেল মন্ত্রী শ্রীজগজীবনরাম রেলবাজেট পেশ করিয়াছেন। উহাতে ১৯৫৭-৫৮ সালে রেলওয়েসমূহের পরিবহন বাবদ মোট আয় ৩৬৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে ৩৫০ কোটি টাকা আয় হইয়াছে; সুতরাং ১৯৫৭-৫৮ সালে ১৯৫৬-৫৭ সাল অপেক্ষা ১৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অধিক আয় হইবে। ১৯৫৭-৫৮ সালে রেলওয়েসমূহের আয় হইতে সাধারণ রাজস্ব ভাণ্ডারে লভ্যাংশ স্বরূপ ৪৩ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী চলতি বৎসরে ৩৭ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা দেয়। সাধারণ রাজস্ব ভাণ্ডারে লভ্যাংশ দেওয়ার পর ১৯৫৭-৫৮ সালে ২১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহা উন্নয়ন তহবিলে জমা করার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

যাত্রী ভাড়ার হার অপরিবর্তিত—রেলওয়ে মন্ত্রী তাঁহার ক্ষুদ্র বক্তৃতায় যাত্রীদের ভাড়ার হার পরিবর্তনের কোন প্রস্তাব করেন নাই; কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যে, আগামী মে মাসে তিনি যখন নূতন সংসদে আসিবেন তখন মালের ভাড়ার হারের পরিবর্তন করা হইবে।

একনজরে রেলওয়ে বাজেট

কোটী টাকার হিসাবে

	১৯৫৫-৫৬ চূড়ান্ত হিসাব	১৯৫৬-৫৭ প্রাথমিক অনুমান	১৯৫৬-৫৭ সংশোধিত হিসাব	১৯৫৭-৫৮ প্রাথমিক অনুমান
ট্রাফিক বাবদ মোট আয়	৩১৬·২৯	৩৩৫·০০	৩৫০·০০	৩৬৮·৫০
পরিচালনা ব্যয়	২১৩·২২	২২৪·৩০	২২৯·৩৪	২২৪·১৬
বিবিধ খাতে নীট খরচ	৭·৭৩	১৩·০৪	১১·০২	১৪·১২
ক্ষয় পূরণ ভাণ্ডারে জমা	৪৫·০০	৪৫·০০	৪৫·০০	৪৫·০০
মোট	২৬৫·৯৫	২৮২·৩৫	২৮৫·৩৬	৩০৩·২৮
রেলওয়ে নীট আয়	৫০·৩৪	৬২·৬৬	৬৪·৬৪	৬৫·২২
সাধারণ বাজেটে জমা	৩৮·১২	৩৯·৬৭	৩৭·৬৯	৪৩·৭৯
নীট উদ্বৃত্ত	১৪·২২	২২·৯৯	২৬·৯৫	২১·৪৩

এবারকার রেল বাজেটে ৩৬৮·০ কোটি টাকা মোট আয় এবং ২৫৮·২৮ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে। উহা ছাড়াও মূল্যাপচয় ব্যতীত ৪৫ কোটি টাকা ভারত সরকারকে দেয় লভ্যাংশ বাবদ ৪৩·৭৯ কোটি বাদ দিয়া ২১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত তহবিলে রাখা হইবে। আলোচ্য বাজেটেও যাত্রীভাড়া বা মাশুল বৃদ্ধির কোন হুমকী নাই। গতানুগতিকতা রক্ষা করিয়া রেলে যাত্রীসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান ও কর্মচারীদের বিবিধ সুখ সুবিধার কথা বলা হইয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বর্তমান বাজেট আসল বাজেট নয় এবং তাহা ছাড়া ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধির সম্ভাবনা এখনও মুদালিয়ার কমিটির রিপোর্টের সুপারিশক্রমে যে নিশ্চিত এবং আগামী মে মাসের বাজেট অধিবেশনেই যে উহা আলোচিত হইবে তাহার ইঙ্গিত তিনি স্পষ্ট ভাষাতেই জানাইয়াছেন।

ভারতের রেলপথ পৃথকভাবে পরিচালিত হইলেও সরকারী ক্ষেত্রে জাতীয় সরকারের একটি সমৃদ্ধ সংস্থা। ইহার সমাক সমৃদ্ধি, সুষ্ঠু পরিচালনা, পরিবহণের ক্ষেত্রে যথাযোগ্য দক্ষতা, জাতির অভ্যুন্নতির পরিচায়ক। যুদ্ধোত্তর কালে ভারতীয় রেলপথের যে অবনতি দেখা গিয়াছিল, প্রথম পরিকল্পনার প্রাক্কালে যে গতিশীলতার অভাব দেখা গিয়াছিল, রেল কর্তৃপক্ষ ধীরে ধীরে সেই অনড়, অসাড় অবস্থার অবসান করিয়া যে ক্রমোন্নতির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাহারা অভিনন্দনযোগ্য! দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রেল কর্তৃপক্ষের উপর গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করা হইয়াছে তাহার সম্পাদনের উপরই শুধু রেলপথের নহে, সমগ্র ভারতের অর্থ নৈতিক, বৈপ্লবিক উন্নতি ও অগ্রগতির মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। আমরা আশা করি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে সমাক অবহিত।

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও কয়েক মাসের জন্য একটি বাজেট উপস্থাপিত করিয়াছেন। ১৯৫৬-৫৭ সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রতি সমর্থন জানাইয়া মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বলেন যে বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী অতিরিক্ত ব্যয় অপরিহার্য। শিক্ষা ও কৃষিখাতে তাহাদিগের সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যয় হয়। সর্বাধিক অর্থ ব্যয় হয় শিক্ষা খাতে। শিক্ষকদের চাকুরীর অবস্থার উন্নয়ন এবং সর্বার্থসাধক বিদ্যালয় স্থাপনে এই অর্থ ব্যয় হয়। কেন্দ্রীয় সরকার গত জুন মাসে রাজ্য সরকারকে এই সর্তে অর্থ মঞ্জুর করেন যে, ব্যয়ের কিছু অংশ রাজ্য সরকারকে বহন করিতে হইবে। অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিতে হয়। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদত্ত ঐ মঞ্জুরী তাঁহারা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না। রাজ্যে জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাঁহারা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাজেট তৈরী হওয়ার পরে জানুয়ারী মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ফার্টিলাইজারের জন্যও ঐ সর্তে অর্থ মঞ্জুরীর প্রস্তাব আসে। কেন্দ্রীয় সরকারের উপর যতদিন তাঁহার সাহায্য ঋণ মঞ্জুরীর ব্যাপারে নির্ভরশীল থাকিবেন ততদিন তাঁহাদিগকে একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পাইতে হইবে। ডাঃ রায়ের পূর্বে কংগ্রেস ও বিরোধী পক্ষে মোট ১৬ জন সদস্য বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন এবং ডাঃ রায়ের বক্তৃতাশেষে সকল ছাঁটাই প্রস্তাব বাতিল করিয়া ১৮,৩১,০৬,৮০০৲ টাকা ব্যয় বিনাভিভিসনে মঞ্জুর হইয়া যায়। এ বাজেটও নিতান্ত কয়েক মাসের জন্য এবং জুন মাসে নবগঠিত নবগঠিত মন্ত্রীসভা নূতন বাজেটে প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিবেন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা ও বেসরকারী ক্ষেত্র

ভারতের সম্প্রসারণশীল অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারী উদ্যোগের স্থান কি এবং কোথায় এবং পরিকল্পনার অগ্রগতি ও সাফল্য ইহাদের অবদান কিভাবে স্বীকৃত হইবে, তাহা লইয়া বেসরকারী শিল্প-উদ্যোগের ভাবনা চিন্তার সীমা নাই। টাটা, বিড়লা, সিংহনিয়া, ডালমিয়া এপর্যন্ত যেভাবে শিল্প গঠনের ধারা অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে তাহারা মাঝে মাঝে বাধা ও অন্তরায় উপলব্ধি করিতেছেন এবং স্বাভাবিকতার পথে ব্যতিক্রমও লক্ষ্য

করিতেছেন। মাঝে মাঝে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মহলের বক্তৃতা মারফৎ আসল কথা ফাঁস করিয়া লইবার চেষ্টাও কম করিতেছেন না। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সুস্পষ্ট মনোভাব প্রায় এই সুরে সর্বদা সর্বত্র ধ্বনিত-রণিত হইতেছে। গত একমাসে পণ্ডিত নেহেরু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী বিভিন্ন সময়ে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে বেসরকারী ক্ষেত্রের মনোভাব ও সরকারী পক্ষের চিন্তাধারার একটা সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে।

সম্প্রতি লোকসভায় অন্তর্বর্তী বাজেট সম্পর্কিত সাধারণ আলোচনার উত্তরদানকালে অর্থমন্ত্রী শ্রী টি, টি, কৃষ্ণমাচারী সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, **যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে দেশের বৈষয়িক সম্পদ সংহত করার প্রয়োজন হইলেও দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার ব্যয় সঙ্কোচ করা হইবে না। তিনি বলেন যে, পরিকল্পনা রূপায়ণকল্পে দেশবাসীর যাবতীয় প্রচেষ্টা ও সম্পদ সংগ্রহে সরকারী কর্মকৌশল কাজে লাগাইতে কোনরূপ কুণ্ঠা করা হইবে না।**

"আমরা পরিকল্পনা আঁকড়াইয়া থাকিব। যদি তাহাতে আমরা বিফল হই, তাহা হইলে আমাদের পতন ঘটিবে। কিন্তু আমরা বিফল হইব না। আমরা পরিকল্পনা সফল করিবই। পাঁচশালা পরিকল্পনার সার্থকতার বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, ইহাতে দেশ বৈষয়িক ও প্রতিরক্ষা—উভয় দিক হইতে লাভবান হইবে। দেশে যদি কোন গুরুভার যন্ত্র নির্মাণ কারখানা ও যথেষ্ট পরিমাণ ইস্পাত তৈয়ারীর ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে ট্যাঙ্ক ও বিমান নির্মাণ করা যাইত।"

ভারতীয় বণিক সভার সভাপতি শ্রী কে, পি, গোয়েঙ্কার পক্ষ হইতে আয়োজিত এক সভায় মুখ্যমন্ত্রী সম্বর্ধনা সভায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার সফল রূপায়ণের কাজে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য শিল্পপতিগণকে আহ্বান জানাইয়া বক্তৃতা করেন। দ্বিতীয় পঁচসালা পরিকল্পনা কার্যকরী করার ব্যাপারে সরকারী ও বেসরকারী শিল্প সহযোগিতার ভিত্তিতে অগ্রসর হউক—সরকার ইহাই চাহেন।

এই দেশের শ্রমিকদের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন করা দরকার। এই দেশের জনসাধারণের শতকরা ৮০ জন দরিদ্র। ইহা স্মরণ রাখিয়া এই দেশের শ্রমিকদের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্য শিল্পপতিদের আগাইয়া আসিতে হইবে। জাপান ভ্রমণের উল্লেখ করিয়া ডাঃ রায় বলেন, তথায় তিনি শ্রমিকদের দশ হইতে বার ঘণ্টা করিয়া দৈনিক কাজ করিতে দেখিয়াছেন। জাপানের শ্রমিকরা নিজেদের কারখানার অঙ্গ বলিয়া মনে করে এবং জাপানের অগ্রগতির জন্য শিল্পপতিদের সঙ্গে তাহাদের সহযোগিতা একান্ত মূল্যবান বলিয়া মনে করে। এখানকার শ্রমিকগণের মধ্যেও এমন একটা মনোভাবের সঞ্চার করা দরকার, যাহাতে তাহারাও মনে করিতে পারে যে, দেশের অগ্রগতির ব্যাপারে তাহাদের উদ্যম বিশেষ মূল্যবান।

জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার কাজে শিল্পপতিদের ব্রতী হইতে হইবে। জনসাধারণ হইতে হইবে। জনসাধারণ হইতে তাঁহাদের দূরে থাকিলে চলিবে না। দেহের কোন অংশ যদি দুর্বল হইয়া পড়ে, তবে সমগ্র শরীরের উপর উহার ফল দেখা দেয়। পাঁচসালা পরিকল্পনার উল্লেখ করিয়া স্বাধীনতার পূর্বে কোন ব্যাপারে উপযুক্ত পরিকল্পনা বিনাই কাজ হইত। স্বাধীনতা লাভের পর এই দেশ উহার অগ্রগতির জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হইয়াছে। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির উন্নয়নের জন্য উভয়ের মধ্যে সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে ৩ লক্ষ ৪০ হাজার ছোটখাট শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে। ঐ শিল্পগুলিতে সাড়ে নয় লক্ষ লোক কাজ করে।

বৃহৎ শিল্পগুলির সম্প্রসারণের ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে গিয়া ঐসব লোকের কর্মসংস্থানের প্রশ্ন যেন তাঁহাদের লক্ষ্যচ্যুত না হয়।

সম্প্রতি ভারতীয় শিল্প ও বণিকসংঘের বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীনেহেরু যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা সকলের সংশয় ও সন্দেহ দূর করিবে বলিয়া আমরা আশা করি। —প্রাদেশিকতা বা ভাষার প্রশ্ন লইয়া অথবা স্বাধীন শিল্প প্রচেষ্টা বনাম সমাজতন্ত্র সম্পর্কে "খুব বেশী তর্ক" না করিয়া দেশের সমস্যাবলী সমাধানে সর্বশক্তি নিয়োগের জন্য প্রধানমন্ত্রী নেহেরু ভারতীয় শিল্প ও বণিকসভা সংঘের বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে সকলের প্রতি আবেদন জানান। "এক মহান দেশের অধিবাসী আমরা। ঘরে-বাইরে যে পরিস্থিতিরই উদ্ভব হউক না, তাহাতে আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ আমি দেখি না।" "আমরা এক দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছি, যাহাই ঘটুক না কেন তাহা আমরা পালন করিয়া যাইব।" প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নিকট হইতে এদেশ শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে, বটে, এদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি নির্বাচনের সময় দেখিতে হইবে, উহা যেন এদেশের পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

শ্রীনেহরু শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণকে বলেন, যখন আমাকে বেসরকারী শিল্পপ্রচেষ্টার কথা বলা হয় তখন আমার মনে হয় যে, উহার মধ্যে কিছু সত্য আছে কিন্তু সেইসঙ্গে আমার আরও মনে হয় যে, সকলে যাহা বলে, তাহার মধ্যে বহু ভ্রান্তিও আছে। এই ভ্রান্তিটি হইতেছে এই যে, আপনারা উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তধারার সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইতে পারিতেছেন না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যে দেশের ভিত্তি শিথিল হইয়া যায় তাহার উন্নতি হয় না, ক্রমশঃ উহার বিলুপ্তি ঘটে। আমি এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে, আমরা অনমনীয় নহি অথবা আমাদের কোন গোঁড়ামিও নাই।

আমরা এক সঙ্কটজনক অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছি। আমাদিগকে একধরণের অনুন্নত অর্থনীতিকে উন্নত করিতে হইতেছে। এই সময়টা খুবই অসুবিধাজনক। ইহার জন্য কাহাকেও না কাহাকে মূল্য দিতে হইবে। অবশ্য সমগ্র দেশকেই ইহার জন্য মূল্য দিতে হইবে, তবে প্রশ্ন হইতেছে দায়িত্ব কিভাবে বণ্টন করা হইবে। সরকারকে এই বিষয়ই বিবেচনা করিতে হইবে। করের বোঝা সম্পর্কে আপনারা যে অভিযোগ করেন তাহাতে যুক্তি আছে। ভারতে করের বোঝা যে বেশী তাহা সত্য। কিন্তু দেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোকের করভারও বেশী এবং দেশের ভাগ্য নির্ধারণে এই ৮০ ভাগের মতামত অত্যন্ত শক্তিশালী। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে অগ্রগতির একটি পথ আমরা গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ইহা মোটামুটিভাবে বর্ণিত আছে। এই পরিকল্পনা অপরিবর্তনীয় নহে। প্রয়োজন হইলে উহার পরিবর্তন করা হইবে। সুতরাং অতিমাত্রায় যুক্তিতর্কের আশ্রয় না লইয়া সেই পথেই আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত।

উক্ত সংঘের বিদায়ী সভাপতি শ্রীলক্ষ্মীপৎ সিংহানিয়ার অভিভাষণে যে মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে তাহার উত্তরেই শ্রীনেহেরু উপরোক্ত মন্তব্য করিয়াছিলেন। আমরা শ্রীসিংহানিয়ার মনোভাব নিম্নে দিলাম। গত ১০ মাসকালের মধ্যে এদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি, শিল্পব্যবসায়ীদের কার্যকরী মূলধনের অভাব, বিদেশী মুদ্রার অনটন ইত্যাদি যেসব সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, শ্রী সিংহানিয়া তাহার সুনিপুণভাবে আলোচনা করিয়া গবর্ণমেণ্টের ট্যাক্স নীতি, টাকা পয়সার লেনদেন সংক্রান্ত নীতি এবং শিল্পবাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ নীতিকে দায়ী করিয়াছেন। তিনি বলেন যে,

"এইসব ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত নীতির ফলে দেশে নূতনভাবে কেহ শিল্পবাণিজ্যের প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইতে উৎসাহবোধ করিতেছে না এবং উহার ফলে দেশে উৎপাদন যেভাবে বর্ধিত হওয়া সম্ভবপর তাহা হইতেছে না। এজন্ত দেশে পণ্যদ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি করিয়া পণ্যমূল্যের গতিরোধ করা যাইতেছে না এবং বিদেশে পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করিয়া বিদেশী মুদ্রা প্রয়োজনানুরূপভাবে সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইতেছে না।"

———

পয়সার হৃত মানের পুনরুদ্ধার

শ্রীপিতাম্বর পন্থ

আমাদের দেশে দশমিক মুদ্রার প্রচলন বিপ্লবরূপে অভিহিত হইবে। এই বিপ্লব সব চেয়ে শান্তিপূর্ণভাবে সাধিত হইতেছে এবং কোনওরূপ মারাত্মক বাগবিতণ্ডার সৃষ্টি হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে, সামান্ত কয়েকটি দেশ ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এই মুদ্রা ইতিমধ্যে চালু হইয়াছে। আজ হইতে ১৫৫ বৎসর পূর্বে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম দশমিক মুদ্রার প্রবর্তন হয়। এই দশমিক মুদ্রা ব্যবহারের মধ্যে একটা আগতিক একত্বের ভাব আছে—ভৌগোলিক, জাতীয়, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কোন সীমারেখাই সেখানে টানা চলে না। গণতান্ত্রিক সমাজে পড়া ও লেখার মত দৈনন্দিন লেনদেনের হিসাব অতি সহজে করিবার মৌলিক ক্ষমতা সকলেরই থাকা দরকার। বর্তমান যুগে লেখা পড়া শিখিবার জন্ত কাহাকেও পেশাদারী পণ্ডিত হইবার প্রয়োজন হয় না। সেই প্রকার দৈনন্দিন লেনদেনের হিসাবের জন্ত কোন ব্যক্তিকেই পেশাদারী হিসাব পরীক্ষক হইবার প্রয়োজন নাই। সহজ লিপি ও ভাষা যেমন নিরক্ষরতা দূরীকরণে খুবই সহায়তা করে সেইরূপ দশমিক প্রথার দ্বারা খুব সহজে হিসাব করা যায়।

বিদ্যালয়ের ছাত্র যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের যে সরল পদ্ধতিগুলি শিক্ষা করে সেগুলি সংখ্যার দশমিক হারের ভিত্তিতে রচিত হইয়াছে এবং সম্পূর্ণাঙ্ক অঙ্কগুলির হিসাবে উহাদের অতি সহজে প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে প্রভূত জটিলতার উদ্ভব হয়। ভগ্নাংশ সূচক সংখ্যাগুলি দশমিক হার হার অনুযায়ী না হয় তাহা হইলে এই জটিলতার হাত এড়ান অসম্ভব। দশমিক প্রথায় ভগ্নাংশও সম্পূর্ণাঙ্কের মত প্রকাশ করা যায়। ফলে এইগুলির হিসাবও অতি সহজে করা যায়। কিন্তু দৈনন্দিন লেনদেন ত সংখ্যার মাধ্যমে হয় না, হয় পরিমাণের ভিত্তিতে—ওজন, দৈর্ঘ্য ও অর্থের পরিমাণ—হয় সম্পূর্ণাঙ্ক না হয় তাহাদের ভগ্নাংশ লইয়াই হিসাব।

সরল হিসাব—দশমিক প্রথায় সহজে হিসাব করা যায় যদি সংখ্যাগুলি দশমিক হারে উল্লেখ করা হয়। যেমন ১০ টাকা ৬ আনা ৫ পাই না লিখিয়া যদি ১০·৪০ টাকা (১০ টাকা ৪০ নয়া পয়সা) লেখা হয় তাহা হইলেই হিসাব সহজে করা যাইবে। দশমিক হারের কোনও রকম পরিবর্তন ঘটাইলেই জটিলতার সৃষ্টি হইবে। ওজন ও মাপ এবং দশমিক মুদ্রা এই সমস্ত পরিমাণই দশমিক হারে ব্যক্ত করিতে হইবে। ফলে বিদ্যালয়ে শেখা সাধারণ গাণিতিক নিয়মগুলির দ্বারা সহজে হিসাব করার ক্ষমতা আপামরসাধারণ লাভ করিতে পারিবে। দশমিক মুদ্রা প্রচলনের সাথে সাথে হিসাবে আনা ও পাইয়ের আনা ও পাইয়ের স্থলে নয়া পয়সা লেখা হইবে। অনেক দিন হইতেই পাই আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারে লাগিতেছে না কারণ বর্তমান পরিস্থিতিতে ইহার মূল্যমান এতই কম যে সামান্ততম লেনদেনেও ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে না। বর্তমানে পয়সাই

(অবশিষ্টাংশ ১৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সম্পদ ও সভ্যতা

ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য

কোন কিছু দেখিলে তাহা স্মরণে থাকে। আরও সত্য ব্যাপার এই যে, যখন কোন চিত্তাকর্ষক বস্তু দৃষ্টিপথে পড়ে, তখন সেই বিষয়ের কথা পূর্বে শোনা থাকিলে তাহা মনে পড়ে। ১৯৫০ সালে আমি রোমে গিয়া কলিসিয়ামের ভগ্নাবশেষ অবলোকন করি। 'গাইড্' আমাকে ও আমার সহধর্মিণীকে ফ্ল্যাভি থিয়েটারের চারদিকে ঘুরাইয়া দেখায় এবং খ্রীষ্টধর্মের প্রথম যুগে রোমান সম্রাট-গণ এবং রোমের পরিষদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও তাঁহাদের পত্নিগণ নিরস্ত্র খৃষ্টান বন্দীদিগকে ক্ষুধার্ত সিংহের মুখে ফেলিয়া দিয়া এবং সিংহের কবলে তাহাদের মৃত্যুযন্ত্রণা সন্দর্শন করিয়া নিরুপম আমোদ উপভোগ করিতেন সেই সব কাহিনী বিবৃত করে। একবার এক কৌতুকজনক ঘটনা ঘটে—এক খৃষ্টান পুরোহিতকে সিংহের মুখে ফেলিয়া দিলেও সিংহটি তাঁহাকে খাইয়া ফেলে নাই বা তাঁহাকে ধরিতে উদ্যত হয় নাই। উহা দেখিয়া সম্রাট বিস্ময়বোধ করেন এবং কি করিয়া এই আশ্চর্যজনক ব্যাপার ঘটিল তাহা পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করেন। পুরোহিত উত্তরে বলেন—"মহারাজ, আমি সিংহকে এই কথা বলি, যদি তুমি আমাকে উদরস্থ করিয়া আনন্দ পাইতে চাও তবে সম্রাট তোমাকে বক্তৃতা দিতে আহ্বান করিবেন।"

ঐ উপলক্ষে সিংহের ভাগ্যে যাহাই ঘটিয়া থাকুক না কেন, রোমের অধিবাসীদের আহারে রুচি কমে নাই বা রুচির তৃপ্তির জন্য খাদ্যাভাবও হয় নাই। সেই রাজা-মহারাজার শাসনকালে রোমের অধিবাসী সংখ্যা ছিল সাত লক্ষ, তখন এক হাজার টনেরও অধিক শস্যবাহী জাহাজে প্রতি বৎসর অধীন দেশ মিশর হইতে ৯০ কোটি পাউণ্ড গম রোমে আমদানি করা হইত। রোমের প্রত্যেক নাগরিক প্রত্যহ ২০ আউন্স করিয়া গম পাইত আর সেই প্রাচীন যুগ হইতে দেশী ও বিদেশী উভয় শ্রেণীর পরস্বাপহারী জমিদারগণ নাইল নদীর উপত্যকার কৃষকদিগকে শোষণ করিত। এই একটি মাত্র কাহিনী শুনিয়া, খ্রীষ্টান যুগের সূত্রপাতে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে, মনের মধ্যে যে ভাবে রেখাপাত হইয়াছে তাহা সহজে বিস্মৃত হইবার নয়।

যদি রাজধানী অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থার নিরাপত্তার জন্য অতীতে দুর্বল জাতিকে জয় করার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে আহার্যবস্তুর সুবাসজনক উপকরণ সন্ধানের জন্য নিশ্চিতই মহান আবিষ্কারের প্রয়োজন হইয়াছিল। মধ্যযুগে ইউরোপের লোকে শীতের প্রারম্ভে গবাদি পশুহত্যা করিয়া মৃতদেহ তুষারের নিম্নে সংরক্ষণ করিত। শীতকালে পশু খাদ্যের অভাব হইলে বাড়তি গো-মহিষকে অনাহারে শীর্ণ হইয়া মরিতে না দিয়া সেগুলিকে হত্যা করিয়া সেগুলির মাংস সংরক্ষিত করা হইত। এইরূপ সংরক্ষিত মাংস অচিরে পচিয়া যাইত। সেই মাংস ভাজিয়া তাহাতে নানাপ্রকার মশলা ও গোলমরিচ না দিলে উহা খাওয়া চলিত না। এইসব মশলা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে ইউরোপে আমদানি হইত। আরবের অধিবাসী এবং ভেনিস ও জেনোয়ার ধনী বণিকগণ এইসব মসলার ব্যবসায় চালাইতেন। স্বভাবতঃই পশ্চিম ইউরোপের লোকে এই একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের কবল হইতে মুক্তি পাইবার জন্য উৎসুক ছিল। স্পেন আরববাসী ও মুরদিগকে দেশে হইতে তাড়াইয়া দেয় এবং কলম্বসের নেতৃত্বে একদল সাহসী নাবিককে একত্র করিয়া ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কারের জন্য আটলান্টিক পাড়ি দিতে উৎসাহিত করে। কিন্তু কলম্বসের

দল আমেরিকা আবিষ্কার করেন। ইহাতে স্পেনের পার্শ্ববর্তী রাজ্য পর্তুগালের মনে ঈর্ষার উদ্রেক হয় এবং সেদেশের অধিবাসী ভাস্কো ডি-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কার করেন।

বর্তমানে আমরা খাদ্যের সহিত যে মশলা খাই তাহার সন্ধান বড় সহজে মিলে নাই। নূতন গোলার্দ্ধে ইউরোপীয় বাসিন্দাদের সুবিধার্থে আফ্রিকা হইতে দাস চালান দেওয়ার ব্যবসায় আরম্ভ হইলে মশলা সন্ধানের কাজ এক প্রকার শেষ হয় এবং এশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চলে ঔপনিবেশিক শাসন প্রবর্তিত হইলে মশলা সন্ধানের কাজ বরাবরের মত শেষ হয়।

বঙ্গদেশে রোমীয় মুদ্রা—বাণিজ্যের প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া শুধু যে অবিমিশ্র মন্দ ঘটিয়াছে তাহা নহে। তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক) নামক স্থানে রোমীয় মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তাম্রলিপ্ত এক সময়ে বন্দর ছিল—সেখানে মৌর্য সাম্রাজ্যের নৌবহর নোঙ্গর করিয়া থাকিত। সেকালের বণিকগণও মনে করিত যে, ভগবান ভূলবশতঃই সুয়েজ যোজক সৃষ্টি করিয়াছেন, এই ভুল মানুষেরই সংশোধন করা উচিত। প্রাচীন ঐতিহাসিক হেরোডোটাস বলেন যে, খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ৬০০ অব্দে নিকোস্ প্রথম নাইল নদী হইতে লোহিত সাগর পর্যন্ত একটি খাল কাটিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ঐ চেষ্টায় এক লক্ষ বিশ হাজার মিশরবাসী প্রাণ হারায়। হেরোডোটাসের সময় হইতে লোকের মনে খাল খননের দুঃসাহস জাগ্রত ছিল; ফার্ডিন্যাণ্ড ডি লেসেপ্‌স্ ১৮৬৯ সালে এই খাল খনন করেন। ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্য ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গ্রীক, রোম্যান ও তুর্কী সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটে, খৃষ্টধর্মের অভ্যুত্থান দেখা দেয়। ইহাদের ইতস্ততঃ গমন এবং রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক দিক দিয়া মুসলীম আরববাসীদের দ্বারা এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানে দখল চলে। যে-সময় লণ্ডনের অস্তিত্ব ছিল না, সে-সময় আলেক-জান্দ্রিয়া সহরে অন্ততঃ দশ লক্ষ লোক বাস করিত। যে-সময়ে লণ্ডনে মাত্র ৩৫ হাজার লোকের বাস, সে সময় করতারের জনসংখ্যা দশ লক্ষ। এইরূপ জনবহুল স্থানগুলি সমৃদ্ধিশালী পণ্য সরবরাহক অঞ্চল ছাড়া রক্ষা করা সম্ভব ছিল না।

ভারত ও চীনের প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তি—জলপথের ব্যবস্থাপনার মানব সাফল্যের সহিত যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল তাহাই ভারত ও চীনের প্রাচীন কৃষি-প্রধান সভ্যতার অর্থনৈতিক ভিত্তি। জলপথের সরকারী পরিচালনার সহিত চাষাবাদ মিলিত হওয়ায় ঐ সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হয়। ভারত ও চীন উভয় দেশেই নৃপতিগণ যথেষ্ট সংখ্যক লোক জড় করিয়া অর্থনীরস জমিতে সেচের জল আনিতেন, স্থায়ীভাবে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতেন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ করিতেন। রাজ-কর্তব্যের এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজা ভগীরথের হিমালয় হইতে গঙ্গাকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বহাইয়া লইয়া যাওয়ার পৌরাণিক কাহিনীর ব্যাখ্যা করিতে হইবে। যখনই রাজা-রাজড়ার ক্ষমতা খর্ব হইয়াছে বা তাঁহারা এই প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইয়াছেন, তখনই জাতি ধ্বংস হইয়াছে, জমিতে শস্য উৎপন্ন হয় নাই এবং দেশটা বাঘাবরের বাসভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই ভারতে প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে এক হাজার কোটী টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে উহা বিস্ময়ের বিষয় নয়।

নব ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনা—নবভারত গঠনে, দামোদর ও মহানদী, কৃষ্ণা ও কুশী, তুঙ্গভদ্রা, চম্বল ও শতদ্রু নদীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বারি বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে প্রচেষ্টা চলিয়াছে

তাহাতে প্রাণে আশা ও প্রেরণার সঞ্চার হয় এবং এই প্রচেষ্টা সফল হইলে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্থায়িত্ব লাভ করিবে এবং সম্প্রসারিত হইবে বলিয়া মনে হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমৃদ্ধি—তিন শত বৎসর পূর্বে যখন অভিযাত্রী দল বেষ্টন নগরের নিকটে গিয়া পৌছেন তখন মেক্সিকোর উর্ধে সমগ্র উত্তর আমেরিকা বিশাল জঙ্গলাকীর্ণ ছিল—সেখানে কয়েক লক্ষ অধিবাসী শোচনীয় অবস্থায় কালাতিপাত করিত। জীবজন্তু শিকার না করিয়া বা মাছ না ধরিয়া এবং শস্য ভূমি অধিকারের জন্য পরস্পরের মধ্যে মারামারি না করিয়াও যে খাদ্য সমস্যার সমাধান করা যায় এ কথা তাহারা জানিত না। আজ সেইস্থানে ১৯ কোটি লোক বসবাস করিতেছে। তাহারাই এখন বিশ্বের সব চেয়ে বেশী ধনী ও শক্তিশালী জাতি। সেখানে মাথাপিছু আয় অন্যূন ছয় হাজার টাকা—ভারতের মাথাপিছু রোজগারের বিশগুণেরও অধিক। সেদেশে যেন সুরা ও মধু বহিয়া যাইতেছে। সে দেশের পুষ্টির মান বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের লোকের ঈর্ষার বস্তু। সে দেশের স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ নিবারণের ব্যবস্থা এতই উৎকৃষ্ট যে, সেখানে লোকের গড়পড়তা পরমায়ু ৭০ বৎসর, আর ভারতে ২৮ বৎসর। সে দেশে ঘরে ঘরে টেলিফোন ও রেডিও এবং বহু পরিবারে টেলিভিশন আছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পথে যখন আমি লণ্ডনে ছিলাম তখন আমি সেখানে একখানি সংবাদপত্রে একটি ব্যঙ্গচিত্র দেখিতে পাই। সেই চিত্রটির অর্থ হইতেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৎসরে ৭০ লক্ষ মোটর গাড়ী তৈয়ারী হয় কিন্তু সে দেশে মাত্র ৩০ লক্ষ শিশু জন্মগ্রহণ করে। যেন প্রতি শিশুর জন্যই ২২টি করিয়া মোটর গাড়ী নির্মিত হয়! আমার মার্কিন বন্ধুগণ বলেন—যদি ইংরেজ বন্ধুগণ কিছু না মনে করেন তবে তাঁহারা তাঁহাদের পরিকল্পনার সম্প্রসারণ করিবেন এবং তাঁহারা আরও বলেন যে, বর্তমানে সে দেশে ৬ কোটি মোটর গাড়ী আছে—এই গাড়ীগুলি বৃহৎ—এগুলি হিন্দুস্থান—১০, ফিয়াট বা মরিস—৮ গাড়ীর মত ক্ষুদ্র নয়। এইসব গাড়ীতে করিয়া আমেরিকার সকল নাগরিককে সম্মুখভাগের আসনে বসাইয়া এবং উত্তর আটলান্টিক চুক্তি প্রতিষ্ঠানভুক্ত দেশসমূহের সমস্ত অধিবাসীকে পশ্চাতের আসনে বসাইয়া লইয়া যাওয়া যায়।

পানামা খাল খনন—যদি পুরাতন গোলার্ধে, সুয়েজ যোজকরে সৃষ্টিকর্তার বিরাট ভুল বলিয়া ধরা হয়, তবে নূতন গোলার্ধে পানামা যোজকটি আরও বিরাট ভুল। মার্কিনগণ এ ভুল বেশী দিন নীরবে সহ্য করে নাই। ১৯১৪ সালে পানামা খাল খনন করিয়া দুই মহাসাগরের মধ্যে যোগাযোগ সাধন করিয়াছে। ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহারা এখন একটি নূতন পরিকল্পনা আরম্ভ করিয়াছে। এই পরিকল্পনা রূপায়িত হইলে বড় বড় জাহাজ সেণ্ট লরেন্স নদী দিয়া চলাচল করিবে এবং ডেট্রয়েট ও চিকাগো বন্দরের সহিত লণ্ডনের এবং নিউইয়র্কের সহিত বোম্বাইয়ের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হইবে।

রাশিয়ার অগ্রগতি—নৌচলাচলের সুবিধার জন্য রাশিয়ায় কতকগুলি খাল খনন করা হইয়াছে। একটি বাল্টিক সাগরকে কৃষ্ণ সাগরের সহিত যুক্ত করিয়াছে। সেচের উদ্দেশ্যে ভলগা, আমুদরিয়া ও সিরদরিয়ার জল ভিন্নপথে ঘুরাইয়া লওয়ায় ক্যাসপিয়ান সাগর ও আরল সাগরের অববাহিকায় জলের উচ্চতা ক্রমে ক্রমে কমিয়া যাইতেছে বলিয়া নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য রাশিয়ার পরিকল্পনা রচনাকারিগণ, পশ্চিম সাইবেরিয়া

হইতে যে বিপুল পরিমাণ জল উত্তরসাগরে গিয়া পড়ে তাহা আরল অববাহিকাস্থিত নিম্নভূমিতে বহাইবার কথা বিবেচনা করিতেছেন।

ভারতের রূপান্তর—ভারতে আমরা বর্তমানে 'কৃষি প্রধান' সভ্যতা হইতে শিল্পপ্রধান সভ্যতার দিকে চলিয়াছি। এখন হইতে লোকে ক্রমশঃ গ্রামের বৃত্তি ছাড়িয়া সহরের বৃত্তি অবলম্বন করিবে। গত পনর বৎসরে সহরাঞ্চলের দিকে গ্রামের লোক ধাবিত হওয়ায় সহরের জনসংখ্যা শতকরা ১০ হইতে বাড়িয়া ১৭ হইয়াছে। যদি আমরা সকল নূতন শ্রমিককে শিল্প, পরিবহন ও অন্যান্য বৃত্তিতে নিয়োগ করিতে পারি, এবং যদি আমরা বৎসরে শতকরা ৭ ভাগ করিয়া জাতীয় আয় বাড়াইতে পারি, তবে ৩০ বৎসরে ভারতে অর্ধেক লোক সহরবাসী হইবে বলিয়া মনে হয়। ইহাতে অধিক পরিমাণ জমিতে ঘরবাড়ী নির্মিত হইবে এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য উৎপাদনের জমিক্রমশঃ হ্রাস পাইবে।

চিনি রপ্তানী

ভারতীয় শর্করা সমিতির সভাপতি শ্রীশ্যামসুন্দর কানোড়িয়ার বিবৃতি—

শর্করা সমিতি শ্রীকানোড়িয়া ভারতীয় শর্করা সমিতি সাম্প্রতিক অধিবেশনে এক বিবৃতিতে বলেন যে ভারতের শর্করা শিল্প বর্তমানে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্তমানে এই শিল্পটির উৎপাদন এমন বৃদ্ধি পাইয়াছে যে আভ্যন্তরিণ প্রয়োজন মিটাইয়াও পর্যাপ্ত পরিমাণে রপ্তানীর মত উদ্বৃত্ত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা আজ অত্যন্ত বেশী এবং শর্করা শিল্পের রপ্তানীর ক্ষমতা এই ক্ষেত্রে একটি শুভ পদক্ষেপ এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রগতিতে ইহার দান উল্লেখ যোগ্য।

যুক্তরাজ্যে চিনি রপ্তানী করিবার ক্ষমতা ভারতীয় শর্করা শিল্পের ক্ষেত্রে একটি গৌরব জনক অধ্যায়ের সূচনা করিল। ইতিপূর্বেই চাকধারা জাহাজে যুক্তরাজ্যে চিনি রপ্তানী আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। যুক্তরাজ্যই সর্ব বৃহৎ সাদা চিনি রপ্তানী কারক। সুতরাং ভারতের পক্ষে যুক্তরাজ্যে চিনি রপ্তানী কম সাফল্যের কথা নয়। যুক্তরাজ্যের একদল প্রতিনিধি সম্প্রতি ভারতে আসিয়া ব্যক্তিগত ভাবে ভারতীয় চিনির গুণাগুণ, প্যাকিং প্রভৃতি দেখিয়া তাহারা সন্তুষ্ট হন এবং ভারতীয় চিনি রপ্তানীর সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া মতামত প্রকাশ করেন।

কানোড়িয়া তাহার বিবৃতিতে বলেন যে বৈদেশিক ক্রেতাগণের সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ভয় হয়তে প্রাথমিক পর্যায়ে খানিকটা অসুবিধা সৃষ্টি কিম্বা হয়তো অন্য দেশের প্রতিযোগিতা খানিকটা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিবে কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভারত সরকার শর্করা সমিতির উপর এই আস্থা পোষণ করেন যে ভারত, মালয়, মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব আফ্রিকা, সিংহল ও ব্রহ্মদেশে প্রচুর পরিমাণে চিনি রপ্তানী করিতে পারিবে। ভারতীয় শর্করা সমিতির প্রতিনিধিগণ ঐ সকল দেশ ভ্রমণ করিয়া এইরূপ ধারনা করেন যে ভারতের চিনি ঐ সকল দেশে রপ্তানী হইলে উহাদের সহিত একটা সহযোগিতার সূত্র স্থাপিত হইবে। ভারত ঐ সকল দেশের সহিত বন্ধুভাবাপন্ন এবং ভারতের চিনি অন্যান্য দেশের চিনির তুলনায় কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। সুতরাং ভারতের চিনি ঐ সকল দেশে একটা স্থায়ী বাজার সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীকানোড়িয়া আরও বলেন যে ভারতীয় শর্করা সমিতি ভারতীয় চিনির সুনাম প্রতিষ্ঠায় ও ভবিষ্যতে সমৃদ্ধ রপ্তানীর বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। এই উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন একদল চিনি বিশেষজ্ঞ রপ্তানীর প্রয়োজনে ভারতীয় চিনির মান, প্যাকিং প্রভৃতি পর্যবেক্ষণের জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাহারা বন্দরে ও কারখানায় গিয়া নমুনা পরীক্ষা চালান এবং পরীক্ষার ফলে সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

ভারতীয় চিনি রপ্তানীর ফলে সমস্ত চিনি-উৎপাদনকারী দেশে একটা প্রবল আলোড়ন উঠিয়াছে। বিশেষতঃ যুক্তরাজ্যে এই ব্যাপারে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে। কারণ ভারত হয়তো ভবিষ্যতে প্রবল প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে পারে। ইতিপূর্বে কয়েকটি রপ্তানী বাজারে ভারতীয় চিনির প্রতিযোগিতা সম্পর্কে আতঙ্ক সুরু হইয়াছে। ভারতীয় চিনি ভবিষ্যতে রপ্তানী ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য-ভাবে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়।

পরিশেষে ইহা উল্লেখযোগ্য যে ভারতীয় শর্করা সমিতি এই উদ্দেশ্যে একটি তহবিল সৃষ্টি করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন। রপ্তানীকৃত চিনি হইতে যাহা লাভ হইবে তাহা রপ্তানীকারক গ্রহণ না করিয়া এই তহবিলে সঞ্চিত রাখিবেন—যাহাতে ভবিষ্যতে সম্ভাব্য লোকসান এই তহবিল হইতে পূরণ করা যাইতে পারে। সমিতির সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে আগ্রহশীল, যাহাতে অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতা না করিয়া চিনির মান, প্যাকিং বিদেশী বাজারে আস্থা অর্জন করিতে পারে সেই ভাবে রপ্তানী বাজারে দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। এই সমিতি ভারত সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয় ও পদস্থ কর্মচারীদের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া এই পথে অগ্রসর হইতেছে।

———

অনুন্নত অর্থনীতিতে জাতীয় আয় নির্ধারণ কয়েকটি সমস্যা

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়তোষ মৈত্রেয়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

Kuznets লিখিয়াছেন 'Thus according to the department of commerce estimates, consumers, spent over half a billion dollars on cemeteries and funerals in 1929, and while these functions are presumabely performed satisfactorily in India and China for which no allowance is found in the estimates."

নাপিত, ধোবার কাজ উন্নত দেশের অর্থনীতিতে সম্পূর্ণভাবেই বাজারগত—কিন্তু এদের কাজের অধিকাংশই আমাদের মত অনুন্নত দেশের গ্রাম এলাকার ঘরোয়া ব্যাপার—অবাজার গত (Non-marketable) ইহাদের শ্রমমূল্য জাতীয় আয়ের হিসাব হইতে বাদ পড়িয়া যাইবে। আবার দেখা যায় উন্নত যন্ত্রশিল্প অর্থনীতির দেশে উৎপাদন ক্রমশঃই বৃহৎ প্রতিষ্ঠান মুক্ত হইতে থাকে এবং যোগান দায় ও ভোগকারী বা ক্রেতাদের মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়া চলে—আর তার ফলে যানবাহন ও বণ্টনের ধারা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। [Production in the industrial societies tends to be concentrated in relatively large units at some distance from the consumers who ultimately use

the finished products. Thus from the computation of commodities by producers to the time they reach the hands of the consumers, there is a long chain of transportation and distribution] (Kuznets).

একটি ছোট দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। উন্নত যন্ত্র-শিল্প প্রধান দেশে একটি কাপড়ের কারখানা রেলওয়ে ও উন্নত যানবাহন এবং বিস্তৃত ব্যবসায়ের সাহায্যে কাপড় তৈয়ারীর বিভিন্ন কাঁচা মাল (তুলা, কার্পাস প্রভৃতি) দেশের বিভিন্ন দূরবর্তী এলাকা হইতে সংগ্রহ করিয়া কারখানা এলাকায় লইয়া আসে। আবার সেখান হইতে তৈয়ারী পণ্য রেলগাড়ী চড়িয়া ব্যবসায় কেন্দ্র ধরিয়া বিজ্ঞাপনের জোরে দেশ-দেশান্তরের বিভিন্ন এলাকার বাজারে ছড়াইয়া পড়ে। আর সে ক্ষেত্রে অনুন্নত দেশের কয়েকটি শহর নগর ছাড়া পল্লী এলাকায় তন্তুবায়ীরা তাহাদের কার্পাস তুলা স্থানীয় কৃষকের কাছ হইতেই যোগাড় করে। ঘরে বসিয়া তাঁত চালাইয়া বস্ত্র বুনিয়া হয় অন্য পণ্যের বিনিময়ে নয় স্থানীয় বাজারেই বিক্রয় করিল—যানবাহন, ব্যবসায় কেন্দ্র বা বিজ্ঞাপনের খরচের বালাই রহিল না—থাকিলেই বা পায় কোথায় ?

ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয় এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিবার আছে। শিল্পোন্নত দেশে এমন কতকগুলি উৎপাদন পদ্ধতি রহিয়াছে যাহার খরচ অবশ্য সেই পণ্যের খুচরা মূল্যের মধ্যে ধরা হয় না অথচ এই ধরণের উৎপাদন সংগঠনের জন্য খরচ বৃদ্ধি পায়। এই ধরণের তিন প্রকার কার্যের কথা সহজেই মনে আসে। যেমন দেখা যায়, শিল্পোন্নত দেশে কারখানায় যাতায়াতের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই মালিকের পক্ষ হইতে শ্রমিকের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা থাকে—এর ফলে কিন্তু এই কারখানা উৎপাদিত পণ্যের ক্রেতারা সরাসরিভাবে কোন সুবিধা ভোগ করে না। (তবে efficiency ও সময়ের দিক দিয়া দেশের অর্থনীতি সামগ্রিকভাবে উপকৃত হইয়া থাকে)। এই বাবদে যে খরচ তাহা বৃহদায়তন শিল্পের সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত মানুষের জীবন যাত্রায় যে অসুবিধা সৃষ্টি হয় তাহার ক্ষতি পূরণ হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে! আর এই খরচ ও অত্যধিক। কেন না The concentration of large number in limited areas raise geometrically the discomfort and the cost of offsetting it. বাড়ী ভাড়া সমস্যা বা অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের বর্দ্ধিত মূল্যের সমস্যা তো রহিয়াছেই। কুজনেটস্ একটি হিসাব দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "The Department of Commerce sets for 1929 the cost of space rent for urban and rural non farm durllers 10. 3 billion, which for a farm population of 30 million, works out to about 27 per capitta. Yet surely the real values of the two are scarcely in the ratio of 4 to 1." বাড়ী তৈয়ারীর খরচা বৃদ্ধির সমস্যা সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন, শিল্প এলাকায় অত্যধিক ঘন বসতির ফলে গৃহ নির্মাণের যান্ত্রিক ও কৌশলগত সমস্যার (Technical problems) দরুণ গৃহ নির্মাণের খরচ বেশ বৃদ্ধি পাইবে। স্কাইস্ক্রেপার নমুনার বাসাগুলি দৃষ্টান্ত হিসাবে লওয়া যায়। শিল্প ও ব্যবসায় বহুল কলিকাতার অফিস পাড়ার এলাকাটির দিকে দৃষ্টি দিলে ব্যাপারটি কিছুটা বোঝা চলে। ইহা হইতে নিউইয়র্ক লণ্ডনের কথা অনুমান করা সহজ। কৃষিপ্রধান পল্লী এলাকা অধ্যুষিত অনুন্নত দেশের ক্ষেত্রে এ সকল সমস্যার কথা ওঠে না।

দ্বিতীয় পর্যায়ে যন্ত্র শিল্পগত অর্থনীতিতে মুদ্রা ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, শ্রমিক কল্যাণ ব্যবস্থা প্রভৃতি

(monetary and credit) বাবদ যে খরচা হইয়া থাকে তাহাকে ধরিতে পারি। এই সকল খরচের জন্য ক্রেতা বা ভোগকারীরা কোনরূপ সুবিধা পায় না। অনুন্নত দেশের অর্থনীতিতে এই ধরণের ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিলেও উন্নত দেশের তুলনায় তাহা অতি নগণ্য। Payments of banks, employment, agencies, unions, brokerage houses etc. including such matter's as technical education are payments not for final goods flowing to ultimate consumers but libations of oil on the machinary of industrial society activities intended to eliminiate friction in the prcductive system net contributions to ultimate consumption.

তৃতীয় পর্যায়ে পড়ে সরকারী খরচ। ইহা সর্বজন স্বীকৃত, সমাজকে একটি বিশিষ্ট ধাঁচে এবং সমাজের অর্থনৈতিক জীবনকে নির্বিবাদে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দেশে আইন, বিচার শাসন, পুলিশ প্রভৃতি খাতে অর্থব্যয় করা হয়—ক্রেতাদের সরাসরি পণ্য সরবরাহের জন্য করা হয় না। একথা জানিতেই হইবে উপরি উক্ত বাবদে যে খরচ করা হয় তাহার পরিমাণ অনুন্নত দেশ হইতে উন্নত দেশে অনেক বেশী। এইবার আসা যাউক অনুন্নত অর্থনীতিতে জাতীয় আয় নির্ধারণে মূলধন সৃষ্টির সমস্যা। শিল্পে অনুন্নত দেশগুলিতে দেখা যায় অবাজারগত অথবা বাজার বহির্ভূত প্রভৃতি মূলধন সৃষ্টি হয় এবং সেইগুলির হিসাব রাখা হয় না। যেমন কৃষকের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় মাটির উর্বরা শক্তি বর্ধনে অথবা কোন এলাকায় সকল কৃষকের মিলিত প্রচেষ্টায় প্রস্তুত কোন কাঁচা বাঁধ বা জল সেচের ব্যবস্থা। এই ধরণের দৃষ্টান্ত আমাদের মত দেশের পাঠকদের খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না। অথচ ইহাদের কোন হিসাব লওয়া হয় না। আবার অনুন্নত দেশে উৎপাদক দ্রব্যের উৎপাদক এবং ব্যবহারকারীর মধ্যে দূরত্ব খুবই অল্প। শিল্পে অনুন্নত দেশ হইতে উন্নত দেশের শ্রম বিভাগের পরিমাণ অনেক বেশী। আমরা এই প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লিখিত কাপড়ের কলের দৃষ্টান্ত আর একবার স্মরণ করিয়া লইতে পারি। An advancd industrial organisation may mean a considerable amount of extra fabricatotion, transportation and trade that are not necessary in the simpler decentralised structure of a pre-industrial economy.)

উপরে উল্লিখিত অনুন্নত অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলির দিক হইতে বিচার করিলে অনুন্নত দেশগুলিতে প্রচলিত জাতীয় নির্ধারণ পদ্ধতি এই সকল দেশের জাতীয় আয়ের নিখুঁত পূর্ণাঙ্গ ছবি দিতে পারে না বলিয়াই ধারণা হয়। ইহা বিবেচনার বিষয়।

বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে অর্থনীতিক অগ্রগতির সমস্যা

ডাঃ আর্থার রবার্ট বার্ণস্

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে কেবল সমৃদ্ধতর দেশে নয় দরিদ্রতর দেশেও বহুব্যাপক আর্থনীতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার নূতন যুগের যাত্রা যেন শুরু হয়েছে। অত্যন্ত অল্প খরচে উন্নয়ন সাধনই হল এ সকল পরিকল্পনার লক্ষ্য। অর্থনীতিবিদেরা উন্নয়ন সাধনের বিভিন্ন পন্থার মধ্যে কোনটি অনুসরণ করলে যে কি ফলাফল পাওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে একটা অনুমান করতে পারেন কিন্তু আসলে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে সরকারগুলিকে। কেননা বিভিন্ন পন্থানুসরণের ব্যয়ভার

সম্পর্কে বিচার বিবেচনার পর উন্নয়ন সাধনের বিষয় বা ক্ষেত্র নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব রয়েছে তাদেরই উপর। এদিক থেকে বিভিন্ন দেশের সরকারকে ভবিষ্যতে বিশেষভাবে কঠিন তিনটি বিষয়ে আপন আপন মন স্থির করতে হবে: দেশের জনসংখ্যার পরিমাণ, ভবিষ্যতে পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে মূলধন নিয়োগের হার এবং জনসাধারণের আর্থনীতিক জীবনের উপর সরকারী হস্তক্ষেপের পরিমাণ।

বর্তমান শতাব্দীতে বহু দরিদ্রতর দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সকল দেশের মধ্যে বহু দেশে তবে সকল দেশেই নয়—জাতীয় সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা এত বেশী যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস না পেলে ব্যক্তিগত আয়ের হার কমে যাবে। বর্ধিত হারে জাতীয় উৎপাদন হলেও যদি কেবলমাত্র জনসাধারণের ভরণপোষণের জন্যই সেই বর্ধিত সম্পদ ব্যয়িত হয়ে যায়, তবে জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের পরিকল্পনাকে কার্যকরী রূপদান করা সম্ভব হবে না। পরিবার নিয়ন্ত্রণের সমস্যাও খুবই কঠিন। কারণ, তার জন্য একদিকে যেমন বর্তমান জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলির আরও উন্নতি সাধনের প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমন বংশবৃদ্ধি করা বহু দেশের প্রচলিত রীতিনীতি ও ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বপ্রথমে জনসাধারণকে বোঝাতে হবে যে, তাদের জীবনযাত্রার মান জাতীয় আয়ের অংশীদার লোকসংখ্যার উপরই কিছুটা নির্ভর করে। অবশ্য জনসাধারণ আজ একথা উপলব্ধি করছে এবং কোন কোন দেশের সরকার ইতিমধ্যেই পরিবার নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান বিতরণের ব্যবস্থা করছেন।

এছাড়া ভবিষ্যতে পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে জনসাধারণের বর্তমান আয়ের কতখানি অংশ পৃথক করে রাখা হবে সেই হচ্ছে আর একটি গুরুতর সমস্যা। মূলধনই যে শ্রমকে আরও উৎপাদনশীল করে তোলে তাতে কোন সন্দেহই নেই। জাতীয় আয় বৃদ্ধির কাজকর্ম শুরু হওয়ার সময় সমৃদ্ধতর দেশসমূহে যে পরিমাণ মূলধন আবশ্যক হয়েছিল সেই তুলনায় দরিদ্রতর দেশসমূহের জাতীয় আয় বৃদ্ধির কাজে অনেক বেশী মূলধনের প্রয়োজন হবে এবং সেটা হবে তাদের অন্যতম সমস্যা। মাত্র দু-এক শতাব্দী পূর্বেও, বর্তমানে যে পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হয়ে থাকে তদানীন্তন কালের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎপাদন পদ্ধতিতেও সেই পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হোত না। একথা অবশ্য ঠিক যে, অতি আধুনিক সাজসরঞ্জাম গ্রহণ না করলে কিঞ্চিৎ ব্যয়সঙ্কোচ সাধিত হতে পারে। কিন্তু তার ফলে আবার পণ্যোৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পেতে পারে। আর একটি সমস্যা হচ্ছে এই সকল দেশে উন্নয়ন কার্যের প্রথম পর্বে পরিবহন, শক্তি উৎপাদন এবং সেচকার্যের জন্য বিপুল পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন হবে। যদিও পরিণামে এতে জনসাধারণের পরম হিত সাধিত হয় তবু আশু সুবিধা তেমন হয় না। কারণ এই সকল উন্নয়ন কার্যের পথ লাভে সর্বদাই কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটে থাকে। দরিদ্র দেশে মূলধনের প্রয়োজন অত্যন্তিক হলেও জাতীয় আয়ের অতি অল্প অংশই ভোগ্য পণ্যে ব্যয়িত হবার পর মূলধন হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এজন্য এই মূলধন সংগ্রহের অন্যতম পথ হল অন্যান্য দেশ থেকে ঋণ অথবা দান গ্রহণ ঋণ হিসাবে প্রাপ্ত এই অর্থ বুদ্ধিবিবেচনা করে ঠিকমত কাজে লাগালে পণ্যোৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং সুদসহ ঋণ শোধ করার ব্যাপারে কোন অসুবিধা হবে না। তবে এই সকল দেশের একটি ভাববার বিষয় আছে—বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ অথবা ধীরে ধীরে মন্থরগতিতে দেশোন্নয়ন এর মধ্যে একটিকে বেছে নিয়ে কাজে নামতে হবে। কোন কোন রাষ্ট্র ক্রূর আর্থনীতিক সাম্রাজ্যবাদের চাপে অতীতে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন

করেছে এবং সেরূপ সাম্রাজ্যবাদের পুনরাবির্ভাবের আশঙ্কায় তারা পুঁজি বিনিয়োগ সম্পর্কে বাধানিষেধ আরোপ করেছে। প্রকৃতপক্ষে বিদেশী উত্তমর্ণগণ এবং তাদের সরকারগুলি বর্তমানে তাদের দরিদ্রতর প্রতিবেশীগণের সঙ্গে আচারে ব্যবহারে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী মার্জিত মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছেন। দরিদ্রতর দেশের কোন সরকার বৈদেশিক উত্তমর্ণগণ যাতে ঐ সকল দেশে আরও সুবিধাজনক সর্তে লগ্নী করতে পারেন সেই অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। কিন্তু পরিকল্পনাকারী রাষ্ট্রসমূহ কার্যক্ষেত্রে নেমে দেখবেন যে, আর্থনীতিক উন্নতির জন্য উদগ্রীব সকল দেশেরই দ্রুত উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট মূলধন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

পুঁজি বিদেশ অথবা স্বদেশ যেখানে থেকেই আসুক না কেন, অর্থ লগ্নীর ফলে যেখানে পণ্যোৎপাদনের পরিমাণ এবং আয় বৃদ্ধি পায় সেখানে দেশের নেতৃবৃন্দকে ঐ বর্ধিত আয় জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিকল্পে অথবা ভবিষ্যৎ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধিকল্পে নিয়োগ করা হবে কি না তা স্থির করতে হবে। তবে দারিদ্র্যপীড়িত জনসাধারণ সেই বর্ধিত আয় তাদের দুর্দশা মোচনের জন্য ব্যয় করবার জন্যই চাপ দেবে। তারা ইতোমধ্যেই জমির খাজনা হ্রাস, বর্ধিত বেতন এবং সামাজিক নিরাপত্তার দাবী তুলেছে। এই ধরণের দাবী কিছু কিছু পূরণ করলে শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে সত্য, কিন্তু তাতে ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার বেড়ে যাবে এবং ভবিষ্যতে পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আরও পুঁজি বিনিয়োগের সম্ভাবনা হ্রাস পাবে। আবার এই সকল দাবী প্রত্যাখ্যান করলে সরকার ও পরিকল্পনার উপর জনসাধারণের আস্থা নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। আর্থনীতিক ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যে কতখানি ব্যাপক হবে তা নির্ধারণই হল তৃতীয় সমস্যা। আগামী কালে হয়তো এই সমস্যাই হবে গুরুতর অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশগুলিতে অর্জিত অতীত অভিজ্ঞতা এবং তাদের বর্তমান সমস্যার আকারের দিকে তাকালে মনে হয়, ব্রিটেন ও আমেরিকার সরকার আর্থিক উন্নয়নের প্রারম্ভে যতখানি সক্রিয় ছিল, দরিদ্রতর দেশের সরকারকে তার চেয়ে অনেক বেশী সক্রিয় হতে হবে। কিন্তু দেশের সামগ্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থার ব্যাপক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দেশে কি কি পণ্য উৎপাদন করা হবে এবং কিভাবে উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় করা হবে সরকারই তা নিয়ন্ত্রণ করবে অর্থাৎ তারা শ্রমিকদের কাজকর্মের সর্ত, শ্রমশিল্পের দ্বারা উৎপন্ন পণ্যের ব্যয় এবং পুঁজি বিনিয়োগের ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ করবে। অবশ্য এ প্রসঙ্গে একথা স্বীকার্য যে, জনসাধারণের বর্তমান আর্থনীতিক অবস্থার উন্নতি সাধন স্থগিত রাখলে এরকম পরিকল্পনার সাহায্যে অতি তাড়াতাড়ি পুঁজি সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে।

তবে দেশের উন্নতির জন্য অর্থনীতির যে সকল বিভাগের উন্নয়ন সাধন একান্ত প্রয়োজন আর্থনীতিক পরিকল্পনাকে কেবলমাত্র ঐ সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাও সম্ভব হতে পারে। সরকার আমদানী শুল্ক ধার্য করতে পারেন, আর্থিক সাহায্য বা মূলধনের ব্যবস্থা করতে পারেন আধা সরকারী উদ্যোগে শিল্প প্রতিষ্ঠা হতে পারে। সরকার কর বৃদ্ধি করে, আন্তর্জাতিক সংস্থা বা বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করে এবং স্বদেশে কর ধার্য করার নীতিতে অদল বদল করে করভার স্থানান্তরিত করে মূলধনের ব্যবস্থা করতে পারেন। এর ফলে ব্যক্তিগত উদ্যোগের এবং তাতে উৎসাহ দানের অবকাশ হবে।

দেশের আর্থনীতিক উন্নতি যে পরিবর্তনের পথেই হয়ে থাক এবং এই উন্নয়ন সাধন যে প্রায়ই কষ্টকর হয় তা যদি জনসাধারণকে বোঝানো যায় একমাত্র তা হলেই এই ধরণের পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হতে পারবে। জনসাধারণের মধ্যে যারা অধিকতর বিত্তশালী তাদের অংশের তুলনায়

অধিক পরিমাণ ট্যাক্স দিতে হবে এবং পণ্যোৎপাদনের ব্যাপারে অধিকতর সক্রিয় সাহায্য করতে হবে। আর জনসাধারণের পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে। যেমন জমিকে আরও ফলপ্রসূ করে তুলবার জন্য তাদের নিজ নিজ জমি ছাড়তে হবে, বর্তমান বাসভূমি ত্যাগ করে নূতন জায়গায় গিয়ে নূতন কাজ নিয়ে নূতন জীবন শুরু করতে হবে। সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশে জীবনযাত্রায় তাদের সন্তান সন্ততিরাও কোন সাহায্যে আসবে না কারণ তাদের আগের তুলনায় অনেক বেশী সময় বিদ্যালয়ে কাটাতে হবে। বর্তমানে যেমন দেখা যায় তার তুলনায় শাসন পরিচালকদের আরও কর্মদক্ষ হতে হবে এবং সকল দুর্নীতির ঊর্ধে থাকতে হবে। সর্বশেষে বর্তমান শতাব্দীর শেষ কয়েকটি দশকের দিকে দৃষ্টিপাত করলে মনে স্বতঃই একটি প্রশ্ন জাগবে। পৃথিবীতে পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ না থাকায় এই পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের যে চেষ্টা চলছে তা কি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, বর্তমানে পৃথিবীর যে জনসংখ্যা আছে তাদেরই জন্য আরও খাদ্যের প্রয়োজন। চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নতির এবং পুষ্টিবিধান ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে ভবিষ্যতে এই পৃথিবীতে বর্তমানে যে পরিমাণ জমি আছে সেই জমিকে মানুষের জানা সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কাজে লাগানো হলে খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া মানুষের আরও জ্ঞান বৃদ্ধির ফলেও খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ নিঃসন্দেহে বেড়ে যাবে। কিন্তু কি পরিমাণ খাদ্যে যে কত সংখ্যক লোক প্রতিপালিত হতে পারে তার একটা সীমা আছে। সর্বোৎকৃষ্ট পরিকল্পনার কথা ছেড়ে দিলেও সেই সীমানা যে কোথায় টানা হবে তা নির্ভর করছে ভবিষ্যৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির উপর।

জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য কিছুটা অন্য ধরণের সম্পদের আবশ্যক, যেমন শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থা, নির্মাণকার্যের উপকরণ এবং জীবনযাত্রার সংশ্লিষ্ট আরও হরেক রকমের কাজ তবে ভবিষ্যতে শক্তির নূতন উৎসের সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। বহু প্রকার ধাতুকেও আমরা কাজে লাগাচ্ছি এবং কি করে যে কাজে লাগাতে হয় তা শিখছি। কিন্তু পৃথিবীতে যে পরিমাণ ধাতব সম্পদ আছে আজ পর্যন্ত তার অতি অল্প অংশই আবিষ্কৃত হয়েছে। সুতরাং মনে হচ্ছে পৃথিবীর জনসংখ্যা অসম্ভব রকম বেড়ে না গেলে, অতি দ্রুত বর্তমান জনগণের জীবন যাত্রার স্বচ্ছন্দ মান প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হলেও হয়তো দূরকালে বিশ্বের অধিকাংশ জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সম্ভব হবে। উপসংহারে আমি বলতে চাই পার্থিব উপকরণের মানদণ্ডে উন্নত জীবন যাত্রার জন্য যে পরিকল্পনা রচনা করা হয় তা কোন যান্ত্রিক ফরমুলা বা সূত্র নয়। অপচয় নিবারণ এবং নির্ভুল পরিকল্পনা তৈরী করতে হলে অর্থনীতিবিদগণের বর্তমান জ্ঞানের সীমা আরও পরিবর্ধিত করা প্রয়োজন, তাদের আরও অনেক কিছু জানা আবশ্যক। পরিকল্পনা রচনার পূর্বেই কোন্ কোন্ বিষয় নিয়ে পরিকল্পনা রচিত হবে অর্থাৎ কোন্ বিষয়কে পর্যায়ক্রমে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বিষয় নির্বাচনের সেই কঠিন কাজটি সম্পন্ন করতে হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাটি সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত করা হবে সেই সিদ্ধান্ত এবং ভবিষ্যতে উন্নতির আশায় বর্তমান ত্যাগ স্বীকারের স্পৃহার মধ্য দিয়েই প্রত্যেকটি দেশের আশা আকাংখা ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাবে। দেশের যথার্থ উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা সমূহকে কার্যে রূপায়িত করতে হলে, পরিবর্তনকে জননাধারণের স্বীকার করে নিতে হবে আর প্রয়োজন হবে সুদক্ষ শাসন ব্যবস্থার। পরিকল্পনার রচনার ব্যাপারটি খুব সহজ না হলেও এর মধ্যে সমগ্র বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য ও অসাম্য দূরীকরণের মস্তবড় প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

ভারতীয় অর্থনীতিতে কুসংস্কার

অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়জীবন বসু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যে সব ঘটনাকে লক্ষ্য বা উপলক্ষ্য করিয়া কৃষককুলের অমিতব্যয়িতার প্রতি কটাক্ষ করা হয় আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহার একটিমাত্র এখানে উল্লেখ করিব। পাট বেচা টাকা যখন পূর্ববঙ্গের চাষীদের হাতে পড়ে তখন তাহারা হাট হইতে ছেলেমেয়েদের জন্য ইলিশ মাছ ও কাঁঠাল কিনিয়া আনে—যদি তাহাদের জীবনে বিলাসিতা বলিতে কিছু থাকে তবে এই তাহাদের একমাত্র বিলাসিতা। সম্পন্ন গৃহস্থেরা প্রতি ঋতুর রসনা তৃপ্তিকর চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় তাহাদের সন্তানদের মুখে তুলিয়া দিতেছে ইহা তাহারা নিরুপায়ভাবে দেখে। সারা বৎসর রোদে পুড়িয়া জলে ভিজিয়া হাঁটু কাদায় হাঁটিয়া কত দুঃখ ক্লেশ লাঞ্ছনা সহিয়া তাহারা এই পাটের মরসুমের প্রতীক্ষা করিতেছিল। কৃষক গৃহিণীরা নানা অনটনের মধ্যে অপরিসীম ধৈর্যে সারা বৎসর সংসার চালাইয়া আসিয়াছে এবং একাধিক রজনীতে তাহাদের যাহাদের জন্য সামান্য আবদারটুকু জানাইয়া রাখিয়াছে। ছোট বড় প্রায় সকলেই যখন গ্রামের হাট হইতে ইলিশ মাছ ও কাঁঠাল লইয়া বিজয়ী বীরের মত সোল্লাসে গৃহের দিকে ফিরিতেছে তখন কি এই হতভাগ্য কৃষকের ইচ্ছা হয় না যে সে ও তাহার চির-বঞ্চিত সন্তানদের মুখে তাহার একটু তুলিয়া দেয়? বৎসরব্যাপী টানাটানির পরে হাতে টাকা আসিলে কৃষক কি তাহার প্রিয়জনকে একটু ভাল জিনিষ দিতে পারিবে না, না, তাহা দিতে চাওয়া তাহার পক্ষে অপরাধ? পূর্ববঙ্গের কৃষকের কাছে যাহা বর্ষার অমৃত এবং পল্লীগ্রামের তৎকালীন একমাত্র delicacy, যাহার গন্ধে প্রতিবেশীর গৃহ প্রাঙ্গণ ভরিয়া গিয়াছে এবং যাহার গুণাগুণ গ্রামবাসীর মুখে মুখে কীর্তিত হইয়াছে এবং বৎসর ধরিয়া কৃষক পরিবার যাহার স্বপ্ন দেখিতেছে তাহার একটু আধটু আজ স্বচ্ছলতার দিনে প্রতিপাল্য পরিবার পরিজনকে দেওয়া কি অমিতব্যয়িতা? ইহাকে যদি অমিতব্যয়িতা বলা হয় এবং কৃষকের দারিদ্র্যের কারণ বলিয়া ঘোষণা করা হয় তবে ইহার চেয়ে অসত্য অপপ্রচার আর কি হইতে পারে?

পূজা-পার্বণ, শ্রাদ্ধ, বিবাহ প্রভৃতি "ক্রিয়া-কর্মে" ভারতীয়দের, বিশেষতঃ গ্রামবাসী জনসাধারণের, (যাহার অধিকাংশই আবার কৃষিজীবি) অমিতব্যয়িতাকে লক্ষ্য করিয়া সংস্কার প্রয়াসী অর্থশাস্ত্রীরা অনেকে মন্তব্য করিয়া থাকেন। পূজা-পার্বণের অলৌকিক তথা লৌকিক মূল্য সম্বন্ধে অবশ্য মতভেদ আছে। তাহা যে একেবারেই নিরর্থক ইহা প্রমাণ করাও যেমন কঠিন তেমনই কঠিন তাহার বাস্তব সার্থকতা হাতে কলমে প্রতিপাদন করা। শ্রাদ্ধের দুইটি দিক আছে—একটি ধর্ম সংক্রান্ত অর্থাৎ মত বিশ্বাস ও সংস্কার লইয়া, অপরটি সামাজিক। প্রথমে ধর্ম বিশ্বাসের কথাই ধরা যাউক। সেখানে পরকালে দৃঢ়বিশ্বাস আছে এবং শ্রাদ্ধ উপলক্ষে দান ভোজন ও পিণ্ডদান প্রভৃতি দ্বারা মৃত পিতামাতার তৃপ্তিসাধন হয় বলিয়া ধারণা রহিয়াছে সে ক্ষেত্রে শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান সন্তানের অবশ্য করণীয়। পিতামাতা কত দুঃখকষ্ট সহিয়া কত স্নেহযত্নে সন্তানকে লালন পালন করেন তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের পারলৌকিক কাজের জন্য হাতে টাকা না থাকিলে ধার কর্জ করিতে যাওয়া কি অমিতব্যয়িতা? শ্রদ্ধা ভক্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও এক্ষেত্রে অন্ততঃ কৃতজ্ঞতার বিবেচনা থাকা উচিত। যাঁহারা আর খাইতে পরিতে আসিবেন না এবং যাঁহাদের কোন লৌকিক সুখ বা তৃপ্তিসাধনের সম্ভাবনা নাই তাঁহাদের পারলৌকিক হিতসাধনের জন্য কৃতজ্ঞ সন্তান সর্বস্ব

পণ করিতে পারে না কি ? পুত্রের অসুখে ঋণ করিয়া ডাক্তার ডাকিলে বা তাহার পড়ার বই কিনিতে টাকা ধার করিলে উক্ত ঋণকরণ যদি অমিতব্যয়িতার পর্যায়ে না পড়ে তবে যেখানে জন্মান্তরবাদে ও শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা পারলৌকিক হিতসাধনের অমোঘতায় দৃঢ়বিশ্বাস রহিয়াছে সেমন ক্ষেত্রে মাতৃভক্ত পুত্রের পক্ষে মাতৃদায়ে সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় করাই বা কুসংস্কারজাত অমিতব্যয়িতা বলিয়া অভিহিত হইবে কেন ? যাঁহারা পুত্রের শিক্ষার বা চিকিৎসার প্রয়োজনে এবং কন্যার বিবাহে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত নহেন তাঁহারাই মাতৃপিতৃশ্রাদ্ধে ব্যয় সঙ্কোচ করিতে উপদেশ দেন। তাঁহারা তথা কথিত উচ্চশিক্ষার অভিমানে স্ফীত হইয়া শ্রাদ্ধাদি সংস্কারে বিশ্বাসবান ইংরাজী-শিক্ষা-বিহীন জনসাধারণকে কু-সংস্কারাচ্ছন্ন ও কৃপার পাত্র বলিয়া অবজ্ঞা করেন এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে অমিতব্যয়ী বলিয়া তাহাদিগকে অভিযুক্ত করেন। জিজ্ঞাস্য এই যে উক্ত শিক্ষাভিমানী মহাশয়েরা মাতৃ-বিয়োগে মস্তকমুণ্ডন করিয়া শ্রাদ্ধের মত একটা অর্থহীন অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন কেন ? যদি শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানের পারলৌকিক সার্থকতায় তাঁহারা মনে প্রাণে বিশ্বাস না করিয়া শুধু বাহ্য লোকাচার হিসাবে তাহা পালন করেন তবে প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা কপটচারী। আর যদি বিশ্বাস করা সত্ত্বেও তাঁহারা মাতৃপিতৃযজ্ঞে ব্যয় সংকোচ করিতে চান তবে তাঁহারা কৃপণ ও কৃপার পাত্র।

আলোচ্য ক্ষেত্রে অশিক্ষিত মাতৃভক্তের অমিতব্যয়িতা এবং শিক্ষিত হিসাবীর কৃপণতা, কোনটি বেশী নিন্দনীয় ? পিতামাতার পারলৌকিক তৃপ্তি ও শান্তির জন্য যে দীনদুঃখী তাহার সর্বস্ব দান করার পরেও মনে করে যে আরও কেন দিতে পারিলাম না, আর যে সম্পন্ন গৃহস্থ নিজের ও স্ত্রী পুত্রের বর্তমান তথা ভবিষ্যৎ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আঠারো আনা বন্দোবস্ত করার পরেও মাতৃশ্রাদ্ধে পাই পয়সা তিনবার হিসাব করেন, এই দুইএর মধ্যে কোন আদর্শ বরণীয় তাহা ধীর ভাবে বিচার করিতে হইবে। এ ত গেল ধর্ম-বিশ্বাসের কথা। শ্রাদ্ধ বিবাহ প্রভৃতির একটা সামাজিক দিকও আছে। দরিদ্র কৃষক পুরুষানুক্রমে যাহাদের সঙ্গে বাস করিতেছে, কাজ করিতেছে, সুখে দুঃখে যাহারা তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়ায় যাহাদের বাড়ীতে ক্রিয়া-কর্মে উৎসব অনুষ্ঠানে সে সপরিবারে খাইয়া আসিয়াছে এবং যাহাদিগকে নিজের বাড়ীতে আনিয়া খাওয়াইতে না পারিলে তাহার মন খুঁৎ খুঁৎ করে। বাপের শ্রাদ্ধে ছেলের বিবাহে তাহাদের পাতে একটু চিঁড়া দই বা দুইটি শাক ভাত দিতে চাওয়া কি গুরুতর অপরাধ ? মধ্যবিত্ত গৃহস্থ—উকীল, ডাক্তার, শিক্ষক বা কেরানী—আত্মীয়ের বা বন্ধুর মেয়ের বিবাহে গৃহিনীর হাত দিয়া শাড়ী বা গহনা উপহার দিতে গিয়া যদি টাকা ধার করেন তবে তাহা অমিতব্যয়িতা হয় না—তখন বলা হয় কি করি বলুন, সমাজে বাস করিতে হইলে লৌকিকতা করিতেই হয়। সত্য কথা। সামাজিক জীবের সামাজিক কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে। কিন্তু কৃষক কি সমাজের বাহিরে ? নির্ধন ও নিরক্ষর বলিয়া সে কি হৃদয়হীন ও অসামাজিক হইবে ? দরিদ্র কৃষক যদি তাহার কন্যার বিবাহে আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও স্বজাতীয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে চায়, তবে তাহাকে অমিতব্যয়ী বলা হয় কোন বিচারে ? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা তাহাদের হৃদয় সায় না দিলেও খরচ করিয়া থাকেন সমাজে সম্মান প্রতিপত্তি বা চাল বজায় রাখিবার জন্য। পল্লীগ্রামের অসংস্কৃত গরীব চাষা কিন্তু চালের জন্য খাওয়ায় না—খাওয়াইবার আকুতি তাহার আন্তরিক। বহু পুরুষ ধরিয়া পাশাপাশি যাহাদের সঙ্গে বাস করিতেছে এবং অতীতের বহু সুখদুঃখের স্মৃতি যাহাদের সঙ্গে জড়িত উৎসবের দিনে গৃহে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের পাতে দুইটি শাক ভাত দেওয়ায় যে

আকুতি তাহাই ত মনুষ্যত্ব। একটা বিলাতী অর্থনৈতিক যুক্তির অনুরোধে পুরুষ-পরম্পরার্জিত ভারতীয় কৃষ্টির সেই অমূল্য সমাজ-বোধকে কণ্ঠরুদ্ধ করার পক্ষে পশ্চিমা অর্থশাস্ত্রীদের ও তাহাদের ভারতীয় শিষ্য-প্রশিষ্যগণের প্রদত্ত অমিতব্যয়িতা নিবারক ফতোয়া জীবনবেদের বেদজ্ঞ ও জীবন-রসের রসিক চিন্তাশীল সামাজিক ভারতীয়ের নিকট গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। সার্ব-জনীন দুর্গোৎসবের নামে আলো জ্বালাইয়া মাইক লাগাইয়া প্রতিবৎসর রিক্ত নিঃস্ব বাংলার অর্থের যে অপব্যয় হইতেছে, রেস্তোরাঁয় রেস্তোরাঁয় ধূমপানে ও পোষাক পরিচ্ছদ প্রসাধনে প্রতিদিন অর্থের যে অপচয় হইতেছে, শিক্ষার নামে বিদেশে এই গরীব দেশের যে অর্থ অপব্যয়িত হইয়া থাকে তাহার দিকে কি কাহারও দৃষ্টি পড়ে না! মানব হৃদয়ের সহজ সংস্কার ও স্বাভাবিক আবেগের বশে সামাজিক জীবনের প্রয়োজনে, দান-প্রতিদানের নিয়ম অনুসারে সরল সহজ স্বাভাবিক মানুষ উৎসবে, অনুষ্ঠানে আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশীকে লইয়া আহার আমোদ প্রমোদ করিবেই। ইহা কি অপব্যয়? যদি মিতব্যয়িতার দোহাই দিয়া এইসব সামাজিক ক্রিয়া কর্ম বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তবে তাহার পরিণাম শুভ হইবে না। সমাজের অন্তঃস্থলে যে সহৃদয়তা প্রীতি ও মানবতা এখনও অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত সমাজকে সরস ও স্নিগ্ধ রাখিয়াছে তাহার উৎস শুকাইয়া যাইবে এবং সমাজ রুক্ষ মরুভূমিতে পরিণত হইবে। ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে ইংরাজ-রাজ কুশাসন ও শোষণের দ্বারা এ দেশকে দরিদ্র করিয়া রাখিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যমদগর্বিত ইংরাজ বড়াই করিয়া বলিত—"ভারতে ইংরাজ শাসন নিয়তির বিধান এবং ঐ শাসনে ভারতবাসীরা সুখে শান্তিতে বাস করিতেছে এবং ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।"

শত বৎসর ইংরাজের শাসনাধীন থাকিয়াও তবে কেন ভারতে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ রহিয়াছে এই কৈফিয়তের সন্তোষজনক জবাব দেওয়া সুচতুর ইংরাজের পক্ষেও কঠিন ছিল। দেশব্যাপী ও শতাব্দীব্যাপী দারিদ্রের মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া পাছে দেশবাসীর দৃষ্টি ইংরাজের কু-শাসন ও শোষণের প্রতি নিবদ্ধ হয় এই ভয়ে এ দেশীয় কৃষকদের অমিতব্যয়িতা ও এদেশের জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি (law of diminishing returns) প্রভৃতিকে দারিদ্র্যের কারণ স্বরূপ দেখাইয়া ইংরাজেরা নিজেরা দোষমুক্ত ও দায়িত্ব মুক্ত হইতে চাহিয়াছেন। অর্থাৎ যা কিছু দোষ এ দেশের মাটির ও মানুষের, শাসকের বা শাসক ব্যবস্থার কোন ত্রুটি নাই। ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের ফলে জমি দিতেছে কম, আর যাহাও বা জমি দিতেছে অমিতব্যয়ী কৃষক তাহাও উড়াইয়া ফেলিতেছে। কি চমৎকার ব্যাখ্যা! কু-শাসনের কলঙ্ক মোচনের উদ্দেশ্যে এখানে অর্থনৈতিক মতবাদ ও সূত্র বেশ সুবিধাজনকভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। কূটনীতি কুশল ইংরাজের হয়ত আর একটা সূক্ষ্ম গূঢ় অভিসন্ধিও ছিল। ভারতীয় সভ্যতার মূলে যে ধর্ম ও ধর্মানুগ সমাজ-ব্যবস্থা তাহাকে বিপর্যস্ত করিতে না পারিলে ইংরাজের ভারত বিজয় সম্পূর্ণ হয় না। ভারতীয় কৃষ্টির মর্মমূলে, তাহার অন্তরের অন্তঃপুরে অভিযান চালাইবার গোপন ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। ইউরোপীয়েরা অন্যত্র দেশীয়দিগকে ধর্মান্তরিত করিয়া, তাহাদের সামাজিক কাঠামো ভাঙিয়া দিয়া তাহাদের ভাবী রাষ্ট্রিক ও আর্থিক পুনরুত্থানের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। ভারতের প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা, চিরাচরিত উৎসব অনুষ্ঠান গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ প্রভৃতি ভাঙিয়া দিয়া ভারতীয়দিগকে স্ব ধর্ম-ভ্রষ্ট, আত্ম-বিস্মৃত, পরানুকরণপ্রিয় আধা-ফিরিঙ্গি জাতিতে পরিণত করিতে পারিলে ভারতের পুনরুত্থান আর সম্ভব হইত না এবং সাম্রাজ্যবাদ কায়েম হইতে পারিত। কৃষকদের অমিতব্যয়িতার পরিণামের বিভীষিকা দেখাইয়া, সংস্কারের নামে, ভারতীয় সমাজ জীবনের ভিত্তিমূলে পরোক্ষভাবে

আঘাত হানিবার যে অপকৌশল রহিয়াছে অর্থনৈতিক বুলির মধ্যে তাহার কিছুটা লক্ষ্য করা যায় না কি? মান্ধাতার আমল হইতে অবিরত কর্ষিত হওয়ার ফলে পুরাতন মাটির উর্বরতার কিঞ্চিৎ হ্রাস ঘটা অবশ্য অসম্ভব নয়। অন্যান্য স্বাধীন দেশের প্রাচীন মৃত্তিকায় আধুনিক যে সব বৈজ্ঞানিক প্রতীকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে এদেশে তাহা কেন হয় নাই তাহার কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। অমিতব্যয়িতাকে বা ঋণগ্রস্ততাকে আমরা সমর্থন করিতেছি ইহা যেন কেহ মনে না করেন। তবে যাহার কোন সঞ্চয় সম্বল নাই তাহার পক্ষে ব্যয় মানেই ঋণ (সে ব্যয় যে কোন মহদুদ্দেশ্যেই হউক না কেন) এবং ঋণ করিয়া যে ব্যয় করে তাহাকে অমিতব্যয়ী বলিয়া অভিযুক্ত করা কঠিন নয়। বৈদেশিক শাসনের চাপে এক অজ্ঞাতপূর্ব শোষণ প্রক্রিয়ায় এত দীর্ঘকাল এমন প্রবলবেগে ভারতীয়দের রক্তমোক্ষণ হইতেছিল যে তাহাদের আর সৎ বা অসৎ কোন কাজেই কিছু ব্যয় করার শক্তি রহিল না। বিমূঢ় কৃষককে এরূপ নিরুপায় রিক্ততার মধ্যে আনিয়া তাহাকে খরচ করিতে প্রকারান্তরে বাধ্য করাইয়া আবার খরচ বাহুল্যের অপরাধে তাহাকেই অমিতব্যয়ী বলিয়া গালি দেওয়া হয় এ কেমন ন্যায়? ভারতীয় আর্থিক সমস্যার বিশ্লেষণে মাটীর অনুৎপাদকতা ও মানুষের অমিত ব্যয়িতার উপরে অযথা অতিরিক্ত জোর দেওয়া হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রচলিত আর একটি কুসংস্কার হইতেছে এই যে ভারত অতিপ্রজ দেশ অর্থাৎ এখানে জনাধিক্য ঘটিয়াছে। এই মতবাদের পিছনে ও হয়ত ছিল ব্রিটিশ শাসকের গূঢ় অভিসন্ধি। প্রজাবৃদ্ধির মতবাদ এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করে যে দেশের দৈন্যদুঃখের কারণ জনাধিক্য অর্থাৎ জনসাধারণের দুর্দশার জন্য দায়ী তাহারা নিজেরাই। এ ক্ষেত্রেও শাসকেরা তাঁহাদের দায়িত্ব এড়াইয়া প্রজাদের মাথায় দোষের বোঝা চাপাইয়াছেন। লোকসংখ্যার বৃদ্ধি এ দেশের আর্থিক অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ্ যদি যথাযথ ব্যবহৃত হয় এবং ভারতীয়দের ভোগে লাগে, মাথা-ভারী প্রশাসনের অনাবশ্যক ব্যয়ভারের যদি লাঘব ঘটে, বিদেশী শিল্পী ও বণিকের স্বার্থে যদি দেশের আর্থিক নীতি নিয়ন্ত্রিত না হইত, এবং যদি এক শ্রেণীর অতিলাভের লোভ সংযত হয় তবে এ দেশের লোকের সংস্থান এ দেশেই হইতে পারে। পৃথিবীতে এমন দেশ আছে যাহার লোকসংখ্যা উক্তদেশের আয়তন ও প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় অনুপাতে ভারতের জনসংখ্যার চেয়ে বেশী, তথাপি সেই ভূখণ্ডের অধিবাসীর বৈষয়িক জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ অর্থাৎ জীবন-যাত্রার মান উঁচু। ইহা কিরূপে সম্ভব হইয়াছে। গ্রীষ্ম প্রধান ভারতে অপেক্ষাকৃত কম বয়সে যৌবনোদ্গম হয় এবং এ দেশে বিবাহ প্রায় সার্বজনীন (সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব এবং সংখ্যা অবশ্য ভুলিবার নয়)। বিবাহ-সংস্কারের স্বাভাবিকতা চিরদিন এ দেশে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। প্রজাবৃদ্ধির নিবারণ কল্পে আজকাল অনূঢ়ত্ব, অধিক বয়সে বিবাহ এবং কৃত্রিম প্রণালীতে জন্ম-নিরোধ প্রভৃতির বিধান দেওয়া হইতেছে। এ সম্পর্কে অন্ততঃ এইটুকু বলা যায় যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে জোর করিয়া রুদ্ধ করিতে গেলে তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অস্বাভাবিক তির্যক পথে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। তাহাতে ব্যক্তির ও সমাজ-জীবনের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ন হয়। স্নায়ু পীড়া, যৌন-ব্যাধি, ব্যাভিচার ও গুপ্ত-পাপ হইতেছে অবদমনের পরোক্ষ ফল। ইহাতে সমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অকল্যাণ যে পরিমাণে ঘটে তাহার তুলনায় জনাধিক্য জাত দৈন্যদুঃখ অপেক্ষাকৃত কম অমঙ্গল আনে। দারিদ্র্য নিশ্চয়ই অভিশাপ, কিন্তু তাহার চেয়েও বড় অভিশাপ স্নায়বিক অসুস্থতা, যৌন-বিকার, কুৎসিৎ ব্যাধি, চিত্তের দৈন্য, হৃদয়ের হাহাকার,

আত্মিক রিক্ততা ও সমাজের অন্তরে গুপ্ত-পাপের পঙ্কিল প্রবাহ। দারিদ্র-দোষে কর্ম-দক্ষতার আংশিক ও সাময়িক অপচয় ঘটিতে পারে, কিন্তু যৌন ব্যাধিতে পুরুষানুক্রমে উহার মূল ক্ষয়িত হইতে থাকে। আর একটি কথাও এ সম্পর্কে প্রণিধান যোগ্য। রাষ্ট্রিক ও বৈষয়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ধারের ও যেমন মূল্য আছে, ভাবেরও তেমনই মূল্য আছে। নিছক সংখ্যার জোরে যে চীন ও ভারত কোনদিন ইউরোপীয় জাতিদের সঙ্গে টক্কর দিতে পারে এ আশঙ্কা শ্বেতজাতির মধ্যে বহুদিন যাবৎ কাজ করিতেছিল। Yellow Peril বা "পীতাতঙ্ক" শব্দটি নিরর্থক নয়, অমূলক ও নয়। অর্থনৈতিক তত্ত্বের দোহাই দিয়া ভারতের প্রজাবৃদ্ধির গতিকে প্রতিহত করা ও ইউরোপীয় স্বার্থের অনুকূল। রাষ্ট্রীয় আর্থিক এমন কি দার্শনিক মতবাদের মধ্যে পর্যন্ত "অহং" আত্মগোপন করিয়া থাকে অর্থাৎ আত্মরক্ষার ও স্বার্থপুষ্টির প্রেরণা নিজের অজ্ঞাতসারে অতি সূক্ষ্মভাবে ক্রিয়া করিতে থাকে। মালথুসীয় নীতির প্রয়োগ, পরিবার-পরিকল্পনা, জন্ম-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির সঙ্গে সেই স্বার্থবুদ্ধির সূক্ষ্ম যোগ আছে কিনা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। যে দেশে ব্রহ্মচর্যের আদর্শ শাস্ত্রে ও সমাজে প্রশংসিত। লক্ষ লক্ষ লোক এখনও সন্ন্যাসী, পঞ্চাশোর্ধে বানপ্রস্থের ব্যবস্থা, বিধবার আমরণ কঠোর ব্রতপালনের বিধান। ধর্মার্থে দারপরিগ্রহের উপদেশ সে দেশে 'পরিবার পরিকল্পনার' বিকল্প কোন ব্যবস্থা সম্ভব নয় কি?

ভারত বিভাগ প্রশ্নটি যদি আমরা জনসংখ্যা-তত্ত্বের দিক দিয়া বিবেচনা করি তবে কি একথা বলা চলে না 'যে 'বর্ধিষ্ণু' মুসলমান ও 'ক্ষয়িষ্ণু' হিন্দু ভারত-বিভাগের জন্য আংশিকভাবে অন্ততঃ দায়ী? এই যুধ্যমান্ জগতে টিকিয়া থাকিতে হইলে সংখ্যার প্রয়োজন ও গুরুত্ব মানিতেই হইবে। খণ্ডিত ভারতের হিন্দুরা যেন একথা আর কখনও ভুলিয়া না যায়। সংখ্যা কমাইলেই যে উৎকর্ষ তদনুপাতে বাড়িতে থাকিবে ইহা মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। পরপর দুইটি বিশ্ব-যুদ্ধে বর্ধিষ্ণু জার্মাণ জাতির কাছে ক্ষয়িষ্ণু ফরাসীজাতিকে যে কিরূপ নাকাল হইতে হইয়াছে তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরদিন লেখা থাকিবে। পূর্ববঙ্গের কোন কোন ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছুদিন যাবৎ জন্ম সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল আর প্রতিবেশী মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছিল। তাহার ফলাফল আজ অত্যন্ত স্পষ্ট। বিদ্যা-বুদ্ধিতে, অর্থে-প্রভুত্বে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে শ্রেষ্ঠ হইয়াও পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা যে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর সম্প্রদায়ের কাছে নতি-স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ বাংলার উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য। পাঠান মোগল আমলে যাহা কেহ কল্পনাও করে নাই আজ তাহা রূঢ় বাস্তব। আরংজীবের মত হিন্দু-বিদ্বেষী শক্তিমান্ মুসলমান বাদশাহ পর্যন্ত ভারত বিভাগ স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। সংখ্যাধিক্যে কি না হইতে পারে? আমাদের নিবেদন এই যে "অতিপ্রজ ভারতের জনাধিক্যের" চলতি ও লোকপ্রিয় মতবাদ ধীরভাবে বিচার করিতে হইবে। চীনকে পশ্চিমা শক্তিজোট ভয় করে কেন? ইউরোপীয় মাপকাঠিতে চীনের লোকবল সন্দেহাতীত। দুইটা বড় যুদ্ধে যাহাদের লোকবল ক্ষয়িত হইয়াছে সেই সব ল্যাজকাটা শিয়ালদের উপদেশে প্রাচ্যজাতিরা যেন স্ব স্ব দেহের ভার লাঘব করার জন্য ব্যগ্র না হয়।

'বর্তমান'
সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যামূলক শিক্ষণীয় পাক্ষিক পত্রিকা
প্রতি সংখ্যা—দুই আনা
কার্যালয়: ১৮।২বি, ডালিমতলা লেন, কলিকাতা-৬

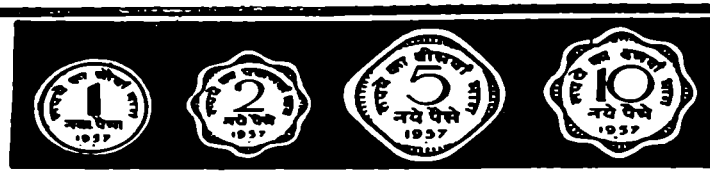

নতুন মুদ্রার প্রচলন-১লা এপ্রিল ১৯৫৭ হতে

বর্তমানে প্রচলিত মুদ্রার হিসাবে সঠিক মূল্য

১০ নয়ে পইসে—(এক টাকার এক-দশমাংশে)—১ আনা ৩·২ পাই
৫ নয়ে পইসে—(এক টাকার এক-বিশাংশে)— — —১·৬ পাই
২ নয়ে পইসে—(এক টাকার এক-পঞ্চাশতমাংশে) —০·৮৪ পাই
১ নয়ে পইসা—(এক টাকার এক-শতাংশে) — —০·৩২ পাই

১ পয়সা বা ½ আনা, ২ পয়সা বা ¼ আনা, ১ আনা, ২ আনা, ৪ আনা এবং ৮ আনার পুরানো মুদ্রাগুলি উপরে উল্লিখিত নতুন মুদ্রাগুলির সাথে সাথে চালু থাকবে। সিকি এবং আধুলির মুদ্রাগুলি যথাক্রমে ২৫ নয়ে পইসে এবং ৫০ নয়ে পইসের সঠিক সমতুল, সুতরাং সবরকমের লেনদেনের কাজে সেইভাবেই ব্যবহৃত হতে পারবে। টাকা দেওয়ার সময় এবং হিসেবের কাজে নতুন ও পুরানো দুরকমের মুদ্রাই বিধিবদ্ধ মুদ্রা (লিগ্যাল টেণ্ডার) হিসাবে গণ্য হবে।

মুদ্রাবদলের সুযোগ-সুবিধা

ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের অফিসগুলিতে, ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার শাখাগুলিতে, অন্যান্য এজেন্সী ব্যাঙ্কে, এবং ট্রেজারী ও সাব-ট্রেজারীগুলিতে মুদ্রাবদলের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে।

কেবলমাত্র ৪ আনা এবং তার ওপিতন সংখ্যার মূল্যের মুদ্রাগুলি, যেমন ৪ আনা, ৮ আনা, ১২ আনা, ১ টাকা ইত্যাদির বদলেই নতুন মুদ্রাগুলি দেওয়া হবে।

মুদ্রাবদলের তালিকা

মুদ্রাবদলের তালিকাটিতে আনা পাইয়ের মুদ্রার দেওয়া অঙ্কের নয়ে পইসের হিসেবে বিভিন্ন মূল্য (সংশোধিত ১৯৫৬ সালের ভারতীয় মুদ্রা আইনের ১৪ (২) ধারার নির্দেশ অনুযায়ী তালিকাকে সম্পূর্ণ করার পর) দেওয়া হয়েছে। ½ নয়া পইসা এবং তার চাইতে কম অংকগুলি বাদ দিয়ে এবং ½ নয়া পইসার বেশী অংকগুলিকে ১ নয়া পইসা হিসেবে ধরে নয়ে পইসের হিসেবের সমতুলের তালিকাকে সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

যে কোন একবারে টাকা দেওয়ার সময় নয়ে পইসের হিসেবে আনা পাইয়ের মূল্যের সমতুল।

বর্তমানে প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ আনা	পাই	নয়ে পইসের মুদ্রার সমতুল	বর্তমানে প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ আনা	পাই	নয়ে পইসের মুদ্রার সমতুল	বর্তমানে প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ আনা	পাই	নয়ে পইসের মুদ্রার সমতুল	বর্তমানে প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ আনা	পাই	নয়ে পইসের মুদ্রার সমতুল
০	৩	২	৪	৩	২৭	৮	৩	৫২	১২	৩	৭৭
০	৬	৩	৪	৬	২৮	৮	৬	৫৩	১২	৬	৭৮
০	৯	৫	৪	৯	৩০	৮	৯	৫৫	১২	৯	৮০
১ আনা		৬	৫ আনা		৩১	৯ আনা		৫৬	১৩ আনা		৮১
১	৩	৮	৫	৩	৩৩	৯	৩	৫৮	১৩	৩	৮৩
১	৬	৯	৫	৬	৩৪	৯	৬	৫৯	১৩	৬	৮৪
১	৯	১১	৫	৯	৩৬	৯	৯	৬১	১৩	৯	৮৬
২ আনা		১২	৬ আনা		৩৭	১০ আনা		৬২	১৪ আনা		৮৭
২	৩	১৪	৬	৩	৩৯	১০	৩	৬৪	১৪	৩	৮৯
২	৬	১৬	৬	৬	৪১	১০	৬	৬৬	১৪	৬	৯১
২	৯	১৭	৬	৯	৪২	১০	৯	৬৭	১৪	৯	৯২
৩ আনা		১৯	৭ আনা		৪৪	১১ আনা		৬৯	১৫ আনা		৯৪
৩	৩	২০	৭	৩	৪৫	১১	৩	৭০	১৫	৩	৯৫
৩	৬	২২	৭	৬	৪৭	১১	৬	৭২	১৫	৬	৯৭
৩	৯	২৩	৭	৯	৪৮	১১	৯	৭৩	১৫	৯	৯৮
৪ আনা		২৫	৮ আনা		৫০	১২ আনা		৭৫	১৬ আনা		১০০

মুদ্রাবদলের তালিকায় করা মতে ভগ্নাংশকে সম্পূর্ণ করার কাজটি কেবলমাত্র তখনই করার প্রয়োজন হবে, যখন লেনদেনের কারবারের শেষে, আনা এবং পাইয়ের হিসেবে দেয় যে কোনো পরিমাণকে নয়ে পইসেতে পরিবর্তন করতে হবে।

নতুন অথবা পুরানো, অথবা দুরকমের মুদ্রা মিলিয়ে, যে কোনো ভাবেই আপনি টাকা দিতে পারবেন। আপনার কাছে থাকা মুদ্রাগুলির উপরেই তা নির্ভর করবে। সুতরাং কোন লেনদেনের কারবারের শেষে যখন টাকা দেওয়ার প্রয়োজন হবে বা খুচরো পয়সা পেতে হবে, তখনই কেবল নীচে দেওয়া উদাহরণ মতে মুদ্রাবদলের তালিকাটি ব্যবহার করবেন।

উদাহরণ : (যে ক্ষেত্রে আনা/পাইএর হিসেবে দেয় টাকা দেখানো হয়েছে)

প্রত্যেকটি ১৯ আনা মূল্যের ১২টি জিনিষের মোট মূল্য হলো ১ টাকা ২ আনা। ক্রেতা সমগ্র টাকা পুরানো মুদ্রায় দিতে পারেন।

অথবা

১ টাকা ১২ নয়ে পইসে দিতে পারেন (মুদ্রাবদলের তালিকা অনুযায়ী ২ আনার সমতুল হলো ১২ নয়ে পইসে।)

উপরের উদাহরণটিতে ক্রেতা পুরানো মুদ্রায় ২ টাকা দিয়ে অবশিষ্ট ফেরৎ চাইতে পারেন। এখানে ১৪ আনা খুচরো পয়সা ফেরৎ দিতে হবে। এই পয়সা কেবল আনার মুদ্রায়,—অথবা নতুন মুদ্রায় অথবা নতুন ও পুরানো দুরকমের মুদ্রায় দেওয়া যেতে পারে। ধরে নিন, ৮ আনা পুরানো মুদ্রায় এবং বাকী ৬ আনা নতুন মুদ্রায় ফেরৎ দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে নতুন মুদ্রায় ৬ আনার সমতুল মুদ্রাবদলের তালিকা হতে খুঁজে বার করুন ; সেটি হলো ৩৭ নয়ে পইসে।

উদাহরণ : (যে ক্ষেত্রে নয়ে পইসের হিসেবে দেয় টাকা দেখানো হয়েছে)

ধরুন, একটি জিনিষের দাম হলো ১১ নয়ে পইসে। নতুন মুদ্রায় অথবা পুরানো মুদ্রার হিসেবে ১ আনা ৯ পাই দিয়ে এই দাম দেওয়া যেতে পারে। (মুদ্রাবদলের তালিকা অনুযায়ী ১ আনা ৯ পাইয়ের সমতুল হলো ১১ নয়ে পইসে)।

কোনো ব্যক্তি দেয় ১১ নয়ে পইসে দেবার সময় ২০ নয়ে পইসে দিলে তাকে ৯ নয়ে পইসে অথবা পুরানো মুদ্রার হিসেবে তার সমতুল ১ আনা ৬ পাই খুচরো ফেরৎ দিতে হবে।

১১ নয়ে পইসে দিতে হলে আপনি একটি সিকি দিয়ে খুচরো ফেরৎ চাইতে পারেন। চার আনা ২৫ নয়ে পইসের সমতুল। সুতরাং আপনাকে ১৪ নয়ে পইসে ফেরৎ নিতে হবে। এই পয়সা আপনি কেবল নতুন মুদ্রায় অথবা পুরানো মুদ্রায় ফেরৎ নিতে পারেন। মুদ্রাবদলের তালিকা অনুযায়ী ২ আনা ৩ পাই, ১৪ নয়ে পইসের সমান। এ ক্ষেত্রে একটি এক আনার মুদ্রা (৬ নয়ে পইসে) এবং নতুন মুদ্রায় ৮ নয়ে পইসে নেওয়া চলতে পারে।

মোট দেয় টাকার পরিমাণ হিসাব করে বার করার আগে আনা/পাই-এর হিসাবে দেখানো হার বা একক মূল্যকে পরিবর্তন করার প্রয়োজন হবে না।

উদাহরণ :

(১) প্রত্যেকটি তিন আনা মূল্যের ৫০টি দ্রব্য কিনলে প্রথমে টাকা/আনার হিসেবে মোট মূল্য বার করে নিন। আপনাকে মোট ৯ টাকা ৬ আনা দিতে হবে।

(২) আপনার কাছে যদি শুধু নয়ে পইসের মুদ্রা থাকে, তাহলে মুদ্রা বদলের তালিকা থেকে আপনি জানতে পারবেন, ৬ আনার সমতুল হলো ৩৭ নয়ে পইসে। সুতরাং আপনাকে ৯ টাকা ৩৭ নয়ে পইসে দিতে হবে।

তিন আনার সঠিক মূল্য (১৮¾ নয়ে পইসে) নিয়ে তাকে ৫০ দিয়ে গুণ করলে আপনি একই ফল পাবেন, কিন্তু আপনি যদি মুদ্রাবদলের তালিকায় দেওয়া ভগ্নাংশকে সম্পূর্ণ করে নিরূপিত তিন আনার সমতুলকে (১৯ নয়ে পইসে) ৫০ দিয়ে গুণ করেন তাহলে ভুল হবে।

সেইভাবেই আপনি যদি কারুর কাছ থেকে একই সময়ে আনা পয়সার মুদ্রায় হিসেবে বিভিন্ন হারে কয়েকটি জিনিষ কেনেন, প্রথমে টাকা আনা পাইয়ের হিসেবে মোট মূল্যের পরিমাণ জেনে নিন। নতুন মুদ্রায় টাকা দিতে হলে আনা পাইয়ের ক্ষেত্রে মুদ্রাবদলের তালিকার সাহায্য নিন।

এইগুলি মনে রেখে আপনি মুদ্রাবদলের হিসেবকে সহজ করে তুলতে পারবেন।

৩ আনা	... ...	২৫ নয়ে পইসে
৮ আনা	... ...	৫০ নয়ে পইসে
১২ আনা	... ...	৭৫ নয়ে পইসে
১ টাকা	... ...	১০০ নয়ে পইসে

উদাহরণ :

(১) ১০½ আনা দিতে হলে আপনি প্রথমে ৮ আনা বা ৫০ নয়ে পইসে দিতে পারেন। অবশিষ্ট ২½ আনা হলো ১৬ নয়ে পয়সার সমান।

(২) ৩৬ নয়ে পইসে দিতে হলে আপনি প্রথমে চার আনা বা ২৫ নয়ে পইসে দিন। তার পরে বাকী ১১ নয়ে পইসে ১ আনা ৯ পাই দিয়ে দিতে পারেন।

রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অ, আ, ক, খ

শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ

দ্বিতীয় পাঠ

ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্র ও রাষ্ট্রিক ক্ষমতার বিন্যাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্র—এক ইংলণ্ড ছাড়া প্রায় সকল দেশেরই শাসন-ব্যবস্থার একটা বিধি-নিবদ্ধ কাঠামো রহিয়াছে। এই কাঠামোর মৌলিক নথিকে বলা হয় রাষ্ট্র-তন্ত্র। ইহাকে মৌলিক বলা হয় এইজন্য যে ইহাই শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি, ইহাই দেশের চরম আইন—ইহা হইতে দেশে শ্রেষ্ঠতর আইন নাই এবং ইহাই দেশের সকল আইনের উৎস। ভারতে ইংরাজ রাজত্বের অবসান হইলে প্রায় আড়াই বৎসর স্বাধীন রাষ্ট্রের কোন রাষ্ট্রতন্ত্র ছিল না—কেননা ঐ সময় তাহার প্রণয়ন চলিতেছিল। অবশেষে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী হইতে ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্র প্রবর্তিত হয়। ভারতের রাষ্ট্র-তন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে যে শুদ্ধ শাসন-ব্যবস্থার স্থূল কাঠামোটি যে আছে তাহা নহে, অনেক ব্যাপারে অনেক খুঁটিনাটি ব্যবস্থাও ইহাতে রহিয়াছে। এই রাষ্ট্র-তন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়াই ভারতের শাসন-ব্যবস্থার সহিত পরিচিত হইতে পারা যায়।

শাসন-ব্যবস্থা সাধারণতঃ ত্রি-অঙ্গী—এই পরিচয় লাভের জন্য প্রথমেই জানা দরকার ভারত রাষ্ট্রের ক্ষমতা-বিন্যাস। প্রতি রাষ্ট্রেই শাসন-ক্ষমতার তিনটি ভাগ করা হয়; (১) আইন-প্রণয়িনী শাসন-ক্ষমতা, (২) কার্য-নির্বাহনী শাসন-ক্ষমতা ও (৩) বিচার-বিষয়িনী শাসন-ক্ষমতা। আইন-বিভাগ, কার্য-নির্বাহক বিভাগ ও বিচার বিভাগ এই তিনটি যেন সমগ্র শাসন-কলেবরের তিনটি প্রধান অঙ্গ বিশেষ। অন্যান্য রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থায় ও এই তিনটি আঙ্গিক বিভাগ আছে অর্থাৎ শাসন-ক্ষমতা এই তিন প্রকার কর্তৃত্বের অধীনে ফেলা হইয়াছে। এই প্রকার ত্রি-অঙ্গী ক্ষমতা-বিন্যাসের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কিছুই নাই। কিন্তু ক্ষমতা-বিন্যাসের যে বৃহৎ ব্যাপার তাহা হইল শাসন-যন্ত্রের উর্ধ্ব-নিম্ন-ভেদে। কোন কোন পরিবারে যেমন ব্যবস্থা আছে যে পরিবারের যে কর্তা তাহার হস্তেই সকল ক্ষমতা, পরিবারের অন্য কাহারও হস্তে ক্ষমতার লেশমাত্র নাই, তেমনি এমন রাষ্ট্রও আছে যেখানে যাবতীয় শাসন-ক্ষমতা যাহার উপরই ন্যস্ত, তাহার ত্রি-অঙ্গী বিভাগ থাকিলেও এক ব্যতীত দ্বিতীয় রাষ্ট্রিক কর্তার উপর কোন ক্ষমতাই ন্যস্ত থাকে না।

ঐক্যশাসন ও যুগ্ম-শাসন পদ্ধতি—আবার এমন অনেক রাষ্ট্র আছে যেখানে একই সামগ্রিক শাসন-কর্তৃত্বের সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক স্থানীয় কর্তৃত্বের ও ব্যবস্থা থাকে এবং সামগ্রিক কর্তার যে শাসন ক্ষেত্র তাহা হইতে স্থানীয় কর্তাদের শাসন ক্ষেত্র অনেক পৃথক। প্রথমোক্ত ব্যবস্থাকে বলা যাইতে পারে ঐক্য-শাসন পদ্ধতি—যার প্রকৃষ্ট

উদাহরণ ইংলণ্ড; আর শেষোক্ত ব্যবস্থাকে বলা যাইতে পারে যুগ্ম-শাসন পদ্ধতি। যাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মার্কিন যুক্তরাজ্য।

ভারতের কি ঐক্য না যুগ্মশাসন?—ভারতবর্ষের শাসন-পদ্ধতি ঠিক ঐক্য-ব্যবস্থারও নয়। ঐক্য-ব্যবস্থার নয় এইজন্য যে রাষ্ট্রতন্ত্রের ১ম ধারাতেই বলা হইয়াছে যে ভারত এক রাজ্য-সমষ্টি। ইহার অর্থ হইল এই যে রাজ্যহীন ভাবে ভারতের এক তিলার্দ্ধ ভূমি ও শাসিত হইতে পারে না—সেই রাজ্যের শাসন-ক্ষমতা যা-ই হউক না কেন, ভারত-রাষ্ট্র রাজ্যের সমষ্টি কোন স্থানের সমষ্টি নয়। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শাসন-ব্যবস্থা যুগ্ম-পদ্ধতিও নয়—কেননা রাজ্য সমূহের যে শাসন-ক্ষমতা তাহাদের মধ্যে কর্তৃত্বের হিসাবে অনেক প্রভেদ ত আছেই, তাহা ছাড়া তাহাদের নির্ধারিত শাসনক্ষেত্রে ও তাহাদের কর্তৃত্বকে নানাভাবে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। স্ব স্ব নির্ধারিত ক্ষেত্রে দুইটি স্ব স্ব প্রধান শাসন শক্তি থাকিলে যে যুগ্ম-শাসন ব্যবস্থা হয় ভারতে সেই রাষ্ট্রিক ক্ষমতার যথার্থ দ্বিত্ব নাই বলিয়াই এখানকার শাসনকে যুগ্ম-শাসন ও বলা যায় না। যুগ্ম-শাসনের কাঠামোতে এখানে ঐক্য-শাসনের রাষ্ট্রিয় দৃষ্টিকে বেশী পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

ভারতে রাজ্যের শ্রেণীবিভাগ—ভারতের শাসন ব্যবস্থায় তাই কাঠামো হিসাবে দুইটি শাসন-যন্ত্রকে কায়েম করা হইয়াছে। এক সমগ্র ভারতের এলাকা লইয়া একটি সমষ্টি বা কেন্দ্রীয় শাসন অপরটি নির্ধারিত সঙ্কীর্ণ এলাকা লইয়া কতকগুলি রাজ্য-শাসন প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ইংরাজ আমলে যাহাকে বলা হইত প্রদেশ ক দেশীয় রাজ্য মোটামুটি স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র-তন্ত্রে তাহারই নাম দেওয়া হইয়াছে রাজ্য। এই রাজ্য গুলি শ্রেণীর যথা :—ক শ্রেণীয়, খ শ্রেণীয়, গ শ্রেণীয় ও ঘ শ্রেণীর রাজ্য। ক শ্রেণীতে ১০টি, খ শ্রেণীতে কাশ্মীর লইয়া ৯টি, গ শ্রেণীতে ১০টি এবং ঘ শ্রেণীতে শুধু আন্দামান-নিকোবর দ্বীপ। কেন্দ্রীয় বা সমষ্টি শাসনের সম্পর্কে ইহাদের যে ক্ষমতা পার্থক্য তাহার উপর নির্ভর করিয়াই এই রাজ্য-সমূহের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। সোজা কথায় বলা যায় যে গ ও ঘ শ্রেণীর রাজ্যদের স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও ইহাদের শাসনকাঠামো কেন্দ্রীয় সমষ্টি কর্তৃপক্ষ দ্বারাই পরিচালিত হয়। কেবলমাত্র ক ও খ শ্রেণীর রাজ্য-সমূহেরই স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রিক ক্ষমতা রহিয়াছে।

আইন প্রণয়নী ক্ষমতার তিনটী তালিকা—কেন্দ্রীয় শাসন হইতে ক শ্রেণীর রাজ্য-সমূহের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। তাহাদের স্ব স্ব আইন-প্রণয়িনী ক্ষমতা নির্ধারণ করিয়া রাষ্ট্রতন্ত্রে যাবতীয় আইন-প্রণয়নের ক্ষমতাকে তিনটি তালিকাতে বিভক্ত করা হইয়াছে। একটি কেন্দ্রীয় তালিকা. অপরটি রাজ্য তালিকা এবং তৃতীয়টি উভয়-ক্ষেত্রী তালিকা। কেন্দ্রীয় তালিকার, ৯৭টি ব্যাপারে রাজ্য শাসনের আইন প্রণয়নের কোন ক্ষমতা নাই। তেমনি রাজ্য তালিকার ৬৬টি ব্যাপারে কেন্দ্রীয় শাসনের আইন প্রণয়নের কোন ক্ষমতা নাই এবং উভয়-ক্ষেত্রীয় তালিকাল ৪৭টি ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য শাসন

উভয়েরই আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে তবে এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ হইলে রাজ্যের আইনই নাকোচ হইবে এবং কেন্দ্রীয় আইনই বলবৎ থাকিবে, ইহাই রাষ্ট্রতন্ত্রের বিধান।

কেন্দ্র ও রাজ্যের কার্যানির্বাহনী ও বিচার ক্ষমতা—ইহা গেল আইন-প্রণয়নী ক্ষমতার কথা। কার্য-নির্বাহক ক্ষমতা এই আইন প্রণয়নী ক্ষমতারই অনুসারী অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য শাসন সমূহের যেসব ব্যাপারে স্ব স্ব আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে সেই সব ব্যাপারে তাহাদের স্ব স্ব কার্য-নির্বাহনী ক্ষমতাও রহিয়াছে। বিচার-বিষয়ক ক্ষমতার কথা স্বতন্ত্র—কেননা কেন্দ্রীয় শাসনের যে আইন-প্রণয়িনী বা কার্য-নির্বাহনী ক্ষমতা তাহার একমাত্র বিচার হইতে পারে সুপ্রিমকোর্টে কিংবা সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতা ন্যস্ত কোন হাইকোর্টে, অন্যত্র নয়। অথচ রাজ্য-শাসন ব্যাপারের ও চূড়ান্ত বিচার হইতে পারে সুপ্রিমকোর্টে। এক কথায় শাসনকার্যের বিচারাঙ্গে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যশাসন ভাগের সার্থকতা বিশেষ নাই। বিচার অনেকাংশেই রাজ্য-শাসনের ব্যাপার এবং রাজ্য নাই এমন তিলার্ধ ভূমিও কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে নাই।

তৃতীয় পাঠ

ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন

রাষ্ট্রপতির ভূমিকা ও তাৎপর্য—ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন, এমনকি সকল রাজ্যসমেত দেশের সমস্ত শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করিতেছেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতির আসনে যিনি আসীন থাকেন তিনি রাজা ন'ন কিন্তু বলিতে গেলে তিনি রাজার স্থলবর্তী। প্রাচীনকালে এবং মধ্যযুগে সকল দেশেই রাজা থাকিতেন, তিনি দেশ শাসনে দণ্ডমুণ্ডের বিধাতাভাবে অধিষ্ঠান করিতেন, তাহার ইঙ্গিতে কিংবা তাহার ইচ্ছায় সব শাসনকার্যের পরিচালনা হইত। আধুনিক কালে এ প্রকার রাজা কোন দেশেই নাই। আজ যে কয়টি স্বল্পমাত্র দেশে রাজা আছেন তাহাদের আর সেই অবধি শাসন-ক্ষমতা নাই, তাহাদের নিজেদের হস্তে ত শাসনকার্য নাই-ই এবং দুএকটি ব্যাপার ছাড়া তাহাদের যে শাসন-ক্ষমতা আছে তাহা ও প্রয়োগ করিতে অন্য শাসন কর্তৃপক্ষের পরামর্শ অনুসারে। কিন্তু তাহা হইলে ও আইনের বশবর্তী যে আধুনিক রাজা তাহারও আধুনিক রাষ্ট্রে একটা ভূমিকা আছে। আধুনিক রাজা হইলেন দেশের জাতীয় ঐক্যের প্রতীক এবং রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক শিরোভূষণ। পৃথিবীর যে দেশেই আজ বংশ-পারম্পরিক রাজার স্থান নাই সেখানেই জাতীয় ঐক্যের প্রতীক স্বরূপ কিংবা রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক শিরোভূষণরূপে রাষ্ট্রপতি বা অনুরূপ কোন উপাধিধারীকে পদাভিষিক্ত করা হয়। ভারতের রাষ্ট্রপতি পদাভিষিক্ত হইবার পূর্ব পর্যন্ত ভারতের একজন সাধারণ নাগরিক মাত্র, কোন কুল-মর্যাদার জন্য তিনি নির্বাচিত হন না। নির্বাচিত হইলেও

তিনি পাঁচ বৎসরের বেশী সে পদে অভিষিক্ত থাকিতে পারেন না এবং রাষ্ট্রতন্ত্রের ৫৬ ধারা মতে রাষ্ট্রতন্ত্রের অমান্য করার দায়ে নির্ধারিতভাবে তাহাকে পদচ্যুতও করা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতি—নির্বাচনের মোটামুটি ব্যবস্থা হইল এই :—(১) রাষ্ট্রপতি কোন গণভোটের ফলে নির্বাচিত না হইয়া এক এক নির্বাচন-গোষ্ঠী দ্বারা নির্বাচিত হইবেন ; (২) এই নির্বাচন-গোষ্ঠীতে স্থান পাইবেন ক এবং খ শ্রেণীর রাজ্যের বিধান-সভার (গ শ্রেণীর রাজ্যের বিধানসভা থাকিলে তাহাদের বিধান-সভার ও) নির্বাচিত সভ্যেরা এবং কেন্দ্রীয় শাসনের দুইটি আইন-সভার (লোকসভা ও রাষ্ট্র-পরিষদ নির্বাচিত সভ্যেরা ; (৩) রাজ্যের বিধাবসভার নির্বাচিত প্রত্যেক সভ্যের ততগুলি ভোটসংখ্যা থাকিবে যাহা রাজ্যের লোকসংখ্যাকে বিধানসভার নির্বাচিত সভ্যসংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল পাওয়া যায় তাহার হাজার ভাগের এক ভাগ ; (৪) বিধানসভার সভ্যদের ভোটসংখ্যার যে সমষ্টিসংখ্যা তাহা কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচিত সভ্যদের ভোটসংখ্যার সমষ্টি অঙ্কের সমান হইবে এবং তাহা কেন্দ্রীয় সভার নির্বাচিত সভ্যদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক্ যে কোন রাজ্যে বিধান সভার সভ্যসংখ্যা দ্বারা লোকসংখ্যা ভাগ করিলে ভাগফল হয় ৭৫০০০। সেক্ষেত্রে সে রাজ্যের বিধানসভার প্রতি সভ্যের ভোটসংখ্যা হইল ৭৫, অন্যান্য রাজ্যে হয়ত অনুরূপ সংখ্যা দাঁড়াইল ৭৬, ৭৪, ৭৩। এইরূপে সকল রাজ্যের বিধানসভার সভ্যদের ভোটসংখ্যার সমষ্টি দাঁড়াইল ১,৫০,০০০। ধরা যাক্ কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা ৬০০ এবং যেহেতু তাহাদের ভোটসংখ্যার সমষ্টি ও ১,৫০,০০০ হওয়া আবশ্যক, প্রতি কেন্দ্রীয় সভার সদস্যের ভোটসংখ্যা দাঁড়াইল ২৫০।

নির্বাচন জটিলতার তাৎপর্য—উপরে বর্ণিত নির্বাচন ব্যবস্থা যে কিছুটা জটিল হইয়া পড়িয়াছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য হইল বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাবের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। লক্ষ্যের ব্যাপার এই যে এই জটিলতার ফলে যে রাজ্যের বিধানসভা যত বেশী সভ্য-বহুলই হউক না কেন, একই সভ্যকে বহু ভোটের অধিকার দেওয়ায় সেই একটি বা ততোধিক সভ্য-বহুল বিধানসভাগুলি রাষ্ট্রপতির নির্বাচনকে অসঙ্গতভাবে প্রভাবান্বিত করিতে পারিবে না। তাহা ছাড়া বিধানসভার সদস্যদের ভোটসংখ্যার সমষ্টি কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যদের ভোটসংখ্যার সমষ্টি সমান হওয়ায় কেন্দ্রীয় আইনসভা কিংবা রাজ্যের বিধানসভাগুলি কেহই অসঙ্গতভাবে নির্বাচনকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে না। ইহা ব্যতীত আরও ব্যবস্থা এই যে প্রকাশ্যে কেন ভোট গৃহীত হইবে না। আবার ভোটে জয়-পরাজয় কেবলমাত্র সংখ্যাধিক্য দ্বারা নির্দিষ্ট হইবে না—উপস্থিত সভ্য-গোষ্ঠীর প্রদত্ত ভোটসংখ্যার অর্ধেকের বেশী ভোট না পাইলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কোন একার জয় ঘোষণা করা হইবে না এবং যাহাতে

ঐরূপ অর্ধেকের বেশী ভোট কোন প্রার্থীর পক্ষে হইতে পারে সেজন্য সর্বাপেক্ষা কম ভোটপ্রাপ্ত যে প্রার্থী তাহার নাম বাতিল করিয়া সেই ভোটলিপিতে যে পরের প্রার্থীর নাম আছে তাহার পক্ষে সেই ভোটগুলি গ্রহণ করিয়া পুনঃপুনঃ ভোট গণনার ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই প্রকার ভোট স্থানান্তরিত করিয়া যে সংখ্যাধিক্য নির্ধারণ করা যায় তাহাকে বলা হয় অনুপাতিক নির্বাচন। ইহার তাৎপর্য হইল এই যে এক্ষেত্রে যত ব্যক্তির নির্বাচন হইবে, ভোটদাতাদিগের মধ্য হইতে সেই অনুপাতে ভোট পাইলেই নির্বাচনে জয় হয়। এই আনুপাতিক নির্বাচনের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ভোটলিপিতে ভোটার আপন আপন অভিরুচির ক্রমিকতা জ্ঞাপন করিয়া একাধিক ব্যক্তির নামে ভোট প্রদান করিবে।

আনুপাতিক নির্বাচন—ভারত রাষ্ট্রের যত কার্য-নির্বাহনী ক্ষমতা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতির নিজের না হইলেও রাষ্ট্রপতির নামেই ঐসব ক্ষমতার প্রয়োগ করা হয়। রাষ্ট্রপতি ভারত রাষ্ট্রের প্রতীক কিন্তু বিশেষভাবে রাষ্ট্রের কার্য নির্বাহক অঙ্গের প্রতীক। এইজন্য রাষ্ট্রের কোন ব্যক্তিগত অভিধান দিতে হইলে রাষ্ট্রপতি দ্বারা তাহা দিতে হয়। যদি কাহারো ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমা করিতে হয়, তাহা হইলে ভারতের রাষ্ট্রপতির নামে করিতে হয় এবং দেশের অভ্যন্তরে যদি কাহারো রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি হয় তাহা হইলে ইহা বাহ্যতঃ রাষ্ট্রপতির সঙ্গেই চুক্তি হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়।

উপরাষ্ট্রপতি—ভারতের রাষ্ট্র বিধানে একজন উপরাষ্ট্রপতিরও ব্যবস্থা আছে। এই উপরাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় আইন সভার সংযুক্ত অধিবেশনে আনুপাতিক নির্বাচন রীতিতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন—সে নির্বাচনে রাজ্যের বিধানসভার সদস্যদের কোন ভোটাধিকার নাই। উপরাষ্ট্রপতিরূপে যিনি নির্বাচিত হইবেন তিনিই আবার কেন্দ্রীয় শাসনের উর্ধতম আইনসভা অর্থাৎ রাষ্ট্র-পরিষদের সভাপতিত্ব করিবেন। যদি রাষ্ট্রপতি কখনও পদাভিষিক্ত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন, কিংবা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন কিংবা পদ-বিচ্যুত হন, কিংবা যদি তিনি সাময়িকভাবে অসুস্থতার দরুণ বা অন্য কারণে তাহার পদোচিত কর্তব্য পালনে অসমর্থ হয়েন তবেই উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির স্থান গ্রহণ করেন এবং সেইরূপে রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করিলে তাহাকে রাষ্ট্র-পরিষদের সভাপতি-ত্বের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। অন্যথা পরিষদের সভাপতিত্ব করাই উপরাষ্ট্র-পতির একমাত্র সম্পাদ্য কাজ।

সংসদ ও তাহার দুই শাখা—সকল শাসন ব্যবস্থায় যেমন, ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায়ও তেমনি, আইনসভাই হইল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শাসনাঙ্গ। ভারতের আইন-সভার নাম পার্লামেন্ট বা সংসদ। এই সংসদদের দুইটি শাখা :—(১) লোকসভা, (২) রাষ্ট্র-পরিষদ। রাজনীতিকের ভাষায় লোকসভাকে বলা হয় নিম্ন শাখা এবং রাষ্ট্র-

পরিষদকে বলা হয় উর্ধতন শাখা। এই নিম্ন-উর্ধ বর্ণনার তাৎপর্য একেবারে ঐতিহাসিক। ফলতঃ পৃথকভাবে বিচার করিতে গেলে রাষ্ট্র-পরিষদ অপেক্ষা লোকসভার ক্ষমতাই বেশী ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। সকল দেশের আইনসভার কল্পনাই ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের সহিত জড়িত। সেই ইংলণ্ডেই বহু শতাব্দী হইতে আইনসভার দুইটী অঙ্গ চলিয়া আসিতেছে। তাহার একটি শাখা হাউস অব কমন্স, অপরটি হাউস অব লর্ডস্। কমন্স সভায় সাধারণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইত বলিয়া তাহাকে বলা হইত আইনসভার নিম্ন শাখা এবং লর্ডস্ সভায় অভিজাত বংশীয়েরা স্থান পাইতেন বলিয়া তাহাকে বলা হইত উর্ধতন শাখা। এই ইংলণ্ডের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়াই আইনসভার নিম্ন শাখা ও উর্ধ শাখা করার উৎপত্তি হইয়াছে।

সংসদের আইন প্রণয়নী ক্ষমতার পরিধি—সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় তালিকা ও উভয়-কেন্দ্রীয় তালিকা দ্বারা নির্ধারিত, অর্থাৎ রাষ্ট্রতন্ত্রে এই দুইটি তালিকাতে যে যে ব্যাপারের উল্লেখ আছে, সংসদ সেই সেই ব্যাপারেই আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। কেন্দ্রীয় শাসনের সকল আইন সংসদের এই দুই শাখা মিলিয়াই প্রণয়ন করিবার অধিকার রাখেন। যদিও যে কোন শাখায় যে কোন আইনের খসড়া বা প্রস্তাব উপস্থিত করা যাইতে পারে, তাহা হইলেও এক শাখায় যাহা অনুমোদিত হইল অন্য শাখায় তাহা অনুমোদিত না হইলে কোন প্রস্তাবিত আইন সংসদ কর্তৃক পাস হইয়াছে বা বলবত্তা প্রদত্ত হইয়াছে একথা মনে করা যাইতে পারে না।

দুই শাখার বিরোধ হইলে সংসদের পদ্ধতি—যদি সংসদের কোন এক শাখায় এই আইনের খসড়া অনুমোদিত হইবার পর অন্য শাখায় তাহা প্রত্যাখ্যাত হয় কিংবা পরিশোধিত আকারে গৃহীত হয় এবং সেই পরিশোধনে প্রথমোক্ত শাখার আপত্তির ফলে দুই শাখার মধ্যে মতানৈক্য জন্মে, কিংবা যদি অন্য শাখাতে ছয় মাসের ভিতর কোন অনুমোদন প্রত্যাখ্যান কিছুই না করা হয়, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সংসদের দুই শাখার সম্মিলিত অধিবেশনের ব্যবস্থা করিতে পারেন এবং সেই সম্মিলিত অধিবেশনের ভোটাধিক্যানুসারেই প্রস্তাবিত আইনটি সংসদের অনুমোদন লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে।

উপরে সংসদের দুই অঙ্গের পরস্পর বিরোধ সমাধানের যে সূত্র দেওয়া হইল তাহার একটি মাত্র গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম আছে। তাহা হইল অর্থঘটিত আইনের প্রস্তাব লইয়া। রাষ্ট্রতন্ত্রের ১০৯ ধারা মতে অর্থ-ঘটিত কোন আইনের প্রস্তাব প্রথমে রাষ্ট্র-পরিষদে উপস্থিতই করা যাইতে পারে না এবং লোকসভায় সেইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর

তবে তাহা পরিষদের কাছে অর্থ-আইনটি সম্বন্ধে সুপারিশের জন্য প্রেরিত হইবে। এমতাবস্থায়—

> **অর্থঘটিত আইন প্রণয়নের পদ্ধতি**—যদি লোকসভা পরিষদের সুপারিশ গ্রহণ করেন তবে ঐ সুপারিশানুসারে, এবং যদি এরূপ সুপারিশ গ্রহণ না করেন তবে লোকসভার মতানুসারে এবং প্রস্তাব প্রেরণের চৌদ্দ দিনের ভিতর যদি পরিষদ কোন সুপারিশ বা উচ্চবাচ্য না করেন তবে ও লোকসভার মতেই সেই অর্থ-ঘটিত আইন সমগ্র সংসদের উভয় শাখার পক্ষেই বলবত্তা লাভ করিয়াছে, ইহাই ধরিয়া লইতে হইবে।

এই অর্থ-ঘটিত আইন কাহাকে বলা হইবে? রাষ্ট্রতন্ত্রের ১১০ ধারায় তাহার বিশদ ব্যাখ্যা রহিয়াছে। মোটামুটি বলা চলে যে যে আইনের প্রস্তাবে কর স্থাপন, কর বৃদ্ধি, কর হ্রাস বা কর রদ ইত্যাদি ব্যাপার, কিংবা ভারতের পাকা তহবিল হইতে কোন অর্থ সংগ্রহণ কিংবা ভারতের পক্ষ হইতে ঋণগ্রহণ করিবার ক্ষমতার কোন হ্রাস বৃদ্ধি ইত্যাদি ব্যাপার থাকিবে তাহাকেই অর্থ-ঘটিত আইনের প্রস্তাব বলা যাইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে অর্থ আমদানী বা ব্যয়ের ব্যাপারে সংসদের যে উর্ধতন শাখা বা রাষ্ট্র-পরিষদ আছে তাহার মত প্রকাশের অধিকার থাকিলেও ইহার বেশী কোন অধিকারই নাই।

বাজেট অনুমোদনঘটিত ব্যবস্থা—কাজেই রাজস্ব-ঘটিত যাবতীয় ব্যাপার লইয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার ভার রহিয়াছে লোকসভার হস্তে। ভারতের রাজস্ব বৎসর বা সরকারী বৎসর ১লা এপ্রিল তারিখে আরম্ভ হইয়া ৩১শে মার্চে যাইয়া শেষ হয়। রাষ্ট্রতন্ত্রের বিধান এই যে রাজস্ব বৎসর বা সরকারী বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই আগামী বৎসরের ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব লোকসভার সমক্ষে উপস্থিত করা হইবে, বিভিন্ন খাতের জন্য প্রস্তাবিত বরাদ্দ বিশিষ্টভাবে দর্শাইতে হইবে এবং প্রতি খাতের বরাদ্দ প্রস্তাব লোকসভার ভোটাধিক্যে অনুমোদন লাভ করিতে হইবে। আবার যেহেতু অল্প কিছু টাকা ছাড়া ভারতের রাজস্বমাত্রই ভারত সরকারের পাকা তহবিলের অঙ্গীভূত বলিয়া মনে করা হয়, ব্যয়-বরাদ্দ কতকটা সম্পন্ন হইবার পর ব্যয়-বরাদ্দের অনুরূপ টাকা রাজস্বের পাকা তহবিল হইতে অর্থ-সংগ্রহনী আইন দ্বারা সরকারের হাতে আনিতে হয়। লক্ষ্যের ব্যাপার এই যে ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর হইলেই সরকারের হাতে টাকা আসে না, তাহাকে আবার পাক-তহবিল হইতে সংগ্রহণ করিতে হয়। যে টাকা ব্যয়-বরাদ্দ সত্ত্বেও সংগৃহীত নয়, তাহার ব্যয় হইতে পারে না। দুই তিন দফায় অর্থ-সংগ্রহনী আইন পাস করা চলে, যেমন প্রথম ১০০ কোটী, দ্বিতীয় ১৫০ কোটী এবং তৃতীয় দফায় বাকী ব্যয়-বরাদ্দের টাকা। এই দফা-ব্যবস্থার তাৎপর্য এই যে আগামী বৎসরের ব্যয়-বরাদ্দ বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্বে শেষ নাও হইতে পারে অথচ কিছুটা সংগ্রহ অর্থ

সরকারের হাতে না আসিলে ১লা এপ্রিল হইতে সরকারের হাতে প্রায় কোন টাকাই থাকিবে না। বাৎসরিক ব্যয়-বরাদ্দের যে প্রস্তাবের হিসাব তাহাকে সাধারণতঃ বাজেট হিসাব বলা হয়। প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ অধিবেশনের দিনে এই বাজেট হিসাব লোকসভার সমক্ষে উপস্থিত করা হইয়া থাকে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলী—এইবার মন্ত্রী-মণ্ডলীর কথা। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ভারত-রাষ্ট্রে রাষ্ট্র-পতিই রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহক অঙ্গের শীর্ষস্থানে। কিন্তু এই কার্যনির্বাহনী বা শাসনপরিচালনার ক্ষমতা তিনি নিজে প্রয়োগ করেন না। বস্তুতঃ এই মন্ত্রী-মণ্ডলীই রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহক ক্ষমতা অর্থাৎ আইন-প্রণয়ন ও বিচারকার্য ছাড়া অন্য শাসনকার্যের কর্তৃপক্ষ। রাষ্ট্রতন্ত্রের ৭৪ ধারা মতে এই মন্ত্রী-মণ্ডলী রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা ও সাহায্যকারী মাত্র। এখানে ভাষার একটু ময়িকতা আছে—রাষ্ট্রীয় আইনের ভাষায় উপদেশ ও সাহায্য কথার সাহায্য মানে শাসন-পরিচালনা ব্যতীত কিছুই নহে। বিগ্রহের নামে যেমন মোহান্ত কাজ করেন, মন্ত্রী-মণ্ডলীও তেমনি রাষ্ট্রপতির নামে শাসন পরিচালনা করিয়া থাকেন। লোকসভায় যাহারা জনগণের প্রতিনিধিরূপে সদস্য হইয়া আসেন তাহাদের মধ্য হইতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতিনিধি লইয়াই এই মন্ত্রী মণ্ডলী গঠিত হয়। রাষ্ট্রের আইন-প্রণয়নী অঙ্গ ও কার্যনির্বাহনী অঙ্গ এই দুয়ের ভিতর যাহাতে বিরোধ না হইতে পারে তাহার জন্যই সংসদের সভ্যদের লইয়া সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহনী যন্ত্র বা মন্ত্রী-মণ্ডলী গঠিত হয় এবং এইভাবে গঠিত হওয়ার দরুণই মন্ত্রী-মণ্ডলী রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা মাত্র হইয়া রাষ্ট্রপতির নামে যথার্থ শাসনকার্যের ভার গ্রহণ করিবার তাৎপর্য।

লোকসভা হইতে মন্ত্রীমণ্ডলীর সভ্য নির্বাচনের তাৎপর্য—এই সংসদ বা আইনসভার সভ্য লইয়া যে শাসনযন্ত্র গঠন হইল তাহা ইংলণ্ডীয় রীতি, ইহাতে আইনপ্রণয়নী ক্ষমতা ও কার্যনির্বাহনী ক্ষমতার একটা সংযোগ রক্ষা করা হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাজ্যের প্রথা বিভিন্ন। সেখানকার আইনসভা বা কংগ্রেস ও শাসন-পরিচালক প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপ্রতি উভয়েই স্ব স্ব প্রধান। প্রেসিডেন্ট সেখানে সংসদ হইতে মনোনীত হন না, গণভোটে নির্বাচিত হ'ন। এই বিলাতী ও মার্কিনী শাসন ব্যবস্থার পার্থক্য বুঝিলেই ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থার মর্ম কথাটি বুঝিতে সুবিধা হইবে? বিলাতী পার্লামেন্টিয় ব্যবস্থাই ভারতের শাসনযন্ত্র গঠনের ভিত্তি।

মন্ত্রীপদের দুইটি সর্ত—ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডল এইভাবে গঠিত হয়:—রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন এবং প্রধান মন্ত্রীর মনোনয়ন মত অপর মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন। এই নিযুক্তির কোন সময় সঙ্কীর্ণতা নাই—রাষ্ট্রপতির অভিলাষ অনুযায়ী তাহাদের নিযুক্তি বলবৎ থাকিবে? বিশেষ লক্ষ্যের ব্যাপার এই যে প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে অপর মন্ত্রীদের পদমর্যাদায় প্রভেদ রহিয়াছে—কেননা অপর মন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মী

হইলেও তাহারা প্রধানমন্ত্রীর মনোনয়নে নিযুক্ত। এই প্রসঙ্গে অর্থাৎ মন্ত্রী-মণ্ডলীর পদরক্ষা ব্যাপারে দুইটি কথা বিশেষভাবে অবধারণের যোগ্য। তাহা হইল এই যে—

(১) সংসদের কোন শাখার সভ্য না হইলে ছয় মাসের বেশী কেহ মন্ত্রীপদে বাহাল থাকিতে পারেন না, এবং

(২) এই মন্ত্রী-মণ্ডলী তাহাদের কার্যের বা সিদ্ধান্তের জন্য সমবেতভাবে সংসদের নিকট নিম্নশাখা বা লোকসভার নিকট দায়ী।

মন্ত্রীমণ্ডলীর সমবেত দায়িত্ব কাহাকে বলা হয়—এই শেষোক্ত সর্তের তাৎপর্য হইল এই যে যদি কোন সময়ে মন্ত্রী-মণ্ডলীর কোন কার্য বা সিদ্ধান্তের প্রতি—তাহা গুরুত্বপূর্ণ হওয়া চাই—লোকসভা ভোটাধিক্যে অনাস্থা প্রকাশ করেন তবে তাহাকে পদত্যাগ করিতে হয়। রাষ্ট্রপতির অভিলাষানুসারে মন্ত্রী-মণ্ডলীর নিযুক্তি কাল নির্ধারণ করার তাৎপর্য ও একই ব্যাপার। আর এক কথা। যদিও মণ্ডলী হিসাবেই মন্ত্রীরা কাজ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হইলে, মন্ত্রী-বিশেষ তাহার ভারপ্রাপ্ত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু যখন কোন ব্যাপারে লোকসভা ভোটাধিক্যে অনাস্থা জ্ঞাপন করিবেন, তখন সেই অনাস্থা শুধু যে সেই ব্যাপারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর উপরই প্রযোজ্য হইবে তাহা নয়। মন্ত্রী-মণ্ডলীর সেই ব্যাপারে পূর্ব সম্মতি থাকুক আর নাই থাকুক, সমগ্রমণ্ডলীর উপরই সেই অনাস্থা প্রযোজ্য বলিয়া ধরিতে হইবে। ইহাকে বলা হয় মন্ত্রী-মণ্ডলীর সমবেত দায়িত্ব। মন্ত্রী বিশেষের যাহা কাজ বা সিদ্ধান্ত তাহা আইনসভার চক্ষে মন্ত্রী-বিশেষের নহে, মন্ত্রী-মণ্ডলীর কাজ বা সিদ্ধান্ত বলিয়া ধরা হয়।

মন্ত্রী-মণ্ডলীর আইন-প্রণয়নে প্রভাব—ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনে সংসদ যেরূপ আইন প্রণয়নের কর্তা তেমনি আইনসঙ্গত ভাবে শাসন পরিচালনার কর্তা হইলেন মন্ত্রী-মণ্ডলী—যদিও আইনের মাফিক ভাষায় তাহারা রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা ও সাহায্যকারী মাত্র। লোকসভায় যতদিন ভোটাধিক্যে তাহাদের শাসননীতিতে সমর্থন থাকিবে ততদিন তাহারা ক্ষমতারূঢ় থাকেন। কাজেই আইন-প্রণয়ণও অনেকাংশে তাঁহাদের প্রস্তাবানুসারে হইয়া থাকে। আইন ছাড়া শাসনকার্য পরিচালনা করা চলে না, সেইজন্য মন্ত্রী-মণ্ডলীর পক্ষ হইতেই বেশীসংখ্যক আইনের প্রস্তাব সংসদে বিশেষতঃ লোকসভায় উত্থাপন করা হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহা গৃহীত হয়। কাজেই সঙ্কীর্ণার্থে ও চলিত কথায় সরকার বলিলে এই মন্ত্রী-মণ্ডলীকে বুঝায়। আইনের ভাষায় কাগজে কলমে যাহাকে বলা হয় "ভারতের রাষ্ট্রপতি" তাহার অন্তরালে থাকে এই মন্ত্রী-মণ্ডলী বা মন্ত্রী-মণ্ডলীর পক্ষে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর বা তাহার অধীনস্থ কর্মচারীর সিদ্ধান্ত।

সংগ্রাম—স্বাধীনতা—গণতন্ত্র

উদ্ভোপাধী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সংগ্রাম থেকে স্বাধীনতা এসেছে, এবার সংযম, সংহতি ও সংগঠনের পালা। স্বাধীনতার পর যে লাভ লোকসানগুলি এসেছে তার মধ্যে লোকসানের প্রথম দফা প্রথমেই উল্লেখ করা হ'য়েছে। সংগ্রামের প্রারম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত যে সকল প্রতিভা, মনিষা ও সরব ও নীরব কর্মী আমরা হারিয়েছি একে একে তাঁদের সকলের নাম উল্লেখ করতে গেলে প্রবন্ধ ইতিহাসের আকার ধারণ করে। তবে প্রসঙ্গান্তরে সেরূপ আলোচনার ইচ্ছা থাকল। স্বাধীনতার পর সাম্প্রতিক দুর্ঘটনাগুলির মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহাত্মা গান্ধীর মহাপ্রয়াণের অব্যবহিত পরেই স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতমা নায়িকা প্রাচ্য বুলবুল (Nightiugale of) ডাঃ বি, এন, রাও অন্যতম।

এ প্রসঙ্গে এ কথা উল্লেখ করা যায় যে খণ্ডিত ভারতের অপরাংশ পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়ক পরলোকগত মোহাম্মদ আলী জিন্না ও লিয়াকৎ আলা খানের সঙ্গে উত্তরকালে আমাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে বিভেদ এসে পড়লেও এ কথা অনস্বীকার্য যে ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের অবতারণার যুগে এঁরাও দাঁড়িয়েছিলেন আমাদের নেতৃবৃন্দের পাশে—স্বাধীনতা আন্দোলনকে সার্থক করতে, সংগ্রামকে সফল করতে। এঁদের তিরোধানে আমরা মর্মাহত হ'য়েছি। বাংলার তথা ভারতের কৃতী সন্তান ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার মেঘনাদ সাহা প্রমুখ মহাপণ্ডিত রাষ্ট্রনায়কদের মহাপ্রয়াণে সারাদেশ শোকে দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়েছে। তাঁদের সকলের আত্মাকে আমরা শ্রদ্ধনিবেদন করছি।

স্বাধীনতা লাভের পর সম্ভাব্য কালের মধ্যেই গণতান্ত্রিক (Republic) ভিত্তিতে আমাদের শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছে। প্রাক্তন ভারত সাম্রাজ্য (Indian Empire) আজ ভারতীয় গণতন্ত্র (Republic of India) বা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র (Union of India)। যথাসময়ে রাষ্ট্রপতি (President) নির্বাচনও হয়ে গেছে। তারপর স্বাধীন ভারতের সাধারণ নির্বাচনে লোকসভা (Parliament), রাজ্যসভা (Council of States), রাজ্য ব্যবস্থা পরিষদ যথাযথ প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেছে। কেন্দ্রে ও রাজ্যে মন্ত্রী সভাগুলি যথাসময়ে গঠিত হ'য়ে নির্বিঘ্নে শাসন পালন চালিয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্রের কর্ণধার প্রধান মন্ত্রী জওয়াহরলাল নেহেরু অসাধারণ মানুষ। জগতে আজ এঁর তুলনা নাই। রাষ্ট্রের নায়কত্বে আজ এঁর স্থান অবিসম্বাদিত।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জে ও শান্তিপরিষদে ভারতের আসন অত্যুচ্চ। বিশ্বে আজ দু'টি শক্তিগোষ্ঠী সৃষ্টি হ'য়েছে ও বিদ্যমান রয়েছে। এর কোনটিকে যোগ না দিয়ে ভারত তার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে আর এই যোগ না দেওয়ার মধ্যেই ভারতের বৈশিষ্ট্য ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব ফুটে উঠেছে। উভয় শক্তিগোষ্ঠীর কাছেই ভারত আকর্ষনীয় হ'য়ে উঠেছে। বৈদেশিক নীতির কৌতুককর খেলায় সারা বিশ্ব ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে। শুধু তাই নয়, কূটনৈতিক (Diplomatic) প্রতিযোগিতায় ভারত বিশ্বের শক্তিপুঞ্জের সামনে এক সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কোরিয়া ও ইন্দোচীন যুদ্ধবিরতি সংস্থা ও সালিশী মণ্ডলীতে নেতৃত্ব করে' ভারত যে গৌরব ও মর্যাদা অর্জন ক'রেছে তা' জগতে অতুল ও বিরল; সহজে কোন দেশের ভাগ্যে তা' ঘটেনা বা ঘটবে না। সম্প্রতি বৃটিশ মিশর বিরোধে

ভারতের ভূমিকা ও ঐতিহাসিক ভূমিকা বর্ণনা করতে এক বিরাট প্রসঙ্গের সৃষ্টি হবে। ওদিকে আমাদেরই মহীয়সী মহিলা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিনায়িকা নির্বাচিতা হ'য়ে ভারতের কম গৌরববর্ধন করেননি।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দিক দিয়ে কাকেও আমরা শত্রু মনে করি না। ভারত সকলের সঙ্গে মিত্রভাবাপন্ন; সকলের সঙ্গেই সদ্ভাব রাখতে চায় কিন্তু কারও সঙ্গে সামরিক মৈত্রী চুক্তি করতে চায় না বা করেনি। এদিক দিয়ে ভারতের বৈচিত্র্য এই যে আমাদের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল একদিক আমেরিকা ও বৃটেনে বারম্বার পদার্পণ করে আর অন্যদিকে রুশ, চীন ও যুগোস্লোভিয়া সফর অসামান্য সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। আবার শেষোক্ত দেশগুলির রাষ্ট্রনায়কগণ—বুলগ্যানিন্, ক্রুশ্চেভ্, মা সে তুং, চৌ, এন, লাই ও টিটো ভারত সফর করে ভারতবাসীর শুভেচ্ছা লাভ করে গেছেন। তাছাড়া বিশ্বের প্রায় সকল শক্তিশালী দেশেরই বিশিষ্ট রাষ্ট্রনায়কগণ ভারত ভ্রমণ করে ভারতবাসীর ওপর শুভেচ্ছা ও ভারতের সঙ্গে মৈত্রীর আকাঙ্ক্ষা জানিয়ে গেছেন। ফরাসী সরকার তাঁদের ভারতীয় উপনিবেশগুলির মালিকানা ভারতের হাতে তুলে দিয়ে দেরীতে হ'লেও শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। এগুলি এখন ভারতের শাসনতন্ত্রাধীন। পর্তুগীজ সরকার অবশ্য তাদের উপনিবেশগুলি ছাড়তে না চেয়ে এক ওঁয়েমীর পরিচয় দিচ্ছেন। তবে একথা ধ্রুব সত্য যে তাঁদেরও সুবুদ্ধির উদয় হবে। গায়ের জোর চিরস্থায়ী হবে না; শান্তিপূর্ণ নৈতিক চাপে তাকে আত্মসমর্পণ করতেই হবে। ভারত সেই পথেই অগ্রসর।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কের কথা উঠলে, বর্মা আর ইন্দোনেশিয়ার নাম অগ্রগণ্য। এ দুটি রাষ্ট্র ভারতের বৈদেশিক নীতির একাগ্র সমর্থক ও অনুসারী। নেপালের সঙ্গে ভারতের এক প্রকার অঙ্গাঙ্গী ভাব। উত্তরে তিব্বত ও সিকিমের সঙ্গে ভারতের মৈত্রী ঘনিষ্ঠ। তিব্বত এখন চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ অতএব ভারত তিব্বত সম্পর্কও অবিচ্ছেদ্য। বর্তমানে ইন্দোচীনের সার্বভৌমত্ব অনিশ্চিত হলেও ভারতের সঙ্গে কোন বিভেদ নাই। জাপান ও শ্যামের সঙ্গে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ। সিংহলবাসী ভারতীয়দের নাগরিক অধিকার নিয়ে সামান্য মতানৈক্য হয়ে থাকলেও তা, এখন মিটে গেছে এবং বৈদেশিক ও অন্তর্জাতির নীতি সম্পর্কে ভারত-সিংহল মতৈক্য ক্ষুণ্ণ হয়নি। আফগান সরকারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। ভারতের ছিন্ন অঙ্গ পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের কোন শত্রুতা নাই। তবে এই সেদিনকার রক্তাক্ত ক্ষতস্থল একেবারে শুকিয়ে যেতে কিছু দেরী লাগবে বৈ কি। তাও ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি নানা আদানপ্রদানের ভেতর দিয়ে সম্পর্ক অনেক সহজ হয়ে এসেছে। শক্তিলিপ্সা ও দলনৈতিক স্বার্থে বর্তমানে একটি মাত্র মুমূর্ষু সমস্যাকে জিয়িয়ে রাখা আছে—সেটি কাশ্মীর সমস্যা। দলস্বার্থের মরণকাঠি জিওনকাঠি এ সমস্যারও পূর্ণ সমাধান সত্যপ্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে দেখার জন্যে আমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। বর্তমানে আনুষ্ঠানিক ভাবে কাশ্মীরবাসী তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করেছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি।

আমাদের পশ্চিমে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের প্রতিবেশী আরব, ইরান, তুর্কী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে আমাদের মৈত্রী অব্যাহত। এদেশগুলির মধ্যেও অনেকের রাষ্ট্রনায়ক শুভেচ্ছা নিয়ে ভারত ভ্রমণ করে গেছেন। সুয়েজ খালের সার্বভৌমত্ব নিয়ে আমাদের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু মিশরকে সহানুভূতি জানিয়ে আসছিলেন। সম্প্রতি বৃটিশ ফ্রান্স ও ইসরাইলের মিশর আক্রমণ নিয়ে মিশরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়েছে। গোয়ার ব্যাপারে আমরাও মিশরের সঙ্গে

ভুক্তভোগী। অবশ্য এ নিয়ে অন্য কোন শক্তির সঙ্গে আমাদের সে সম্পর্ক স্থায়ী হতে দেওয়া হয়নি।

বৈদেশিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দিয়ে আর একটা কথা না বললে প্রসঙ্গ ও পূর্ণাঙ্গ হয় না। এটি বৃটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থের কথা। বৃটেনের নেতৃত্বে অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা আর নিউজিল্যাণ্ড এই কয়টি দেশ নিয়ে ছিল বৃটিশ কমনওয়েল্‌থ। এ গুলি সবই একগোত্র ভুক্ত সাদা চামড়ার দেশ। পরে ভারত, পাকিস্তান আর সিংহল এই কালা আদমীর দেশগুলোকেও এর সদস্য করা হয়েছে অবশ্য ঠেকে। স্বাধীনতা দিয়ে এদেরকে হাতছাড়া করতে হ'য়েছে—কিন্তু এগুলো ত' ভাতঘর বিরাট স্বার্থ ছড়ান আছে। এগুলোর মধ্যে যদি হাঁকিয়ে দেয় তবেই ত' পেটে পাথর বাঁধতে হবে। সে জন্যে "free association for mutual benefit" এই মন্ত্রে মুগ্ধ করে এদেরকে কমনওয়েলথরূপ প্রেমের ডোরে বেঁধে রাখা হয়েছে। পালের গোদা সাপের মুখেও চুমু খান, ব্যাঙের মুখেও চুমু খান। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় স্বার্থের প্রশ্নে গোঁজ হ'য়ে থাকেন, গোয়ার প্রশ্নে বোবা কালা সাজেন, মরমুখ পাকিস্তানকে চোখ ঠারেন আর ভারতের পিঠে হাত বুলিয়ে মিতালী বজায় রাখতে চান। এই কারচুপি আর মতলববাজীগুলি যখন একে একে ধরা পড়ে তখনই পীরিত চটার উপক্রম হয়। কিন্তু হাজার হোক মিঃ মাষ্টারের, হাতযশের গুণে শেষ রক্ষে ঠিক হ'য়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি মিশরের ওপর ইংরেজ ফ্রান্সের অন্যায় আক্রমণ নিয়ে কমনওয়েল্‌থ ছাড়ার দাবী বেশ জোরালো হ'য়ে উঠছিল—এক দূরদর্শী রাজাজীই কয়েকদিনের মধ্যে পাঁচবার বলেছেন কমনওয়েল্‌থ ছাড়ার কথা। কিন্তু আমাদের কূটবুদ্ধি প্রধানমন্ত্রী কথাটা এড়িয়ে গেলেন। কোন উত্তেজনার মুহূর্তে কমনওয়েলথ ছেড়ে হাতে-নাতে ধরা পড়ে, শত্রুকে সুযোগ দেওয়ার পক্ষপাতী আমরাও নাই। যে মহল থেকে এই দাবী উঠেছিল মিশর প্রসঙ্গে তাঁরা এত সুর পাল্টাপাল্টি ক'রেছেন যে তাঁদের সামঞ্জস্যহীন মতামতের উপর নির্ভর করা চলে না। কমনওয়েলথ ছাড়ার প্রকৃত ও অনিবার্য সুযোগ আসতে এখনও বাকি আছে।

এতক্ষণ বাইরের কথা আলোচনা করা গেল—এবার ভেতরকার কথা—দেশোন্নয়নের কথা বলা যাক্। স্বাধীনতা লাভের আশু ফল পর পর দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। প্রথম পরিকল্পনার কাজ শেষ হ'য়ে দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। এ সম্বন্ধে উল্লেখ করা যায় যে স্বাধীনতা লাভের পরক্ষণেই যে দু'টি উন্নয়ন তৎপরতা জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে দুটির একটি দামোদর ভ্যালি করপোরেশন আর অপরটি চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ। কিন্তু এদুটি পঞ্চ-বার্ষিকীর সামীল নয়। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পূর্বে এ পরিকল্পনা দুটির সৃষ্টি হয় এবং দ্বিতীয়টির প্রস্তুতি প্রথমে কাঁচড়া পাড়ায় আরম্ভ হয় ও পরে পাকিস্তান সীমান্ত থেকে দূরে সরিয়ে চিত্তরঞ্জনে (মিহিজামে) নিয়ে যাওয়া হয়। অবশ্য স্বাধীনতার পরেই এ দুটির কাজ জোর দিয়ে চালান হয়। দামোদর ভ্যালির এই পরিকল্পনাটির মধ্যে তিনটি উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে যথা—কৃষির জল সরবরাহ, প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও বন্যানিরোধ আর জল-বিদ্যুৎ (hydro-electric) সরবরাহ। চিত্তরঞ্জনে রেল ইঞ্জিন নির্মাণের কাজও জোর দিয়ে চালান হচ্ছে। এরূপ একটি জাতীয় কারখানা এশিয়া মহাদেশে আর নাই।

স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকার যে পরিকল্পনা দুটি আমাদের সামনে ধরে কাজ করে চলেছেন

সেগুলির মোটা মুটি উদ্দেশ্য হচ্ছে—(১) সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন, (২) গণসংযোগ (৩) জীবিকা সংস্থান ও বেকার সমস্যার সমাধান (৪) জাতীয় আয় বৃদ্ধি (৫) কুটিরশিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনীতির সামঞ্জস্য বিধান ও অর্থের বিকেন্দ্রীকরণ।

দেশ আমাদের কৃষিপ্রধান বলে, প্রথম পরিকল্পনাটিতে অবশ্য কৃষির ওপর জোর দেওয়া হ'য়েছিল। তার ফলে আমরা পেয়েছি ভাকরা প্রজেক্ট, নাংগল প্রজেক্ট, হীরাকুদ প্রজেক্ট, ময়ূরাক্ষী প্রজেক্ট, সিন্দরী ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী ইত্যাদি। প্রথম চারটির কাজ হ'চ্ছে প্রবাহ নিয়ন্ত্রন, কৃষির জল সরবরাহ আর জলবিদ্যুৎ উৎপাদন। দামোদর ভ্যালি করপোরেশনের কাজও এদের পাশাপাশি চল্‌ছে। এগুলির পরিসর এলাকা ও উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেওয়া এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়। সিন্দ্রি ফ্যাক্টরী আমাদেরকে দিচ্ছে রাসায়নিক সার। এ আমাদের দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে সার চালান দিতে অক্ষম। দ্বিতীয় পরিকল্পনাটিতে আনুমানিক ৪৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে' মৌলিক শিল্পগুলির ওপর জোর দেওয়া হ'য়েছে। এর মধ্যে আছে—(১) ইস্পাত ও লোহা (২) বিমান, জলযান, রেল ইঞ্জিন প্রভৃতি যন্ত্র নির্মাণের বৃহৎ শিল্প (৩) রাসায়নিক পেট্রোল (৪) সিমেন্ট (৫) এলুমিনিয়ম (৬) খনিজ শিল্প (৭) রাসায়নিক সার (৮) নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি (৯) কুটির শিল্প (১০) বৈদ্যুতিক শক্তি (১১) পরিবহন।

কতকগুলি শিল্প কারখানা ও বৃহৎ ব্যবসাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে। এ সবের জন্যে যে অর্থ সঙ্গতির চাহিদা আছে তা' মেটাবার জন্যে আমাদের দূরদর্শী সরকার আগে থেকে Industrial Finance Corporation, National Industrial Development Corporation Ltd. Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে' অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। তাছাড়া মেয়াদী কর্জ (Government papers ও loan bonds) এবং National Savings প্রভৃতি সরাসরি ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে এক কাজে দু' কাজের ব্যক্তিগত সংস্থানের মাধ্যমে জাতীয় সংস্থান বাড়ান) ব্যবস্থা ত' আছেই। বলা বাহুল্য এই উদ্দেশ্যেই সম্প্রতি জীবনবীমা ব্যবসাটি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হ'য়েছে। উপকরণ ও বিশেষজ্ঞ সংগ্রহের জন্যেও শিল্প প্রধান দেশগুলির সঙ্গে ত যথাযথ যোগাযোগ স্থাপন করা হ'য়েছে। দেশীয় বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির জন্যেও শিল্পোন্নত দেশগুলিতে প্রতিনিধি ও ছাত্র শিক্ষার্থী পাঠানর কাজ রীতিমত চলেছে আর এর মধ্যে বিশেষজ্ঞের সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাগুলির মধ্যে আছে—(১) চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরী (২) সিন্দরী ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী (৩) হিন্দুস্থান কেবল্‌স্ (৪) কোক্ ওভেন প্ল্যান্ট (৫) হিন্দুস্থান অ্যান্টি বায়োটিক (৬) হিন্দুস্থান ইনসেক্টিসাইড্‌স্। এরপর রুরকেলা ও দুর্গাপুরে বিরাট লোহা ইস্পাতের কারখানা গ'ড়ে উঠছে। রাষ্ট্রায়ত্ত আরও লোহা ইস্পাত কারখানা ছাড়া টাটা, বার্নপুর, কুলটি প্রভৃতির লোহার কারখানাগুলি সরকারী সুদৃষ্টিতে আরও জোরে কাজ চালাচ্ছে। ওদিকে পশ্চিম উপকূলে পেট্রোল পরিশোধনের ব্যবস্থা হ'চ্ছে। রেল পরিবহন ও বিমান পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ত' ভারত সরকারের আয়ত্তাধীনে আছেই, তাছাড়া আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার অন্যান্য স্থল পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। উন্নয়ন ও রাষ্ট্রায়ত্তীকরণ প্রতিক্ষেত্রে অগ্রসর এর পূর্ণ তালিকা দিতে প্রবন্ধ পুস্তকাকার ধারণ করবে।

আমাদের দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রায় ত্রিশটি অস্ত্র নির্মাণ কারখানা আছে। স্বাধীন ভারতে এগুলির কাজ এত জোর অগ্রসর হ'চ্ছে যে এখন আমরা কতকগুলি যুদ্ধাস্ত্র ঘরের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করতে পারি এবং করা হ'চ্ছে বলে দাবী করতে পারি। শুধু অস্ত্রোৎপাদন নয় দেশরক্ষা ব্যবস্থায় সৈন্যবাহিনী গঠন ও সামরিক শিক্ষা ও সাজসজ্জা ব্যবস্থার অগ্রগতিতে দেশ এক বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। আমাদের সৈন্যবাহিনী আজ যে কোন সামরিক শক্তিশালী দেশের সৈন্যবাহিনীর সমকক্ষ ব'লে আমাদের সরকার দাবী করেন। শিক্ষায় ভারত কোন দিন অনগ্রসর ছিলনা তার প্রমাণ আছে স্বাধীনতা সংগ্রামের আনুপূর্বিক ইতিহাসে। স্বাধীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে বুনিয়াদী শিক্ষা, নৈতিক-শিক্ষা, সামাজিক ও সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা, সমবায় শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার ভিতর দিয়ে শিক্ষাকে বহুমুখী করার জন্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে বিরাট ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে ও সে ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই বাস্তব রূপ নিয়ে প্রগতির এগিয়ে চলেছে।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রথমতঃ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ত বহুগুণে বাড়ান হয়েছেই, তাছাড়া হাসপাতাল, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসা কেন্দ্রের সংখ্যাকে অগণ্য করা হ'য়েছে বলা চলে। এ ব্যবস্থা ও এই বিশাল দরিদ্র দেশের চাহিদার অনুরূপ না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যা পরিমাণে বেড়ে চলবে। প্রতি মানুষের বিশ্বাস ও কৃষ্টিকে সম্মান দেওয়ার জন্য হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদকেও সরকারী স্বীকৃতি দিয়ে সাহায্যপুষ্ট করা হ'চ্ছে। টিবি প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থার জন্যে বহু চিকিৎসা কেন্দ্রের জন্যে প্রচুর আয়োজন এবং ব্যয় বরাদ্দ ও অনুরূপ সঙ্গতি সংগ্রহের কাজ দুর্বার গতিতে চলছে। পূর্বেই বলা হ'য়েছে শিল্পোন্নতি ব্যবস্থার ত' কথাই নাই। সকল শিল্পের মধ্যে যন্ত্রশিল্পের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ শিল্পে এর মধ্যে আশাতীত উন্নতি হয়েছে। একদিন যে শিল্পের শ্বাসরোধ করে আমাদেরকে লাংকাশায়ারের মুখাপেক্ষী করা হ'য়েছিল সেই শিল্প আজ এত উন্নতি করেছে যে নিজের দেশের চাহিদা মিটিয়ে উৎপন্ন বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করতে পারছে। এই রপ্তানির বহর দেখে বৃটিশ বস্ত্র ব্যবসায়ী মহল, বিশেষ করে ল্যাংকাশায়ারের উৎপাদক মণ্ডলী প্রমাদ গুণছে।

যে সব তৎপরতা নিয়ে আমাদের দেশ এগিয়ে চলেছে তার ফিরিস্তি আর হিসেব দিয়ে শেষ করা যাবে না। কৃষি সর্বস্ব পল্লী-অঞ্চলগুলিও পেছনে পড়ে নাই। তাদের জন্যেও যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। কৃষি উন্নয়ন ও ফসল বৃদ্ধির জন্যে সেচব্যবস্থা ও রাসায়নিক সার উৎপাদনের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তা ছাড়া কুটির শিল্প ও অন্যান্য কারুশিল্পগুলিকে বাঁচিয়ে তুলে উপজীবিকা সংস্থানের জন্যে বিশেষ ব্যয়বরাদ্দ করে উপকরণ সরবরাহ এবং শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। এই প্রকার শিল্পের মধ্যে শুধু উপজীবিকা হিসেবে নয় জীবিকা হিসেবে তাঁত শিল্প বিশেষ অগ্রসর হ'য়েছে। বিদেশেও আজ ভারতের তাঁত বস্ত্রের চাহিদা হ'য়েছে। এ প্রসঙ্গে একটা কথা পরিষ্কার করে বলা দরকার। যে বৃহৎ বাণিজ্য ও কারখানা শিল্পগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হ'য়েছে যেগুলির সমষ্টি প্রাইভেট ও পাবলিক সেক্টর নামে পরিচিত হয়েছে। আর যে কারখানা শিল্প ও বাণিজ্যগুলির মালিকানা সরকারী আওতার বাইরে পুঁজিপতিদের হাতে রয়েছে ব্যক্তিগত বা যৌথ সম্পদ হিসেবে, সেগুলির সমষ্টি হয়েছে প্রাইভেট সেক্টর। অবশ্য সেগুলির ওপর যথেষ্ট সরকারী নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়েছে। এই গেল সহর ও শিল্পাঞ্চলের কথা এবার

পল্লীবাসীর জন্যে থাকল কৃষি ও কুটিরশিল্প জীবিকা ও উপজীবিকা হিসেবে। দেশজুড়ে অসংখ্য সমবায় সমিতির মাধ্যমে এগুলিকে সুসংবদ্ধ ও সুপরিচালিত করার জন্যে ভারত সরকার সরকারী তহবিল থেকে প্রচুর ব্যয় বরাদ্দ করা হ'য়েছে। এই ব্যবস্থাকে সমবায় বা কো-অপারেটিভ সেক্টর হিসেবে উন্নয়ন উদ্যোগের তৃতীয় ক্ষেত্র বলা চলে। তৎপরতার অবশ্য ত্রুটি নাই, তবে ছোট বড় পুঁজি-লোলুপদের শ্যেনদৃষ্টির কৃপায় সরকারী বরাদ্দের ভাগ্য অনিশ্চিত। এই সব উদ্যোগ তৎপরতা ও বরাদ্দের ভেতর দিয়েই মানুষের নৈতিক চরিত্র ও জাতীয় চরিত্রের অগ্নিপরীক্ষা। এ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হ'লে আর উপায় নাই—শুধু বিপ্লব নয় ধ্বংস অনিবার্য।

সহর ও শিল্পাঞ্চল যে সুখ সুবিধে, আরাম-আয়েস পায় পল্লীবাসীরাও যাতে সে সবের কিছুটা ভোগ করতে পারে সে জন্যে স্থানে স্থানে ন্যাশান্যাল্ এক্সটেন্শন ও কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট নাম দিয়ে জাতিগঠনমূলক ক্ষুদ্র পরিকল্পনা সৃষ্টি করে পূর্বোক্ত বৃহৎপরিকল্পনাগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করা হ'য়েছে। যাতে বিদ্যুৎসরবরাহ, শস্যসংরক্ষণ প্রভৃতি জটিল সমস্যাগুলির সমাধান হয় দীর্ঘমেয়াদী কর্জ, প্রয়োজনীয় উপকরণ ও বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা করে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী গৃহ নির্মাণেরও ব্যবস্থা করে সকল স্তরের মানুষকে সভ্য ও উন্নত প্রণালীতে জীবন যাপনের আস্বাদ পাওয়ার সুযোগ দেওয়া হ'চ্ছে। যে সমবায়ের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হ'ল সেই সমবায়ের মাধ্যমে এসব তৎপরতাকে সুনিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা হচ্ছে। এই জন্যেই মূল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমবায়ের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সমবায় সম্বন্ধে দীর্ঘকালের সরকারী তৎপরতাতেও আমরা বিশেষ আগ্রহশীল হই নাই। কিন্তু এখন হ'তে হয়েছে। আগ্রহশীল না হ'লে সুযোগ শুধু নেবে ভাগ্যবান 'যে পেয়েছে সন্ধান'—এ আভাস বেশ ফুটে উঠেছে। মূলতঃ নৈতিক চিন্তাধারার ভেতর দিয়ে সমবায়ের উদ্ভব, যে জন্যে স্থানে স্থানে সমবায় শিক্ষায়তন স্থাপন করে জনসাধারণের মধ্যে নৈতিক, আর্থিক, বাণিজ্যিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা প্রসারের প্রসারের ব্যবস্থা হ'য়েছে—আর উৎপাদন, বণ্টন, ক্রয়, বিক্রয়, সরবরাহ সবকিছু সমবায়ের ভেতর দিয়ে ব্যবস্থা করায় ইঙ্গিত দেওয়া হ'য়েছে। এ ব্যবস্থার সুযোগ নিতে যাঁরা অগ্রসর হ'চ্ছেন তাঁরা বিশেষ সরকারী সমর্থন পাচ্ছেন। এতসত্ত্বেও নীতির চেয়ে যেন দুর্নীতিই দিন দিন প্রকট হ'য়ে উঠছে। সমাজ তান্ত্রিক সমাজের সভ্যসাধারণ দুর্বার গতিতে কোন পথে ছুটছে তা' লক্ষ্য করে এখনি তা নিয়ন্ত্রিত করার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে—অন্যথায় কাঠামো ভেঙে পড়ার বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়। ভাঙাকে গড়তে আর কোন মহাপুরুষ জন্মানোর অপেক্ষা করতে হবে তখন।

স্বাধীনতা ও দেশোন্নয়ন প্রসঙ্গে আর একটা কথা উল্লেখ না করলে কাহিনী অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন হবে। সেটা হচ্ছে উদ্বাস্তু প্রসঙ্গ। দেশ বিভাগের ফলে আমাদের জাতীয় শাসকমণ্ডলী অসংখ্য উদ্বাস্তু আর তাদের গ্রাসাচ্ছাদন সমস্যার কল্পনাতীত দায়িত্বসহ দেশের ঘাড়ে তুলে নেন। এ সমস্যা কাটিয়ে উঠে দেশ যে স্বাবলম্বী হবে সে আশা ছিল সুদূর পরাহত। কিন্তু সমস্যা তখন যে পর্যায়ে ছিল সে পর্যায়ে আর নাই। সমাধান শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে বলা যায়। উদ্বাস্তুরা সমস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিতে সমান অংশ গ্রহণ করে সমস্যা সমাধানে বিশেষ সাহায্য করেছে। কৃষি শিল্পে ব্যবসাবাণিজ্যে তাদের সহযোগিতাতেই দেশ এত সত্বর উন্নতির পথে এগেছে। তারা শুধু নিজেদেরই অন্নবস্ত্রের সংস্থান করেছে এ কথা বলা চলে না। বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদনের দিক থেকে তারা আরও দশজনের সমস্যার সমাধান করেছে। আজ এই উদ্বাস্তুদের কল্যাণেই পাটের মত এক অত্যাবশ্যক সামগ্রী সম্পর্কে আজ আমাদের সরকার স্বয়ংসম্পূর্ণতার দাবী করতে পেরেছে। এ সব বিবেচনা করে একথা স্বীকার করতে হবে যে, যে উদ্বাস্তুকে একদিন দেশের বোঝা বলে মনে করা হয়েছিল, তারাই আজ দেশের পরম সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সকল রকমের ব্যবস্থা ও হাতেনাতে ফলাফল বিবেচনা করে আমরা নির্ভয়ে দাবী করতে পারি—আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও তার পরিণতি সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও তথ্যগুলি আনুপূর্বিক পরিবেশন করে চলতি কালের নাগাল ধরার জন্যে যা বলা হ'ল তার মধ্যে অবশ্যই ভুল ত্রুটি থাকার কথা। আমাদের অনভিজ্ঞতার কারণে তা' ক্ষমার যোগ্য।

মূলধন জাত লাভকর

শ্রীঅচলকুমার ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহার্থে যে অতিরিক্ত রাজস্বের প্রয়োজন তাহা কিভাবে সংগ্রহ করা যাইতে পারে সে সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য অর্থমন্ত্রনালয়ের আমন্ত্রণক্রমে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিকোলাস ক্যালডর সম্প্রতি এদেশে আসিয়াছিলেন। অধ্যাপক ক্যালডরের মতে চালু ভারতীয় আয়কর ব্যবস্থা অনুপযুক্ত ও সামঞ্জস্যবিহীন। এই ব্যবস্থাকে সহনীয় করিয়া তুলিবার বর্তমানে প্রচলিত আয়কর ও অতিরিক্তকর এর পরিবর্তে মূলধনের উপর বাৎসরিক কর, মূলধনজাত লাভের উপর কর, দানকর, ব্যয়কর প্রভৃতির আরোপের সুপারিশ করিয়াছিলেন। এই সকল প্রস্তাবের সব কয়টি সরকার গ্রহণ না করিলেও মূলধনজাত লাভের উপর করারোপ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। মূলধনজাত লাভ বলিতে বুঝায় কোন সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া কিছু লাভ করা। যেমন কোন লোক যদি কোন বাড়ী ১০০০০ টাকায় কিনিয়া ১৫০০০ টাকায় বিক্রয় করে তাহা হইলে এই ৫০০০ টাকাকে মূলধনজাত লাভ বলা হইবে। তবে কোন লোকের ব্যবসা যদি বাড়ী তৈয়ারী করা ও বিক্রয় করা হয়, তাহা হইলে কিন্তু এই আয়কে মূলধনজাত লাভ বলিয়া গণ্য করা হইবে না; তখন ইহা ব্যবসায় লাভ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

মূলধনজাত লাভ আয় কিনা এ সম্পর্কে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন মত। অনেকে বলেন মূলধনজাত লাভ মূলধনই, আয় নয়, কারণ ইহা নিয়মিত পাওয়া যায় না কখনও কখনও পাওয়া যায়। আবার অনেকে বলেন যেহেতু মূলধনজাত লাভের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় সেহেতু ইহা আয়। যুক্তরাজ্যে মূলধনজাত লাভের উপর কর বসান হয় নাই, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে হইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধজনিত অর্থাভাব হেতু ১৯৪৭ সালে ভারত সরকারের তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলী খান অন্যান্য কয়েকটি নূতন করের ন্যায় মূলধনজাত লাভের উপরও কর বসান। দুই বৎসর পর ১৯৪৯ সালে ভারতীয় আয়কর আইনের আওতা হইতে এই করকে বাদ দেওয়া হয়। ১৯৪৯ সালের বাজেট বক্তৃতায় এই করটির বিলুপ্তির স্বপক্ষে অর্থমন্ত্রী যে সকল যুক্তি দেখান সেগুলি হইল। (১) আলোচ্য কর ব্যবস্থায় খুব কম রাজস্ব আদায় হয়। প্রায় এক কোটি টাকা মাত্র। (২) বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এই করের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করে। (৩) আলোচ্য করটি শিল্পোন্নতির পক্ষে যাহা প্রয়োজন সেই বিনিয়োগ পত্রের স্বাভাবিক গতিবিধির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ১৯৪৯ সালে মূলধনজাত করের বিলুপ্তির পর ইহার পুনঃবর্তনের বিপক্ষে অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন, কারণ এই কর প্রবর্তনের ফলে কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধির পরিবর্তে কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাইবে। কর তদন্ত কমিটির মতে "If a capital gains tax were to be introduced now and is bound to be levied at rates lower than the ordinary income and super tax on account of its casual or irregular character—there is a danger of tax avoidance being stimulated by attempts to pass off as capital gains which may otherwise have been treated as part of taxable income."

সেন্ট্রাল বোর্ড অব রেভিনিউ ১৯৫৩ সালে কর তদন্ত কমিটির নিকট যে স্মারকলিপি পেশ করেন তাহাতে মূলধনীকরের স্বপক্ষে বলা হইলেও এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে যে

whether its re-introduction at the present time is likely to lead to any considerable revenue এবং "the general tendency seems to be for profits and prices falling rather than rising, transactions in capital assets are also much less to frequent than they were a few years ago." অধ্যাপক ক্যালডর এই সকল যুক্তি গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই। তাঁহার মতে এই কর প্রবর্তনের প্রথম বৎসরেই ৬ কোটি টাকা রাজস্ব পাওয়া গিয়াছিল এবং এই পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে এইরূপ আশা করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রে এই কর চালু আছে, কিন্তু মিঃ সেলজারের মতে ইহাতে শেয়ার বাজারের কাজকর্মে কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। সুতরাং ভারতীয় শেয়ার বাজারে ইহা প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করিবে এইরূপ আশঙ্কা অমূলক।

এই সকল কারণে অধ্যাপক ক্যালডর তাহার রিপোর্টের উপসংহারে লিখিয়াছেন "It seems to me, therefore; that the tax ought to be reintroduced as soon as possible and quite irrespective of the immediate prospects of rising or falling prices, or of the immediate expectation of the yield. But apart from this, in view of the greatly accelerated rate of capital expenditure under the Second Five Year Plan, I do not think that the Board's view expressed, in December 1953 that the

general tendency seems to be for profits and prices falling rather than rising" could be supported in the present circumstances." বলাবাহুল্য নতুন Capital gains tax এর হার আয়করের হারেরই অনুরূপ। যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত মূলধনীকরের সহিত ভারতীয় মূলধনীকরের পার্থক্য হইল প্রথমোক্ত দেশে ইহা অন্যান্য আয়ের সহিত যুক্ত হয় কিন্তু এদেশে ইহা হইতে পৃথকভাবে কর আদায় করা হইবে। বাস্তবক্ষেত্রে ইহার একমাত্র অসুবিধা হইল মূলধনী ক্ষতিকে মূলধনী লাভ হইতে কিভাবে বাদ দেওয়া হইবে সেই প্রশ্নটির মীমাংসা করা। তবে এ কথা ঠিক যে, সাধারণের মতে মূলধনী লাভ দেখানর চাইতে মূলধনী ক্ষতি দেখানর প্রবণতা বৃদ্ধি পাইবে এবং কর আদায়কারীকে এই বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে।

সেলস্‌ম্যান কে ?

শ্রীকুমারেশ ঘোষ

সেলস্‌ম্যানের কাজ কোন লোককে বদ করা নয়, মানে, কোন জিনিষ কাউকে যা-তা ক'রে বুঝিয়ে গছিয়ে দেওয়া নয় বরং খদ্দেরকে সাহায্য করা, যাতে টাকা খরচ ক'রে তিনি ষোলো আনা জিনিষটা বুঝে নিতে পারেন। এক কথায়, সেলস্‌ম্যান উপকার চান না, বরং উপকার করেন।

বর্তমান ব্যবসা-জগতে সেলস্‌ম্যানের বিশেষ দরকার। কোন জিনিষকে বাজারে চালু করতে হলে সেলস্‌ম্যানের দরকার হবেই। মোটরগাড়ীর স্পার্কিং প্ল্যাগের মতই বাণিজ্য রথকেও চালু রাখতে হলে সেলস্‌ম্যানের সাহায্য অপরিহার্য। অনেকের ধারণা সেলস্‌ম্যান সমাজের আগাছা স্বরূপ। এ ধারণা ভুল।

সেলস্‌ম্যান আমাদের উপকারই করেন। কোন জিনিষ কোথায় তৈরী হচ্ছে, কোন জিনিষ কিনলে উপকার হবে, কোন জিনিষটা কিনলে ঠকবার ভয় থাকবে না, এক কথায় ষোলো আনা খরচ করে যাতে আঠারো আনা পেতে পারি সেইদিকেই নজর থাকে ভাল সেলস্‌ম্যানেদের।

সেলস্‌ম্যান ঠক নন, বরং আপনার বৈঠকখানায় বসেই তাঁর মাধ্যমে জানতে পারবেন আমাদের এই দেশে কি কি জিনিষ তৈরী হচ্ছে এবং কি দামে সে সব পেতে পারেন। আসল কথা ট্রামে বাসে ঘুরে, নানা বাজার চুঁড়ে যেসব খবর আপনাকে জোগাড় করতে হ'ত, তা আপনি আপনার গদিতে বসেই পাচ্ছেন এবং আপনার এই কাজ করছেন ঐ সেলস্‌ম্যান।

সেলস্‌ম্যান হচ্ছেন শিল্পজাত দ্রব্যের বাণিজ্য দূত। বাণিজ্য জগতের পরম বন্ধু। দেশের বিশ্বস্ত সেবক। সেলস্‌ম্যান সম্মানীয়। সেলস্‌ম্যানশিপ সম্মানের কাজ।

অনেকের ধারণা সেলস্‌ম্যান হওয়া যার তার কাজ নয়। এ ধারণাও ভুল। ভাল বলিয়ে কইয়ে হলে সেলস্‌ম্যানের কাজ করা শক্ত হয় না বটে, তবে সেলস্‌ম্যানশিপ ট্রেনিং নিলে এবং কতকগুলি নিয়ম কানুন জানা থাকলে যে কোন লোকের পক্ষে সেলস্‌ম্যান হওয়া খুব শক্ত নয়।

সেলস্‌ম্যানের দায়িত্ব

সেলস্‌ম্যানের দায়িত্ব কম নয়। তিনদিকে তাঁর দায়িত্ব। নিজের অফিসের কাছে, বাজারের খদ্দেরের কাছে এবং নিজের কাছে তার কাজের জবাব দিতে হয়। একটি কোম্পানি যখন সেলস্‌ম্যানকে নিযুক্ত করছেন, তখন সেলসম্যানকে মনে করতে হবে তাঁর কাজের মারফতে কোম্পানির যে লাভ হবে, তা' থেকেই কোম্পানি তাঁর মাহিনা ও কমিশন দেবেন, কোম্পানির ঘর থেকে নয়। এই কথাটি মনে করেই সেলস্‌ম্যানকে কাজে নামতে হবে। আর সেলস্‌ম্যানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে—

(১) সেলস্‌ম্যান নিজেই নিজের ভাগ্য-বিধাতা এবং তাঁর চাকরির দায়িত্ব তাঁরই।
(২) বিক্রীর জিনিষটির বিষয়ে ভাল করে জানতে হবে।
(৩) সেলস্‌ম্যানকে তাঁর রাস্তাঘাট ভাল ক'রে চিনতে হবে।
(৪) নতুন খদ্দের জোগাড় করতে হবে।
(৫) কোম্পানির কাজ বাড়াতে হবে।
(৬) পুরাণ খদ্দেরের কাছেও যেতে হবে এবং কাজ আনতে হবে।
(৭) কাজটি সানন্দে করতে হবে।

কোন একটা কোম্পানিতে ঢুকে সেলস্‌ম্যানের উচিত সেই কোম্পানির বিষয়ে ভাল ভাবে জানা এবং তাঁরা কি ভাবে ব্যবসা করেন তার খোঁজ-খবর রাখা। সেই কোম্পানির কর্তা এবং কর্মচারিদের সঙ্গে সহযোগিতা করা বিশেষ দরকার। সর্বদা মনে রাখা দরকার বাইরে তাঁর আচার ব্যবহার কথাবার্তা সব কিছুতেই কোম্পানির সুনাম যেন অক্ষুন্ন থাকে, বরং যেন বৃদ্ধি পায়।

সেলস্‌ম্যানের উচিত খদ্দেরের স্বার্থের দিকেও নজর রাখা। অনেক সময় খদ্দেরের কোন জিনিষ আশামত না পেয়ে কোম্পানির বিরুদ্ধে সেলস্‌ম্যানের নিকট নালিশ জানায়। তখন সেলস্‌ম্যানের মহা মুস্কিল। তাঁর অবস্থা হয়, শ্যাম রাখি কি কুল রাখি। খদ্দেরকেও খুশি করতে হবে অথচ কোম্পানিরও যাতে ক্ষতি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এক্ষেত্রে সেলসম্যানের কি করা উচিত তার কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। উপস্থিত বুদ্ধি খাটাতে হবে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে। তাব'লে খদ্দেরকে অবহেলা করলে চলবে না বরং ভবিষ্যতের আশায় কোম্পানি কিছুটা ক্ষতি স্বীকার করলে তাতে পরে কোম্পানি লাভবানই হবেন।

নিজের বিষয়েও সেলসম্যানের সাবধান হওয়া উচিত। যে কোম্পানির পক্ষে তিনি কাজ করবেন, সে কোম্পানিকে বাজিয়ে দেখতে হবে কোম্পানিটি সৎ না অসৎ, কোম্পানির জিনিষটি ভাল না বাজে। বাজে জিনিষ দিয়ে লোক টকানোর চাইতে সে জিনিষ চালানোর কাজ ছেড়ে দেওয়াই ভাল। এজন্য যদি বেশী মাইনে বা কমিশন কোম্পানি দিতেও চায় তবু সে লোভ সংবরণ করা উচিত। জেনে রাখা উচিত, যে কোম্পানি লোক ঠকাবার জন্যে কারবারে নেমেছেন, সে কোম্পানি যে সেলস্‌ম্যানকেও পরে ফাঁকি দেবেন না, তার নিশ্চয়তা কি? অনেক সময় দেখা গেছে সেলস্‌ম্যান বহু বাজে কথা বলে বাজে কোম্পানির বাজে জিনিষ খদ্দেরকে গছিয়েছে। তারা সেলসম্যান নয়, তারা ঠক। তারাই সেলসম্যানের কাজে বদনাম এনেছে। সেলসম্যান হবেন সৎ, ধর্মভীরু এবং কর্মঠ।

সেলস্‌ম্যানের গুণাবলী

সেলসম্যানের কয়েকটি বিশেষ গুণ থাকা দরকার। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে ব্যক্তিত্ব। সেলসম্যানের চলন বলনের মধ্যে বিশেষত্ব থাকা খুবই দরকার। নিম্নলিখিত গুণগুলি ভাল সেলস্‌ম্যানের থাকবেই—ভদ্রতা, প্রফুল্লতা, চটপটে ভাব, পরিচ্ছন্নতা, সাধারণ জ্ঞান, সাহস, লোকের সঙ্গে কথা বলার অভ্যেস, উৎসাহ, ভাল চেহারা, বিশ্বস্ততা, উপস্থিত বুদ্ধি এবং মিষ্ট কথা।

চেহারা বলতে স্বাস্থ্য, চলবার বসবার ভঙ্গি। দেহের গড়ন এইগুলিকেই বুঝায়। তাছাড়া সেলস্‌ম্যানের গলার স্বর এবং কথা বলার ভঙ্গিটিও হওয়া দরকার মনোরম।

সহাস্য মুখ সেলস্‌ম্যানের একটি বড় রকমের পাশপোর্ট। তাতেই মানুষ অর্ধেক বশ হয়, বাকি কাজটুকু হাসিল হয় অন্যান্য গুণের সাহায্যে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে সে হাসি যেন মৌখিক হাসি না হয়, অন্তরের হাসি হয়। অন্ততঃ খদ্দের যেন তাই বোঝেন। খুব বেশি হাসাও যেমন ভাল নয় তেমনি কাষ্ঠহাসিও কোন কাজের নয়। এটি অভ্যাস করলেই হয়।

খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলবার সময় মনে সাহস এবং ভরসা নিয়ে বলতে হবে। খদ্দের যদি কোন প্রশ্ন করেন তবে তার সঠিক উত্তর জানা থাকে তো ভালই, নতুবা উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে সে প্রশ্নের জবাব দেওয়া দরকার। তখন হতবুদ্ধি হ'য়ে মাথা চুলকানো বা তাই নিয়ে টানাটানি কিম্বা চশমা খুলে কাঁচ মুছতে লাগলে চলবে না। খদ্দের যদি একবার বুঝতে পারেন যে সেলস্‌ম্যান অপ্রস্তুতে বা বেকায়দায় পড়ে গেছেন, তবে তাঁর কাছে যেজন্য যাওয়া তাহা বিফল হওয়ারই সম্ভাবনা।

ভাল স্বাস্থ্য না হলে সেলস্‌ম্যান হওয়া খুব শক্ত। কারণ তাঁর কাজ পাখার তলায় টেবিল চেয়ারে ব'সে নয়, তাঁর কাজ ব্যাগ বগলে করে কখনো বা জিনিষের নমুনা নিয়ে

খদ্দেরের বাড়ি বাড়ি ঘোরা। তার উপর রোদ্দুর, বৃষ্টি তো আছেই। তবে বড় কোম্পানির ভাল সেলস্‌ম্যানরা কোম্পানি থেকে গাড়িও পেয়ে থাকেন। কিন্তু সে সৌভাগ্য আর ক'জনের ভাগ্যে জোটে? কাজেই মনে রাখতে হবে, সেলস্‌ম্যানের স্বাস্থ্যই সম্পদ।

সেল্‌সম্যানের পোষাক-পরিচ্ছদ হওয়া উচিত পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন। স্মার্টনেস তাঁর বিশেষ গুণ হওয়া দরকার। তবে চালবাজি তাঁর পক্ষে সমূহ ক্ষতিকারক। তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ কম দামী হোক, ক্ষতি নেই; কিন্তু সেগুলি ভাল কাটের-ছাটের হওয়া দরকার এবং সবচেয়ে বড় কথা ধোপ-দুরস্ত হওয়া।

মুখে দুর্গন্ধ, গায়ে ময়লা, দাঁত অপরিষ্কার, চোখে পিচুটি, চুল এলোমেলো বা তেল চুকচুকে ইত্যাদি সেল্‌সম্যানের অমার্জনীয় অপরাধ। এ অবস্থায় তিনি হয়ত অন্য কিছু করতে পারেন. তবে মেল্‌সম্যানের কাজে তিনি কখনও উন্নতি করতে পারবেন না।

সেল্‌সম্যানের শারীরিক গুণাগুণের কথাগুলি বলা হলো। এবার তাঁর মানসিক গুণাবলীর আলোচনা করা যাক্। মনের জোর আত্মবিশ্বাস না থাকলে ভাল সেল্‌সম্যান হওয়া সম্ভবপর নয়। তাঁকে আশাবাদী হতে হবে। যেকাজ করতে নেমেছেন তা খুশীমনেই করতে হবে। দিনগত পাপক্ষয় করা অন্যায়। যে জিনিস তিনি বিক্রী করতে বাজারে বেরিয়েছেন সে জিনিসের উপর তাঁর নিজের বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা থাকা উচিত। সে জিনিসের গুণাগুণের এবং উপকারিতার বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা বিশেষ দরকার।

সেল্‌সম্যান যে কখনও নিরুৎসাহী হবেন না এ আশা করা ভুল। সব জিনিসে বাজার সব সময়েই ভাল থাকে না। তাছাড়া ঐ একই ধরণের জিনিসের আরও অনেক বিক্রেতা আছে। তাঁদের কমপিটিশানও করতে হবে। আর হয়তো বেশীর ভাগ জায়গাতেই বিফল মনোরথ হয়ে ফিরতে হবে। কিন্তু তা বলে ভেঙে পড়লে চলবে না বা ভাবনা করা চলবে না। সেল্‌সম্যান যেন মনে না করেন, তিনি সাময়িক ভাবে জিনিস বাজারে ধরাতে বা চালাতে পারছেন না বলে তিনি সেল্‌স্যানশিপের কাজের অযোগ্য। তাঁকে তখন ভেবে দেখতে হবে কিজন্যে বাজার মন্দা যাচ্ছে। এজন্যে কোম্পানীর সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। কোম্পানীরও উচিত, সেলসম্যানের উপর অক্ষমতার দোষ না চাপিয়ে কি দোষে বা কি কারণে তাঁদের জিনিস বাজারে চলছে না বা কম চলছে তা ভেবে দেখা, তার কারণ বার করা।

মানসিক গুণের মধ্যে সেলসম্যানের আরও যেগুলি থাকা অত্যন্ত দরকার সেগুলি হচ্ছে উৎসাহ, বিশ্বাস, দৃঢ়মনোভাব, নির্ভরশীলতা, সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি এবং সংযম।

ঠিকমত আলোচনা সুরু করা এবং সেই আলোচনা চমৎকার ভাবে চালিয়ে যাওয়া ভাল সেল্‌স্‌ম্যানের আর একটি মস্ত গুণ। এককথা নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে

'ঘেনোর-ঘেনোর' করা কিংবা নিজের জিনিস নিয়ে 'হামবড়াই' করা কিংবা খদ্দেরের কাছে সবজান্তার ভাব দেখান মানে নিজের পায়েই কুড়ুল মারা। কোনো খদ্দেরের কাছে গিয়ে প্রথমেই তাকে হাসিমুখে নমস্কার জানান, খদ্দের বসতে বললে তবে বসা, খদ্দেরের কাছে অনুমতি নিয়ে তবে কথা শুরু করা, খদ্দের যদি কোনও কাজে বা কথায় ব্যস্ত থাকেন তবে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ইত্যাদি প্রত্যেক সেল্‌সম্যানের পক্ষেই একান্ত করনীয় কাজ। এমন কি খদ্দেরের অনুমতি না নিয়ে সিগারেট ফোঁকাও নিষেধ, সিগারেট মুখে দিয়ে, সিগারেট নাচিয়ে কথা বলা তো অমার্জনীয় অপরাধ। সিগারেট যদি খেতেই হয় তবে খদ্দেরের অনুমতি নিয়ে তবে সিগারেটের কেস পকেট থেকে বার করতে পারেন এবং আগে খদ্দেরকে 'অফার' করে তারপর শুরু করতে পারেন ধুমপান।

অনেক সময়ে দেখা গেছে সেল্‌সম্যানের সঙ্গে খদ্দেরের মতবিরোধ হওয়ায় সেলসম্যান তা নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলতে হবে না। খদ্দের যা ইচ্ছে তা বলতে পারেন, এমন কি ভুলও বলতে পারেন কিন্তু সেল্‌সম্যান তাবলে মেজাজ দেখালে বা চটে গেলে বা তর্ক করলে তাঁর কাজ হাসিল কোনমতেই হবে না। সেল্‌সম্যানকে তখন শুধু বলতে হবে, "ও তাই নাকি," এবং সুযোগ এবং সুবিধা বুঝে পরে ক্রমে ক্রমে তাঁর বক্তব্য খদ্দেরকে জানাতে হবে। এককথায় খদ্দেরের কাছে হতে হবে নম্র এবং তাঁকেই সম্মান দিয়ে কথা বলতে হবে। সেলসম্যান কাজ বা আলোচনা সেরে চলে যাওয়ার পর খদ্দের যেন মনে করতে পারেন, "লোকটা সত্যিই ভদ্র।"

খদ্দেরের প্রতি সম্মান দেখানো যেমন সেল্‌সম্যানের কর্তব্য ততোধিক কর্তব্য কোম্পানীর প্রতি সম্মান দেখানো এবং সেই সঙ্গে কম্‌পিটিটার কোম্পানীর প্রতিও। কথাটা খুলে বলি। অনেক সময় দেখা গেছে সেলসম্যান খদ্দেরের বাড়িতে গিয়ে কোম্পানীর বিরুদ্ধে আলোচনা সুরু করেছেন, খোলা কথায় কোম্পানীর নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। আবার এও দেখা গিয়েছে, নিজের জিনিস বেচবার জন্যে ঐ ধরণের জিনিষের কারবার করেন যেসব কোম্পানী তাঁদের নিন্দাও করতে থাকেন। এ যে কতবড় নিন্দনীয় ব্যাপার তা সহজেই অনুমেয়। এরকম আচরণ করে সেলসম্যান খদ্দেরের কাছে নিজের মান তো নষ্ট করেনই এমনকি নিজের উন্নতির পথও বন্ধ করেন। সেলসম্যানের যদি কিছু অসন্তোষের কারণ থাকে তবে তার উচিত তাঁর কোম্পানীর সঙ্গে সে বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা করে একটা ফয়সালা করে নেওয়া। যদি কোম্পানীর সঙ্গে না পোষায় সে কোম্পানী বরং ছেড়ে দেওয়া ভাল। তা নিয়ে বাইরে কাদা ছিটানো বোকামি।

ক্রমশঃ

———

আর্থিক দিগ্‌দর্শন

তথ্যসেবী

পাট শিল্প—সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান জুট মিল এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান পাট শিল্পের বার্ষিক অবস্থা পর্যালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন যে প্রধানতঃ দুইটি কারণে শিল্পটির ক্রমোন্নতির পথ দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে। এই দুইটি কারণের একটি হইল কাঁচামালের ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধি আর অপরটি হইল চটের মূল্য হ্রাস। মনে হয় গত বৎসরের হিসাবটি পাটশিল্পের ইতিহাস হইতে বাদ দিলে এই যুক্তি দুইটির স্বপক্ষে কিছু বলিবার থাকিবে না। ১৯৫৬ সালে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। এই সময় আমাদের পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন নির্দিষ্ট উৎপাদন লক্ষ্য অপেক্ষা প্রায় ১০ লক্ষ টন বৃদ্ধি পায়। চালু তাঁতের সংখ্যা এই সময় বৃদ্ধি পায়। সেপ্টেম্বরের শেষের তারিখে এই ভুল ধরা পড়িবার পর শতকরা ৫টি তাঁত বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সপ্তাহিক কার্যের সময়ও ৪২½ ঘণ্টা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪৮ ঘণ্টায় পরিণত হয়। এইরূপ অবস্থায় যদি আশা করা যায় যে সরকার অতিরিক্ত ৬ লক্ষ একরে পাট চাষের ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়াই পাটের দর কমিবে তাহা হইলে সেটি কি অসঙ্গত হইবে না? প্রথমতঃ প্রান্তীয় জমিতে (Marginal Land) চাষ হইতেছে বলিয়া দর কিছুটা বৃদ্ধি পাইবে, দ্বিতীয়তঃ বর্ধিত চাহিদার জন্য দরবৃদ্ধি পাইবে—ইহাতে আশ্চর্যের কথা কিছু নাই।

কাটিহারে অবস্থিত একটি পাট কল উত্তর পূর্ব রেলপথের কর্ম দক্ষতায় কাঁচামাল সময়মত আনিতে না পারায় উৎপাদন বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। অথচ এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান তাহার মূল্যবান বক্তৃতায় একবারও এই ঘটনার কথা উল্লেখ করেন নাই। উক্তটি মিলটি কি এসোসিয়েশনের সভ্য নয়?

কয়লা শিল্প—কয়লা শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এমন অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছে। ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে কয়লাখনির মালিকগণ সুপ্রীম কোর্টে আপীল করিয়াছেন। খনি-মালিকগণের যুক্তি হইল ট্রাইব্যুনাল যে বিষয়ের বিচার করিয়াছেন তাহা তাহার এক্তিয়ার বহির্ভূত। সুতরাং এই আদেশ সম্পূর্ণ অবৈধ। সুপ্রীম কোর্টের আদেশ মজুরী বৃদ্ধি আপাততঃ স্থগিত আছে। অর্থবিদের মতে "The present stay order might react on the Coal Industry with a boomerang effect in that the increased cost of higher wage rate may have a retrospective application from June 26 last year." ইহার অর্থ হইল সমস্ত বকেয়া মজুরীর দায় একসঙ্গে শিল্পটির উপর চাপ দিবে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় না যে ১৯৫৭ সালের শেষে নির্দিষ্ট উৎপাদন লক্ষ্য ৪০০ লক্ষ টনে পৌঁছান যাইবে।

Indian Mining Fedaration-এর Chairman-এর মতে বর্তমান সম্পদের দ্বারা আগামী চার বৎসরে বে-সরকারী খনি সমূহের উৎপাদন ১০০ টন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে কিনা সন্দেহের বিষয়। অধুনা প্রচলিত Development rebate এর সুবিধা অন্যান্য শিল্পের ন্যায় কয়লা শিল্প ভোগ করে। ইহার অর্থ নূতন বিনিয়োগে ১৲ টাকা লাভ হইলে ৪২½% কর ক্ষতি। বিনিয়োগকারীরা অবশ্য এই সুযোগ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। ফলে বর্তমানের কয়লা শিল্পে বিনিয়োগযোগ্য অর্থের আধিক্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সুযোগ দেখা দিয়াছে।

নিয়ন্ত্রিত ঋণদান পদ্ধতি—ভারত চেম্বার অব কমার্সের বার্ষিক সভায় চেম্বারের প্রেসিডেন্ট

মিঃ খেমকা ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রিত ঋণদান পদ্ধতির প্রতিকূল সমালোচনা করেন। মিঃ খেমকার যুক্তি প্রধানতঃ দুইটি। প্রথমটি ভারত সরকারের মুদ্রাস্ফীতি নীতির বিরোধী এবং দ্বিতীয়টি মুনাফাকে বাদ দিয়া উৎপাদন ব্যয় ও করহারের ভিত্তিতে শিল্পপণ্যের মূল্য নির্ধার করা। উক্ত দুইটি যুক্তিই কিন্তু অকাট্য নয়। প্রথমতঃ বর্তমানে আর মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী কোন নীতি চালু নাই, দ্বিতীয়তঃ কোন পণ্যের মূল্য নির্ধারণের সময় স্বভাবতই মুনাফার কথা আসিয়া পড়ে; মুনাফার জন্য পৃথক কোন হিসাবের প্রয়োজন নাই। অবশ্য একথা ঠিক যে মূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার বর্তমানে বেশ সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। অনুবাদ করিলে পাছে মূলের সৌন্দর্য নষ্ট হয় এই ভয়ে আমরা অর্থ-নীতিজ্ঞ সাংবাদিকের নিজের মন্তব্যটি উদ্ধৃত করিলাম:—If the credit expansion in 1956-57 was small it was because the credit outstanding from 1955 56 was heavy. This past year was a repetition of 1951-52 from the point of view of credit situation. It is sheer good luck that the Finance Minister is not being swept off his feet by the businessmen's eccentricity and is keeping his feet down on a slopy policy of credit saturation." অর্থাৎ সরকারের নিয়ন্ত্রিত ঋণদান পদ্ধতির ফলে ব্যবসায়ীকুল বিপাকে পড়িয়াছেন, জাতীয়স্বার্থের কথা ভাবিয়া এরূপ মন্তব্য করা চলে।

পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় পরিকল্পনা—পরিকল্পনাকে রূপায়িত করিবার জন্য ১৯৫৭-৫৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ৩৪·৩০ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গকে দিবেন। পরিকল্পনায় রাজ্যসরকারের জন্য পূর্ব নির্দিষ্ট ব্যয়বরাদ্দ নিম্ন প্রকারের ছিল—

সাল	কোটি টাকা	সাল	কোটি টাকা
১৯৫৬-৫৭	৪৪·৭৬	১৯৫৯-৬০	২৬·৮৬
১৯৫৭-৫৮	৩·০·০১	১৯৬০-৬১	২২·৪৯
১৯৫৮-৫৯	৩০·৮৮		

প্রথম তালিকায় মোট ১৬১·৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল পরে ইহা হইতে ৩% বাদ দেওয়া হয়। অর্থাৎ ১৯৫৭-৫৮ সালের জন্য প্রথমে ৪২·৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল পরে ইহাকে ছাঁটিয়া ২৮·৫ কোটি টাকায় পরিণত করা হইয়াছে। ফলে রাজ্য সরকারের ১৯৫৭-৫৮ সালে ৩৫·২৭ কোটি টাকার বেশী ব্যয় করিবার সামর্থ্য রহিল না। এই ৭·২৫ কোটি টাকা ব্যয় হ্রাসের একমাত্র কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থাভাব।

রাজ্য সরকার বিভিন্ন খাতে ১৯৫৭-৫৮ সালে নিম্নলিখিত ব্যয় সূচী নির্ধারণ করিয়াছেন—

কৃষি	পরিকল্পনার মোট ব্যয়বরাদ্দ কোটিটাকা	১৯৫৭-৫৮ সালের ব্যয়বরাদ্দ কোটিটাকা
সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাও	১৯·১১	৪·৫০
জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা	১৪·২৫	১·৮২
সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদ	৩০·৪০	১০·৫১
শিল্প ও খনি	৮·৪৮	২·২১
যানবাহন	১৯·০৩	৩·৫০
শিক্ষা	২১·৩০	৪·৬০
স্বাস্থ্য	১৯·৯৫	৩·৭৯
গৃহনির্মান	৮·৫৫	১·৫০

ইহা ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়ন করপোরেশন (West Bengal Development Corporation) ২৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কৃত্রিম হ্রদ, পয়ঃপ্রণালী গ্যাস উৎপাদন প্রভৃতি কয়েকটি পরিকল্পনা সফল করিতে মনস্থ করিয়াছেন। রাজ্য সরকারের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পরিকল্পনা হইল দুর্গাপুর কোক ওভেন প্ল্যান্ট। ইহার জন্য ১০০৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে।

নয়াপয়সা—অবশেষে মুদ্রাসংস্কার হইল। হিসাবের সুবিধার জন্য ভারতসরকার সকল সংস্কারকে অগ্রাহ্য করিয়া মুদ্রা সংস্কার করিলেন এবং লাভ করিলেন বিগতদিনের অভিশাপ আর আগামী দিনের আশীর্বাদ। যাহাদের নূতন করিয়া হিসাব শিখিতে অসুবিধা হইবে বা হইতেছে এখনও ধারাপাত আরম্ভ করে নাই তাহারা আশাকরি সরকারী কার্যের ভূয়সী প্রশংসা করিবেন। অতঃপর ধারাপাত লইয়া আর মাথা ঘামাইতে হইবে না। কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া, বুড়িকিয়া, পণকিয়া, চৌকিয়ার দিন শেষ হইল। অবশ্য ইহাদের রাজত্বকাল অনেক আগেই শেষ হইয়াছিল, তবু ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় যেটুকু সম্ভ্রম পাইতেন সেটুকুও গেল। বাকী রহিল শুধু পরকীয়া এবং জীবন ধারাপাতে ইহার প্রভাব ক্রমবর্ধমান। নয়াপয়সায় খুচরো ক্রেতাদের অনেক ক্ষতি হইবে। কিন্তু বোধকরি সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইবে শুভঙ্করের।

মনের দামের পাশে ইলেক মাত্র দিলে
আধপোয়ার দাম শিশু অনায়াসে মিলে।

এই দুই পদের মিল করিয়া যে ভদ্রলোক এত দিন অঙ্কের পাতায় অমর হইয়া ছিলেন সেই আঙ্কিক এমন গবেষণার বিষয় হইয়া মিউজিয়ামে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন। শহরের পরিবহন বিভাগ সরকারী মুদ্রা পরিবর্তন নীতিকে অগ্রাহ্য করিয়া যে জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছেন আমরা তাহার দ্রুত নিষ্পত্তি কামনা করি। আর এই সঙ্গে জনসাধারণকেও বলি নয়া পয়সায় সবসময় তাহাদের ক্ষতি হইবে এ আশঙ্কা অমূলক। দুই পয়সার পান কিনিলে অবশ্যই তাহাদের ক্ষতি হইবে, কিন্তু তিন পয়সার পান কিনিলে তাহাদেরই লাভ হইবে। সুতরাং বাসে কম চড়িয়া বেশী পান খাইলে লোকসান উশুল হইতে পারে!

গ্রন্থ-পরিচয়

ভারতীয় অর্থবিদ্যা, প্রথম খণ্ড—শ্রীঅরুণ কুমার সেন, সিটি কলেজ বাণিজ্য বিভাগের অধ্যক্ষ। প্রকাশক—সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলি-১২। মূল্য চারি টাকা চারি আনা

আলোচ্য গ্রন্থটি ভারতীয় অর্থবিদ্যার দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম খণ্ড। কোন একটি পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ গ্রন্থকারের গ্রন্থ-রচনার সার্থকতা এবং পুস্তকটির উপযোগিতা ও জনপ্রিয়তা নির্দেশ করে। আলোচ্য গ্রন্থে ভারতীয় অর্থ-বিদ্যার আলোচনায় কৃষি, কুটির ক্ষুদ্রায়তন শিল্প অধ্যায় পর্যন্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অবশিষ্টাংশ অবশ্যই দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান হইবে।

স্বাধীনোত্তর কালে ভারতের অর্থনীতিক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমাপ্তি ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূচনা আর্থিক ও অর্থ নৈতিকক্ষেত্রে যে

পরিবর্তন সাধন করিয়াছে, তাহাদের সম্যক ও যথাযথ আলোচনা পুস্তকটির প্রথমখণ্ডের আলোচিত অধ্যায়ে এমন বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে নিতান্তই সহজ-বোধ্য হইয়াছে। বিশেষতঃ দ্বিতীয় পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে যে আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে ছাত্রদের পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির একটা সুসংবদ্ধ ও ধারাবাহিক সম্পর্ক রচনায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। পুস্তকটির আর একটি বৈশিষ্ট্য, ছাত্রদিগকে নোটবই বা সংক্ষিপ্তসার পাঠের ক্ষেত্র হইতে বিষয়বস্তুর যথার্থ অর্থবোধ ও গুরুত্ব উপলব্ধির প্রতি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও বইখানি সর্বাধুনিক তথ্য সম্ভারে সমৃদ্ধ। ছাপা ও বাঁধাই গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে। বইখানির সাফল্য আমরা আশা করি।

Introduction to Companies Act, 1956—by H. N. Dutta, Barrister at-law. Published by Publication Section, City College, Commerce Department, Cal.-12. Price Rupee one only.

আলোচ্য পুস্তিকাখানি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইলেও ৬৮ পৃষ্ঠার মধ্যে নূতন কোম্পানী আইনের সুষ্ঠু ও সরল আলোচনার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ধারাবাহিকভাবে কোম্পানী আইনের বিভিন্ন ধারার আলোচনার ফলে এই বইখানি বিশেষ করিয়া ছাত্রদের প্রভূত সাহায্য করিবে। নূতন আইনের মারপ্যাঁচে ছাত্রদিগকে অধিকাংশ সময়ে বিব্রত বোধ করিতে হয়। এই ক্ষুদ্র বইখানি তাহাদের সময় সংক্ষেপ ও শ্রম লাঘব করিয়া অধীত বিষয়ের জ্ঞানলাভে সহায়তা করিবে। সাধারণ পাঠকও অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাদের জ্ঞাতব্য প্রশ্নের সমাধান পাইয়া উপকৃত হইবেন। বইটি ইতিমধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

Calcutta Municipal Gazette—Thirty Second Anniversary Number. Acting Editor - Brojendra Nath Bhadra. Price—Rupee one.

আলোচ্য মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সংখ্যাখানি একটি বিশেষ সংখ্যা। এই সংখ্যাটিতে বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে। কমিশনার শ্রী বি. কে. সেন, উপমন্ত্রী শ্রীঅরুণকান্তি ঘোষ, ঈশ্বরদাস জালান, ডাঃ অমূল্যধন মুখার্জী, শ্রীঅতুল্যপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন, ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন, ডাঃ কালিদাস নাগ, অধ্যাপক অনাথবন্ধু দত্ত প্রভৃতির রচনায় বর্তমান সংখ্যাখানি সমৃদ্ধ। মূল্য অনুপাতে আলোচ্য সংখ্যাখানি সার্থক সম্পাদনার নিদর্শন। সম্পাদক যথার্থ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। আমরা এই সংখ্যাটির বহুল প্রচার কামনা করি।

Individual and the Government—by Judge Wiliiam H. Hastie. Published by United States of Information Service.

মানব সমাজে রাষ্ট্র ও নাগরিকের সুষ্ঠু সম্পর্কের ক্ষেত্রে শ্রদ্ধা ও ন্যায় বিচার কতখানি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে তাহা বর্তমানে পুস্তিকাতে আলোচনা করা হইয়াছে। বিচারক হেষ্টি তাঁহার এই প্রবন্ধে নাগরিকের কর্তব্য ও অধিকার লইয়া যে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করিয়াছেন তাহা যেমনই সুচিন্তিত তেমনই সুপাঠ্য।

Indo-American Technical Co-operation—1952-56. Published by United States Information Service.

ভারতের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচীর রূপায়ণে ভারত যুক্তরাষ্ট্র কারিগরী সহযোগিতার অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৫২ সাল হইতে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত এই পাঁচটি বৎসরে কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদ, শিল্প ও খনি কার্য, যাতায়াত ও পরিবহন, শ্রমিক কল্যাণ, স্বাস্থ্য শিক্ষা, সমাজ-উন্নয়ন প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কার্যসূচীতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ৩২৬·৮ মিলিয়ান ডলার ব্যয় করিয়াছেন। বৈদেশিক

সাহায্যের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের কারিগরী সহযোগিতার এই অকৃপণ ব্যয়-বরাদ্দ ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও অগ্রগতিতে যে কতদূর সাহায্য করিয়াছে আলোচ্য বিবরণীটিতে ধারাবাহিকভাবে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। আমরা ইহার প্রকাশের জন্য অভিনন্দন জানাই।

দিব্যদৃষ্টি—অধ্যাপক সুধাংশু কুমার গুপ্ত। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ মূল্য ২৷৷০

দিব্যদৃষ্টি অধ্যাপক গুপ্তের এক নূতন দৃষ্টি ভংগির পরিচয়। দিব্যদৃষ্টি গতানুগতিক উপন্যাস নয়, ডিটেক্‌টিভ রচনাও নয়। তবে অপরাধ বিজ্ঞানের রোমাঞ্চ রহস্যের গতিপ্রকৃতির একটা নির্দিষ্ট গতি পথের সন্ধান দেয়। অথচ সাধারণ উপন্যাসের মত ইহাতেও নারী পুরুষের প্রেম-ভালবাসা, বিরহ-মিলনের, সংশয়-দ্বন্দ্বের প্রক্ষিপ্ত পরিণতির সুকৌশল অভিব্যক্তিও আছে।

দিব্যদৃষ্টি সাতটি গল্পের সমষ্টি। ইহাতে মৃত্যুর পরে মানুষের আত্মা অতৃপ্ত বাসনার চরিতার্থ করার জন্য যে আকুল আবেগ ব্যক্ত করা হইয়াছে তাহাতে অনেক সময় মনে হয় যে গল্পের উদ্দেশ্য কোন ভৌতিক অথবা পর জীবনের অলৌকিক কাহিনীর বর্ণনাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য কিনা! কিন্তু অপরাধ বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রকৃতি দেখিয়া মনে হয় যে ইহা ডিটেক্‌টিভ জাতীয় রচনা কি-না। অথচ সমস্ত গল্পগুলির মধ্যেই এক অন্তর্নিহিত ভাবধারার সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে তাহা এই যে সমাজের উপরের স্তরে মানুষের চিন্তাধারার যে পরিচয় প্রকাশ্য দিবালোকে দেখিতে পাওয়া যায়, যেসব ঘটনা আইনের তর্জমায় অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হয়, ঘটনাকারী অপরাধী বলিয়া গণ্য হয়, তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে অথচ বাস্তব মনের প্রত্যক্ষ ঘটনা ও চাক্ষুষ সাক্ষীর অন্তরালে অগোচরে এবং অলক্ষ্যে অতৃপ্ত আত্মার বাসনা চরিতার্থ করার যে একটা সুস্পষ্ট ও সুকৌশল হস্তক্ষেপ আছে তাহা অধ্যাপক গুপ্তের দিব্যদৃষ্টি বইখানি পড়িলে বুঝিতে পারা যায়। সাতটি গল্পই একই সুরের আবহ ছন্দে গ্রথিত অথচ পৃথক ঘটনায় রচিত। ইহা একটি নূতন সৃষ্টি। সৃষ্টির মহিমাতে সৃষ্টিকার সার্থক। তাঁহার প্রতিভায় গ্রন্থখানি একটি নূতন পথের প্রকৃষ্ট ধারক ও বাহক।

অর্থ-ব্যাপার শব্দাবলী—অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রকুমার মজুমদার। প্রকাশক—বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য ১৷৷০।

হিন্দি রাষ্ট্র ভাষা। ইহার ক্রমঃ স্বীকৃতি ও জনপ্রীতি বিভিন্ন দিকে হিন্দী ভাষায় অনুবাদে উপযোগিতা বৃদ্ধি করিয়াছে। সুতরাং বাংলা ভাষার মতই ইংরাজীকে অবলম্বন করিয়া পরিভাষা রচনার প্রয়োজনও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক মজুমদারের আলোচ্য পুস্তকখানি একটি সপ্রশংস রচনা ও সার্থক প্রয়াস। এই উদ্দেশ্য ব্যতীত বাণিজ্য ছাত্রদের হিন্দী আলোচনা ও পরিভাষা রচনা অপরিহার্য। সেদিক দিয়া বইখানি ছাত্রদের প্রয়োজন মিটাইবে। আমরা বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

আর্থিক সংবাদ

পণ্যদ্রব্যের সাপ্তাহিক পাইকারী মূল্যমান—ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে পণ্যদ্রব্যের যে সাপ্তাহিক পাইকারী মূল্যমান নির্ধারণ করিয়াছেন (১৯৩৯ সালের আগষ্ট অঙ্ক বৎসর = ১০০) তদনুযায়ী ২রা ফেব্রুয়ারী অন্তক সপ্তাহে দ্রব্যমূল্য সূচী সংখ্যা ০·২ শতাংশ হ্রাস পাইয়া ৪২৬·২ হইয়াছিল। গুড়, অড়হর ডাইল, লবণ, চাউল, বজরা প্রভৃতির মূল্য হ্রাসের ফলে "খাদ্যদ্রব্যের" মূল্যমান ০·৪ শতাংশ হ্রাস পাইয়া ৪০৫·২ হইয়াছিল। তুলাবীজ, লাক্ষা, তিসিবীজ, রেড়ীবীজ, কাঁচা পাট, রাইবীজ, কাচা রেশম, চীনাবাদাম প্রভৃতির মূল্য হ্রাসের ফলে শিল্পে ব্যবহৃত কাচা মালের মূল্যমান ০·৫ শতাংশ হ্রাস পাইয়া ৫২০·৭ হইয়াছিল। বাদামতৈল,

নারিকেল তৈল প্রভৃতির মূল্যহ্রাসের ফলে অর্থোৎপাদিত দ্রব্যমূল্যসূচী সংখ্যা ০·১ শতাংশ হ্রাস পাইয়া ৪১২·৫ হইয়াছিল। পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪১২·৯।

ভারতে কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি—ভারত সরকারের অধীনস্থ খনিসমূহের প্রধান পরিদর্শক ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতে কয়লা উৎপাদনের যে হিসাব সংগ্রহ করিয়াছেন তদনুযায়ী আলোচ্য মাসে ৩,৬১৮,২৬২ টন কয়লা উৎপাদিত হইয়াছে। পূর্ববর্তী মাসে ৩,৩২৪,২৩৬ টন কয়লার উৎপাদন হইয়াছিল। এই সময়ে খনি অঞ্চল হইতে বিভিন্ন কেন্দ্রে ৩,০৩৮,২২৮ টন কয়লা সরবরাহ করা হইয়াছে। খনিসমূহে মজুত কয়লার পরিমাণ ছিল ২,৭৬৬,৪৫৬ টন।

আলোচ্য মাসে ৮৩৮টি কয়লা খনিতে গড়ে ৩১২,৭৫৯ শ্রমিক কাজ করিয়াছে। প্রত্যেক সিফ্‌টে প্রতি মাইন-রিং ও লেভর ১·১৮ টন, খাদের প্রতি শ্রমিক ০·৭২ টন এবং অন্যান্য শ্রমিকগণ ০·৪১ টন করিয়া কয়লা উত্তোলন করিয়াছে বা উত্তোলন করিয়াছে। শতকরা ১২·১২ জন শ্রমিক কাজে অনুপস্থিত ছিল। নয়টি কোক প্লান্ট এবং অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন শ্রেণীর ৩৫৯,৩৫০ টন কয়লা সরবরাহ করা হইয়াছে ১১৩,৯৪৩ টন।

১৯৫৬ সালে সর্বাধিক পরিমাণে চা-রপ্তানি—১৯৫৬ সালে ভারত হইতে ৫১,৬০,০০,০০০ পাউণ্ড চা রপ্তানি হয় এর দাম ছিল ১,৭০,১০,০০,০০০ টাকা। দাম ও রপ্তানির পরিমাণের দিক দিয়া ইহা রেকর্ড সৃষ্টি করে। ১৯৫৫ সালে ৫৬,৩৮,০০,০০০ পাউণ্ড চা রপ্তানি হয় এবং দাম ছিল ১,১২ ··,১০,০০০ টাকা। ১৯৫৬ সালে ভারতীয় চা-এর সমস্ত মুখ্য আমদানীকারী দেশগুলির চাহিদা বৃদ্ধি হইয়াছিল। যুক্তরাজ্যে ৩৬,৬১,০০,০০০ পাউণ্ড চা রপ্তানি হয়। ১৯৫৪ সালে ঐ দেশে ২৪,৮৯,০০,০০০ পাউণ্ড চা রপ্তানি হইয়াছিল।

ব্যবসা পরিচালনা সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা—ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক এবং ক্ষুদ্র শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও ভোগ্যপণ্য দপ্তরের কলিকাতাস্থিত ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা ব্যবসা পরিচালনা সম্পর্কে চারিমাস কাল মেয়াদের একটি পাঠক্রম প্রবর্তন করিয়াছেন। গত ২রা মার্চ পশ্চিমবঙ্গ বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রী এ. মিত্র উহার উদ্বোধন করিয়াছেন। এই শিক্ষালাভের জন্য মোট ৫০ জন আবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে ২২ জনকে নির্বাচিত করা হইয়াছে। ৪ঠা মার্চ সোমবার হইতে ক্লাস আরম্ভ হইয়াছে। প্রতি সপ্তাহে তিনদিন ক্লাস হইবে।

ভারতে কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি—১৯৫৩ সালে ভারতীয় কারখানা সম্পর্কে যে হিসাব লওয়া হয় তাহা হইতে জানা যায় যে, ১৯৪৯ সালের ৬,৭১৮টি কারখানার স্থলে ১৯৫৩ সালে কারখানার সংখ্যা হয় ৭,১০৩। সেই সাথে মোট মূলধন বিনিয়োগও ৫০৯ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৭২৮ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা হয়।

চিনি উৎপাদন বৃদ্ধি—ভারত সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, বর্তমান মরশুমে ৩১শে মার্চ (১৯৫৭) পর্যন্ত ভারতে ৫৫ লক্ষ ৪৫ হাজার টন উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সময়ে বাজারে ৬ লক্ষ ৮০ হাজার টন দেশী চিনি ছাড়া হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সময়ে দেশে ১৭ লক্ষ ২ হাজার টন চিনি উৎপন্ন এবং ৬ লক্ষ ৮০ হাজার চিনি বাজারে ছাড়া হয়। বর্তমান মরশুমে ৩১শে মার্চ (১৯৫৭) তারিখে দেশের চিনি কলগুলিতে মোট ১২ লক্ষ ৩৫ হাজার টন চিনি মজুত ছিল; পূর্ববর্তী বৎসরের ঐ সময়ে মজুত চিনির পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ ৩৩ হাজার টন।

ফাউনেটপেনের কালি তৈয়ারীর ব্যবস্থা—ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের সাহায্যকল্পে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও ভোগ্যদ্রব্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা এদেশে ফাউন্টেনপেনের কালি তৈয়ারী করিবার একটি পরিকল্পনা প্রনয়ন করিয়াছেন। সংস্থা ইহার বিশদ বিবরণ সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছে। ইহাতে যন্ত্রপাতি কাঁচামাল, মূলধনী ব্যয়, উৎপাদন ব্যয় প্রভৃতি সম্পর্কে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। কোন ফার্ম বা কোন স্থান হইতে যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল পাওয়া যাইবে

তাহাতে ইহা উল্লিখিত রহিয়াছে। ভারতে ফাউন্টেনপেনের কালির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে এখনও উহা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। এই কালি এখনও আমদানী করিতে হইতেছে। ১৯৫৪ সালে দুই আউন্স ফাইলের ৭, ৫৩,০০০ ডজন কালি তৈয়ারী হইয়াছে। ১৯৫৩ সালে দুই আউন্স ফাইলের মাত্র ৫,১৩,০০০ ডজন কালি তৈয়ারী হইয়াছিল। দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। কালির চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে। ইহা ব্যতীত পার্শ্ববর্তী দেশসমূহেও এই কালি রপ্তানির সুযোগ রহিয়াছে। ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার উন্নয়ন কমিশনারের (১১৪ সুন্দর নগর, নয়াদিল্লী) নিকট এবং নয়াদিল্লী, কলিকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজের আঞ্চলিক ডাইরেক্টারের নিকট এই কপি পাওয়া যাইবে।

খাদি ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন—গত ১লা এপ্রিল (১৯৫৬) গঠিত খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশনকে দেশের খাদি ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার ১৯৫৭—৫৮ সালের প্রথম কিস্তিতে ২,১৩,৭৫,০০০ টাকা দিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ১,১১,৫০,০০০ টাকা সাহায্য হিসাবে এবং ১,০১,২৫,০০০ টাকা ঋণ হিসাবে দেওয়া হইয়াছে। খাদি শিল্পের জন্য ১,৫৭,৮৭,৫০০ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৯২,৫০,০০ টাকা সাহায্য হিসাবে এবং ৬২,৩৭ ৫ ০ টাকা ঋণ স্বরূপ দেওয়া হইবে। অন্যান্য চলতি পরিকল্পনার রূপায়নের জন্য আলাদা টাকা দেওয়া হইবে।

ছোট কয়লাখনি সমূহের একত্রীকরণ

ভারতের শিল্পসমূহের জন্য কয়লা একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। তাহা ছাড়া গৃহস্থালীর প্রয়োজনে কয়লার চাহিদাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। সেজন্যই এদেশে কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি এক বিশেষ সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রতি বৎসর অতিরিক্ত দুই কোটি ২০ লক্ষ টন কয়লা উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্তমানের কয়লা খনিসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নূতন নূতন খনি আবিষ্কার করিয়াই উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য যে সকল বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্যের ছোট ছোট কয়লা খনিসমূহকে একত্রিত করিয়া এক একটি ইউনিট গঠন করিলে এগুলির সুষ্ঠু পরিচালনা সম্ভব হইবে। তবেই কয়লা উত্তোলন পদ্ধতির উন্নতি করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। ঝরিয়া এবং রাণীগঞ্জে ৭৩৪টি কয়লা খনি আছে এবং সেগুলির ৬৬২টির মাসিক উৎপাদন ক্ষমতা ১০,০০০ টনের কম। ছোট খনিগুলিতে যন্ত্রপাতি এবং কারিগরী কর্মীর বিশেষ অভাব রহিয়াছে। ইহাদের সম্প্রসারণ করিবার সুযোগও খুব কম। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া কয়লা উত্তোলনের ইচ্ছা বা ক্ষমতা প্রায়শঃই ইহাদের থাকে না। শ্রমিকদের দাবী মিটাইবার এবং প্রচলিত নিয়মানুযায়ী শ্রমিকগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতাও তাহাদের নাই। জাতীয় অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করিবার ক্ষেত্রে কয়লা শিল্প যে ভূমিকা গ্রহণ করিতে সক্ষম তাহা কেবলমাত্র এই নূতন ব্যবস্থাতেই সম্ভব।

কয়লা খনিসমূহ যদি স্বেচ্ছায় একত্রিত হইয়া একটি ইউনিট গঠন করিতে চায় তবে খুব সহজেই এই পরিকল্পনাটি কার্যকরী করা সম্ভব হইবে। কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, সকল ক্ষেত্রে সেরূপ সাড়া পাওয়া যায় না। সেজন্য বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন

হইবে। পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার রাজ্যের সহিত পরামর্শ করিয়া ভারত সরকার একটি কয়লা খনি একত্রিকরণ কমিশন গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। হাইকোর্টের একজন বিচারপতি এই কমিশনের চেয়ারম্যান হইবেন এবং একজন সিনিয়র মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার এবং সিনিয়র একাউন্ট বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসাবে থাকিবেন। এই কমিশন উভয় রাজ্যের কয়লা খনি অঞ্চলসমূহে ব্যাপক তদন্ত করিয়া একত্রীকরণের একটি কার্যকরী পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবেন। ভারত সরকার ইতিপূর্বে খনি ইঞ্জিনীয়ারদের লইয়া যে কমিটি গঠন করিয়াছেন, যদি কোন কয়লা খনি স্বেচ্ছায় একত্রিত হইয়া ইউনিট গঠনে রাজী থাকে তবে এই কমিটি উহা কার্যকরী করিবার উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট হইবেন।

পরিকল্পনা অনুসারে ইউনিট গঠিত হইলে উহা পরিচালনার জন্য অর্থ সংস্থান একটি সমস্যা হিসাবে দেখা দিবে। শিল্পোন্নয়নে সাহায্যকল্পে যে কয়েকটি অর্থ সংস্থা গঠিত হইয়াছে, হয় সেগুলি হইতে অর্থ সংগ্রহ করা হইবে না হয় আলাদা কর্পোরেশন গঠন করা হইবে। কয়লার উপর লেভি ধার্য করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করা হয় তাহা কর্পোরেশনের মূলধন হইবে। নূতন ব্যবস্থা চালু হইবার পরে খনিসমূহে যান্ত্রিকীকরণের ফলে যাহাতে শ্রমিকগণ বেকার না হয় সেজন্য পর্যায়ক্রমে যান্ত্রিকীকরণের সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ফলে অতিরিক্ত শ্রমিকগণের জন্য বিকল্প চাকুরীর সংস্থান সহজ হইবে। শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার জন্য অন্যান্য আরও উপায় অবলম্বন করা হইবে।

বে-সরকারী উদ্যোগে কয়লা উৎপাদন—বে-সরকারী উদ্যোগে কয়লা উৎপাদনের যে সকল আবেদন পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে ২২টি ক্ষেত্রে ভারত সরকার প্রয়োজনীয় অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসে আরও ২৫টি আবেদন পাওয়া গিয়াছে। গত ১লা মার্চ পর্যন্ত কয়লা পর্ষদের নিকট ৪১টি আবেদন জমা ছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে বে-সরকারী উদ্যোগে কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কয়লা শিল্পপতিগণ যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন ভারত সরকার তাহা পর্যালোচনা করিয়া সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে মতামত জানাইয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বে-সরকারী উদ্যোগে প্রতি বৎসর ১ কোটি টন কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে রাণীগঞ্জ কয়লা খনি অঞ্চল হইতে ৫৭ লক্ষ টন, ঝরিয়া হইতে ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার টন, করণপুরা হইতে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টন এবং মধ্যভারতের কয়লা খনিসমূহ হইতে ৫০ লক্ষ টন কয়লা উৎপাদিত হইবে।

বে-সরকারী উদ্যোগে কয়লা উৎপাদনের যে পরিকল্পনা পেশ করা হইয়াছে তাহাকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। যথা বর্তমানে কয়লা উৎপাদিত হইতেছে এইরূপ খনি, এই খনিসমূহের সংলগ্ন অঞ্চলে কয়লা উত্তোলন ব্যবস্থা এবং নূতন অঞ্চলে কয়লার উৎপাদন। সরকার প্রথম শ্রেণীর পরিকল্পনাটি অনুমোদন করিয়াছেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে সরকার স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছেন যে, বে-সরকারী উদ্যোগে উৎপাদনের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করিবার জন্য সরকার নূতন নূতন অঞ্চলের কোন ব্যবস্থা করিবেন। সরকার কয়লা খনি জাতীয়করণের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

(১০৮ পৃষ্ঠার পর)

হইল সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র মূল্যের মুদ্রা। ইহা তিন পাইয়ের সমান। পয়সা খুবই কাজে লাগে কিন্তু বহু পরিশ্রমী লোকের মতই ইহা উপযুক্ত সম্মান পায় না। বস্তুতঃ পয়সার নিজস্ব কোন সরকারী নাম নাই। ইহা হয় এক আনার এক-চতুর্থাংশ ভাগ বা তিন পাই হিসাবে উল্লিখিত হয়।

পয়সার মর্যাদা—নূতন মুদ্রা প্রথার ফলে পয়সার হৃত গৌরব ফিরিয়া আসিবে। মুদ্রা সংস্কার অন্যরূপেও এক বিশেষ ভাবের সূচনা করিতেছে। নয়া পয়সাকে যে প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে তাহার মধ্যেই আমরা "চাষীকে জমি দাও" এই শ্লোগানের রূপ পাই। হিসাবের পাতায় টাকার সাথে পয়সাও তাহার নিজস্ব স্থান পাইবে। পাইয়ের মত নিষ্কর্মাদের আর আনার মত মধ্যস্বত্বভোগীদের পাততাড়ি গুটাইবার জন্য তিন বৎসর সময় দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আমাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী নয়া পয়সার মাধ্যমে তাহাদের পূর্ণ ক্ষতি পূরণ দেওয়া হইয়াছে। সেই ক্ষতি পূরণের হার সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হইবার পর রেডী রেকনার হিসাবে জনসাধারণের নিকট বিলি করা হইয়াছে।

গরীবদের সুবিধা—অস্তিত্ববিহীন পাইয়ের স্থলে নয়া পয়সা চালু করার ফলে গরীবদের খুবই সুবিধা হইবে। খুচরা ক্রয়ের সময় জিনিষপত্রের দাম নয়া পয়সায় ধার্য হইলে ক্রেতাদেরই সামান্য সুবিধা হইবে। কারণ পাই চালু না থাকায় এবং পয়সা সর্বনিম্ন মুদ্রা হওয়ায় এ পর্যন্ত জনসাধারণ ১ পাই বা ২ পাই-এর স্থলে এক পয়সা অর্থাৎ তিন পাই দিয়াছে। সামান্য ২।১ পাইয়ের ক্ষতি তাহারা সহ্য করিয়াছে। নয়া পয়সার মূল্যমান প্রায় ২ পাইয়ের সমান এবং ইহা পূর্বের সর্বনিম্ন মূল্যের মুদ্রা অপেক্ষাও নিম্ন মূল্যের হওয়ায় জিনিষপত্রের দাম পূর্ব অপেক্ষা আরও নির্ভুল হইবে এবং ফলে সাধারণ লোকের আরও বেশী সুবিধা হইবে। এখন কাহাকেও দু'পাই দিবার জন্য তিন পাই মূল্যের পয়সা দিতে হইবে না। একটি নয়া পয়সা দিলেই চলিবে ফলে এক পাই করিয়া বাঁচিবে! অল্প মূল্যের মুদ্রা সৃষ্টি করিয়া এবং নয়া পয়সা ও টাকার মধ্যে ১ : ১০০-এর হার বিধান করিয়া আমরা শুধু হিসাবকেই সরল করি নাই—জিনিষপত্রের মূল্য নির্ণয় ব্যাপারেও আরও নির্ভুল হইতে পারিয়াছি। ইহাতে আমাদের সবাইর সুবিধা হইবে।

অধিক খাদ্য ফলাও অভিযানে আমাদের অবদান

সাকসান হোস্ : * : ডেলিভারি হোস্

ন্যাশনাল রবার ম্যানুফ্যাকচারার্স

প্রাইভেট লিমিটেড

পোঃ বক্স নং ৮৯১০ গ্রাম : "গাট্টম্যান"

অফিস :
"লেসলি হাউস" :
১৯, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩
ফোন : ২৩-৩৯৬০

কারখানা :
৫৪।১০ চিংড়িহাটা রোড,
কলিকাতা-১৫
ফোন : ২৪—০৩৮৯
২৪—০৩৮০

শ্রীবিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক নবগোপাল প্রেস, ১০৪, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিঃ, ৯ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

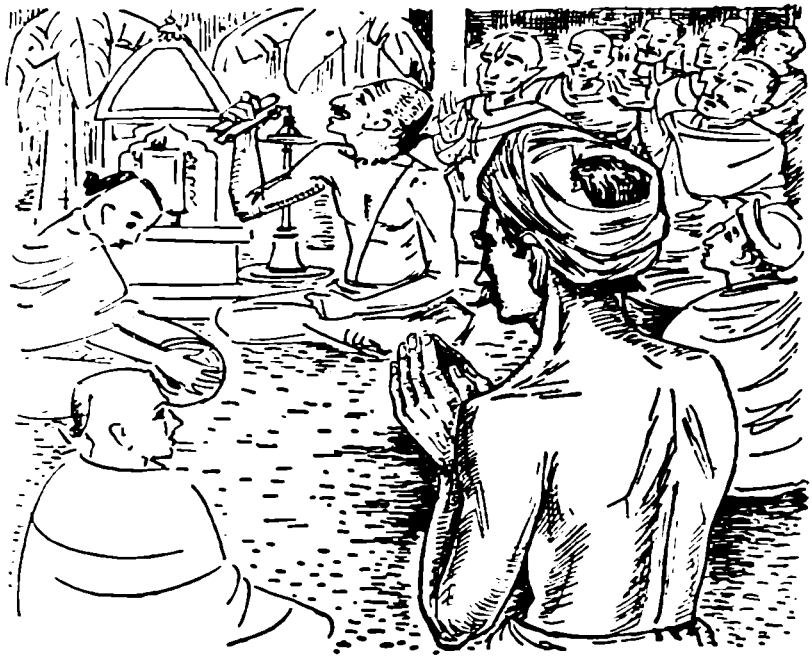

নিঃসন্দেহে—তারও অধিকার আছে...

"মন্দির প্রবেশ হলো একটি পবিত্র কাজ যা 'অস্পৃশ্য'দের কাছে হবে স্বাধীনতার মর্মবাণী—যা তাদের আশ্বাস দেবে, ভগবানের কাছে তারা সমাজচ্যুত নয়।"

—মহাত্মা গান্ধী।

অস্পৃশ্যতা বিলোপ করে ভারতীয় সংবিধান সকলকেই সমান সামাজিক ও নাগরিক অধিকার দিয়েছে।

অস্পৃশ্যতা
নির্মূল করুন
সমতার আদর্শ
তুলে ধরুন

DA 56/243

REGISTERED No. C 3462

প্রাচীন ও আধুনিক
মতে অনুমোদিত

লিলি বার্লি

খাদ্যপ্রাণযুক্ত
খাদ্য, পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৪

পরিচয়

পৃথিবীর ধনী-দরিদ্রের মাথা পিছু আয়

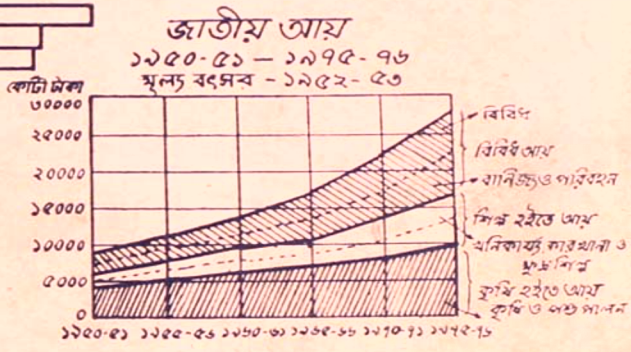

সুলেখা

ফাউন্টেনপেন কালি

সব সময়ে ও সকল ঋতুতে এবং শীত প্রধান দার্জিলিং হইতে গ্রীষ্মপ্রধান রাজপুতানা পর্যন্ত যে কোন স্থানে কলম হইতে সমভাবে কালি নির্গত হইয়া আসে—এই কালির 'সলভেণ্টে' জমাট নিরোধক উপাদান আছে বলিয়া এমনকি হিমাঙ্কতেও কালি সম্পূর্ণ তরল থাকে—ইহাই এই কালির অন্যতম বৈশিষ্ট্য

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বে • মাদ্রাজ

লক্ষ্মী ঘি'য়ে
লক্ষ্মীশ্রী

॥ লক্ষ্মীদাস প্রেমজী · কলিকাতা ॥

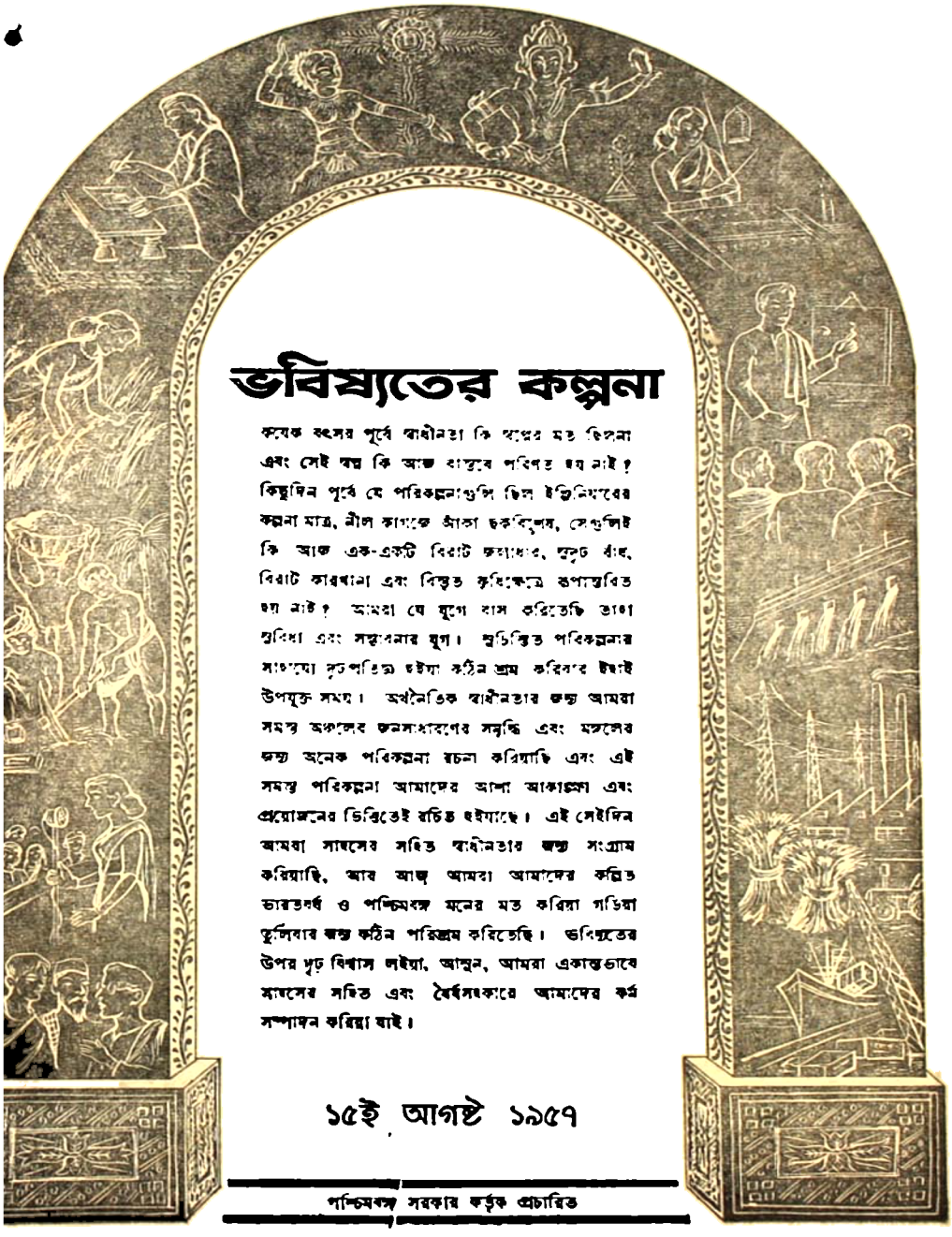

ভবিষ্যতের কল্পনা

কয়েক বৎসর পূর্বে স্বাধীনতা কি স্বপ্নের মত ছিলনা এবং সেই স্বপ্ন কি আজ বাস্তবে পরিণত হয় নাই? কিছুদিন পূর্বে যে পরিকল্পনাগুলি ছিল ইঞ্জিনিয়ারের কল্পনা মাত্র, নীল কাগজে আঁকা ছকবিশেষ, সেগুলিই কি আজ এক-একটি বিরাট জলাধার, সুদৃঢ় বাঁধ, বিরাট কারখানা এবং বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয় নাই? আমরা যে যুগে বাস করিতেছি তাহা সুবিধা এবং সম্ভাবনার যুগ। সুচিন্তিত পরিকল্পনার সাহায্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কঠিন শ্রম করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য আমরা সমস্ত অঞ্চলের জনসাধারণের সমৃদ্ধি এবং মঙ্গলের জন্য অনেক পরিকল্পনা রচনা করিয়াছি এবং এই সমস্ত পরিকল্পনা আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতেই রচিত হইয়াছে। এই সেইদিন আমরা সাহসের সহিত স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছি, আর আজ আমরা আমাদের কল্পিত ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য কঠিন পরিশ্রম করিতেছি। ভবিষ্যতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া, আসুন, আমরা একান্তভাবে সাহসের সহিত এবং ধৈর্যসহকারে আমাদের কর্ম সম্পাদন করিয়া যাই।

১৫ই আগষ্ট ১৯৫৭

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্ত পরিষ্কার করবে!

যে অসংখ্য কোষের সমবায়ে শরীর ও মস্তিষ্ক গঠিত হয়, রক্ত প্রবাহের মাধ্যমেই তারা পুষ্টিলাভ করে; তাই রক্তকে প্রাণরক্ষার প্রধান উপাদান বলা হয়। সেই রক্তই যখন দূষিত হয়ে পড়ে, তখন স্বভাবতঃই বিভিন্ন কঠিন ব্যাধির আক্রমণে জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

সারিবাদি সালসা প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধাবত ভারতের সর্বত্র সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ত শোধক মহৌষধরূপে প্রসিদ্ধ। সারিবাদি সালসা সেবনে বিষাক্ত কোষ পরিষ্কার হয়, ঘেসো, পাঁচড়া, দুষ্ট ক্ষত, একজিমা প্রভৃতি সর্ববিধ চর্মরোগ, বাত ও হাড়ের জীবাণু সংক্রমজনিত সমস্ত কঠিন রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়, শিশুদের জিভা স্বাভাবিক হয়, দৃষ্টি বৃদ্ধি পায় এবং শরীরে প্রচুর বিশুদ্ধ নূতন রক্ত সঞ্চারিত হয়।

সারিবাদি সালসা

সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ত পরিষ্কারক মহৌষধ

স্বনাম ধন্য কবিরাজ ডাঃ নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ-সি-এস (লণ্ড), এফ-সি-এস (আমেরিকা), ভারতের তাবৎ রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষক প্রধানক।

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, এম-বি (কলিঃ), আয়ুর্বেদ-আচার্য্য।
৯৯এ, মোহনবাগান রোড, কলিকাতা-৩৭

সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা
শাখা ও এজেন্সী-পৃথিবীর সর্বত্র

আর্থিক প্রসঙ্গ

ষষ্ঠ বর্ষ : ষষ্ঠ সংখ্যা

সম্পাদক

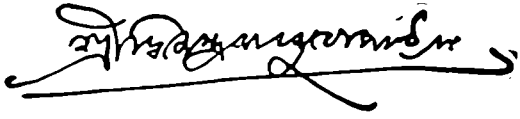

শ্রাবণ : ১৩৬৪
জুলাই—আগষ্ট : ১৯৫৭

কার্য্যালয় :
৭, প্রাইভেট রোড, দমদম, কলিকাতা—২৮
সিটি অফিস
১০৪, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলি-৯

এই সংখ্যার মূল্য এক টাকা।

স্থায়িত্বে ও ঔজ্জ্বল্যে শ্রেষ্ঠ

ল্যাম্প ও ল্যান্টার্ন

ব্রাইটেক্স

ভ্যাজ্‌ল প্রোডাক্টস্ লিঃ

১১৮, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত থেকে

সন্ন্যাস নিয়ে প্রেমাবেশে যখন শ্রীমন্মাহাপ্রভু তিনদিন রাঢ়দেশে ভ্রমণ করেছিলেন তখন শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতগৃহে তাঁর ভোজন-লীলার একটি চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু-বিরচিত বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ জীবনী গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :

সদ্যুত-পায়স নব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ ভরি ধরি॥
দুগ্ধ-চিড়া-কলা আর দুগ্ধ-কর্পূরকি।
যতেক করিলে তাহা বহিতে না শকি॥ (মধ্যলীলা)

খুব ঘন জ্বালের দুধ, অথবা দুধের পিঠে এই ছিল তৎকালীন বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ খাবার

আর এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ খাবার হোল

রসোমালাই

কে, সি, দাশ প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা

অদ্বিতীয় রসোমালাই

দন্তমঞ্জনে নবপ্রগতি

সুবিখ্যাত বিজ্ঞানাগার

ডেন্টনিক

ক্লোরোফিল সহযোগে অধিকতর শক্তিশালী

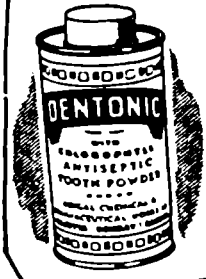

নির্মল মুখগহ্বর
দৃঢ় দন্ত ও মাড়ী
দুর্গন্ধহীন শ্বাস

ক্লোরোফিল ডেন্টনিক দন্ত মঞ্জনে সহজলভ্য হইবে

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা · বোম্বাই · কানপুর

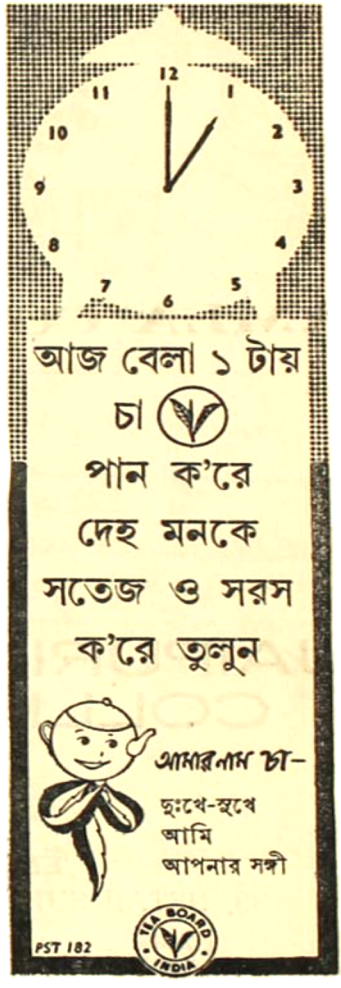

BUY

BEST SELECTED "B" GRADE COAL

FROM

SAMLA COLLIERIES LTD.

&

JAIPURIA KAJORA
COLLIERIES LTD.

ENQUIRIES TO :
33, NETAJI SUBHAS ROAD, CALCUTTA.

Phone : 22 : 2466, 2467, 3347

Gram : JAIPURIA, CALCUTTA

৫·৪১% আয়কর মুক্ত

১২-বছর মেয়াদী নতুন জাতীয় পরিকল্পনা সার্টিফিকেট কিনুন

এবং

আয়কর মুক্ত ৫·৪১% সুদ উপার্জন করুন।

এই সার্টিফিকেটে লগ্নী করা আপনার প্রত্যেক ১০০৲ টাকা ১২ বছর সময়কালের পরে ১৬৫৲ টাকার সমান হবে। যে কোনো ডাকঘরে এই সার্টিফিকেটগুলি পাবেন।

আপনার সঞ্চয় থেকে এখন আরো বেশী আয় হবে।

১০-বছর মেয়াদী ট্রেজারী সেভিংস ডিপোজিট সার্টিফিকেট

মেয়াদকাল পূর্ণ হলে বছরে ৪% হারে করমুক্ত সুদ দেয়। সুদের টাকা বছরে বছরে আপনাকে দেওয়া হয়।

পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপোজিটস্

সুদের হার বছরে ২½%

ন্যাশনেল সেভিংস অর্গানাইজেসন

DA—37/61

A STREAMLINED BEAUTY . . .

A shape, design and finish that add grace to any room...that's Orient fan.

Orient

THE STRONG, SILENT FAN

A.C. OR D.C. CEILING & A.C. TABLE FANS

ORIENT GENERAL INDUSTRIES LTD.
6, GHORE BIBI LANE, CALCUTTA-11

OR-2/57

সৌন্দর্য্যে ও সংরক্ষণে
ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেণ্ট য়্যাণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা : আসানসোল : শিলিগুড়ি : মাদ্রাজ

আর্থিক প্রসঙ্গ

ষষ্ঠ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা]

সূচীপত্র

[শ্রাবণ, ১৩৬৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একশত বৎসর	৩৩৫
স্বাধীনতার দশটি বৎসর	৩৩৭
পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি	৩৩৮
সাম্যের পথে—শ্রীশচীন চৌধুরী	৩৪৫
প্রথম পরিকল্পনার সাফল্যের বিবরণী	৩৪৯
তাঁতশিল্প প্রসঙ্গ—শ্রীআভাস দাশগুপ্ত	৩৫১
ভারত সরকার ও আমদানী নীতি—শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত	৩৫৬
পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের গুরুত্ব—শ্রী এ. কে. শরণ	৩৫৮
সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি—শ্রীসুখেন্দুবিকাশ দে	৩৬০
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অ. আ. ক. খ—শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ	৩৬৫
ভারতে সিমেণ্ট শিল্পের অগ্রগতি—শ্রীপ্রফুল্ল বসু	৩৭০
দেশবিদেশের বৃক্ষ উৎসব	৩৭৩
শিল্পবাণিজ্য জগৎ	৩৭৪
ভারতের পেন্সিল শিল্প	৩৮৫
আর্থিক দিক্‌দর্শন—তথ্যসেবী	৩৮৭
গ্রন্থপরিচয়	৩৮৮
আর্থিক সংবাদ	৩৮৯

আই-এ-সি
আপনাকে দেশের যে কোন জায়গায় নিয়ে যাবে
ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স
কর্পোরেশন
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা
ফোন : ২৩-৫১৪১ (৬ লাইন)
অথবা নিকটবর্তী (আই এ-সি অফিসে)

NATIONAL SHEET
Serves EVERY INDUSTRY

TIN PRINTERS AND
CONTAINERS MANUFACTURERS
INCLUDING
DRUMS KEGS BUCKETS Etc

PHONE: 55-4696 GRAM: NASMET WORK

NATIONAL SHEET & METAL WORKS
PRIVATE LIMITED.
36-A, SAHITYA PARISAD ST. ★ CALCUTTA-6

আর্থিক প্রসঙ্গ

ষষ্ঠ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা] [শ্রাবণ, ১৩৬৪

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একশত বৎসর

১৮৫৭ সালে ভারতবাসী পরাধীনতার হাত হইতে মুক্তিলাভের জন্য সমগ্র দেশব্যাপী যে ব্যাপক আন্দোলন সুরু হইয়াছিল, তাহাকে প্রকৃত পক্ষে ধর্মান্ধ সিপাহীদের দলীয় প্রতিবাদ বলিলে ভুল বলা হইবে। প্রকৃত পক্ষে, তাহা ছিল কোম্পানী শাসনের অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ ভারতবাসীর নির্যাতিত মনের একটা সামগ্রিক সংক্ষোভ।

সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বের কয়েকটি ঘটনা বিচার করিলে দেখা যাইবে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তদানীন্তন দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে যে সনদ ভিক্ষা করিয়াছিল তাহা মুখ্যতঃ ভারতে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য, রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের জন্য নহে। কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারীগণ ক্ষমতালুব্ধ হইয়া রাজ্যবিস্তারের প্রলোভন সংবরণ করিতে পারে নাই। প্রকৃতপক্ষে কোম্পানীর আইন প্রনয়ণের কোন ক্ষমতা ছিল না। কারণ দিল্লীর বাদশাহ কর্তৃক আইন ছিল ভারতে প্রয়োজ্য এবং ইংল্যাণ্ডের গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রচলিত আইন কেবল মাত্র ইংল্যাণ্ডে এবং কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হইতে পারিত। তাহা ছাড়া ভারতে কোম্পানীর গতিবিধি সনদের চুক্তি অনুসারে পরিচালিত হওয়াই আইন সঙ্গত। কিন্তু স্বৈরাচারী কোম্পানীর কর্মচারীগণ কোম্পানীর নামে নূতন নূতন আইন প্রণয়ন, ভূমি আদায়, অনাদায়ে ভূসম্পত্তি নিলাম, খৃষ্ট ধর্মপ্রচারকদের স্বধর্ম মাহাত্ম্য প্রচারে উৎসাহ দান, কুটীর ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ধ্বংস করিবার জন্য নিষ্ঠুর চক্রান্ত ও অত্যাচার, ইহারই সঙ্গে সঙ্গে পল্লী অঞ্চলে নীলকরদের অত্যাচার, বাংলার তাঁতীদের অঙ্গুলি ছেদন, কোম্পানীর সনদ লংঘন, ভারতে ভারতবাসীর উপর নিজেদের অপকর্মের ও অপব্যয়ের সমস্ত ঋণের বোঝা চাপানো এবং ভারতে অবাধিত যুদ্ধ-বিগ্রহের সৃষ্টি দ্বারা অরাজকতার, অশান্তির পত্তন করে। কৃষি ব্যাপারে রাজস্ব আদায়ের জোর জুলুম, খুসী মত জমির বিলি ব্যবস্থা ফলে কৃষির অবনতি—যার পরিণতি ১৮৩০, ১৮৩১, ১৮৩৫, ১৮৩৬ ও ১৮৩৭ সালে অজন্মা ও উপর্যুপরি দুর্ভিক্ষের ফলে—বিশেষতঃ ১৮৩৩ সালের গুন্টুর জেলার অবর্ণনীয় দুর্ভিক্ষের ইতিহাস আজ কোম্পানীর শাসনের ভয়াবহতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কোম্পানী শাসনের অত্যাচার ও নিষ্ঠুর অর্থ শোষণের কাহিনী যে কি নিদারুণ ও মর্মান্তিক তাহা ক্যাপ্টেন ক্যাম্পবেল নামক একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হইতে জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন, "করিম্ব বর্ণনায় যে পড়া যায় কুকুরে মানুষের করোটি চর্বণ করছে, গুন্টুরের অবস্থা তার থেকেও খারাপ। মরা কুকুর ও ঘোড়াও লোকে খাচ্ছে। কেল্লা থেকে একটা গাধা বেরিয়ে পড়েছিল, বুভুক্ষের দল নেকড়ে বাঘের মতন তার অঙ্গগুলো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে নিয়ে তখুনি খেয়ে ফেললে।" রমেশ দত্তের কথায়, "নেলোর এবং উত্তর-আর্কটেও চাষীদের অবস্থা ক্রমে খারাপ হচ্ছিল, যদিও দক্ষিণ আর্কটে অবস্থার একটু উন্নতিই হয়েছিল। সে

মোটের উপর যে সব প্রজার নিজের জমি ছিল বা যাদের ভাগ্যক্রমে খাজনা বেশী ছিল না এরকম মুষ্টিমেয় প্রজা ছাড়া বাকি সকলেরই অবস্থা খারাপ হচ্ছিল। এর উপর নানা দৈহিক অত্যাচার করা হত। এ সম্বন্ধে একটি কমিশন বসান হয় এবং সেই কমিশনের রিপোর্ট (১৮৫৫ সাল) হতে এর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট ১৮৫৫ সালে কিছু প্রতিবিধান করতে বাধ্য হলেন। তখন আবার নতুন করে জরিপ করে পুনর্বন্দোবস্তের কথা ঠিক হল।"

উত্তর ভারতে, বোম্বাই ও মাদ্রাজের বাংলা ও বারাণসীতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের হেরফের রাজস্ব হারের পরিবর্তন ভারতীয় চাষীদের কৃষি কার্যের অবনতির কারণ হইয়াছিল। কৃষিজাত ও শিল্পজাত ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতি ঘটানো তদানীন্তন ইংরেজ শাসণের লক্ষ্য বহির্ভূত ছিল না। ভারত হইতে আমদানী তামাক ও পশ্চিম ভারতীয় আমদানী তামাকের উপর শুল্কের হার সমান করা ও ভারতীয় ও বিলাতী বস্ত্রের উপর শুল্ক হারের কোন পার্থক্য না রাখা তদানীন্তন ইংরেজ শাসণের কার্যকলাপের নমুনা। এইভাবে চিনি, তামাক, তুলো চাষের উপর বিধিনিষেধ প্রয়োগ করিয়া কৃষি কার্যে অবনতি ঘটানো হইয়াছিল। চা, লবণ ও আফিং উৎপাদনের উপর কর্তৃত্ব আরোপ, শুল্ক হার, আমদানী রপ্তানীর উপর বিধিনিষেধ, হোম চার্জেসের ক্রমবৃদ্ধি এবং তাহার ফলে ভারতকে ঋণগ্রস্ত করার সকল রকম প্রয়াস কোম্পানী শাসণের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়াছিল। সুতরাং ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ, পূর্বেই বলিয়াছি ধর্মান্ধ, দলীয় বা সাম্প্রদায়িক প্রতিবাদ নহে, পরাধীনতা জর্জরিত, নির্যাতিত ভারতবাসীর বিক্ষুব্ধ মনের সামগ্রিক ও বৈপ্লবিক অভিব্যক্তি। সেদিন হইতে শতবর্ষ পরে শতাব্দীর সংগ্রাম লাঞ্ছিত স্বাধীন ভারতবাসী আজ নবজীবনের আশার আলোকে যে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও কর্ম চাঞ্চল্যে উজ্জীবিত হইয়াছে, তাহা রক্ষার জন্য, অগ্রগতির জন্য, সামগ্রিক বিকাশের জন্য আজিকার কল্যাণকর রাষ্ট্রের কর্তব্যের দিকে তাহারা চাহিয়া আছে। ধূলি-লাঞ্ছিত পথের মানুষ, নিরন্ন, নিরক্ষর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবাসী কবে স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বয়ং সম্পূর্ণতার গৌরবে মনুষ্যত্বের চরম প্রসাদ লাভ করিবে, তাহারই প্রতীক্ষায় ও প্রত্যাশায় আজও তাহারা দিন গুণিতেছে।

আজি হতে শতবর্ষ পরে সেই অনাগত উজ্জ্বল দিনটি আসিবে কি-না, বৎসরের পরে বৎসর ধরিয়া আমাদের উত্তরপুরুষকে তাহার প্রতীক্ষা করিতে হইবে কি-না, বিগত শত বৎসর ও আগামী শত বৎসরের সন্ধিক্ষণে লাঞ্ছিত মানুষের মুখের দিকে তাকাইয়া তাহাই ভাবিতেছি!

আমরা সাধারণ মানুষ; রাজনীতি বুঝি না, সমাজদর্শন বুঝি না, ইতিহাসের উজ্জ্বল স্বাক্ষরের প্রতি কোন লোভ নাই, শুধু দুঃখদিনের অমানিশার শেষে যাহাতে নতশির ম্লানমুখ মানুষ শত শতাব্দীর করুণ কাহিনী ভুলিতে পারিয়া তাহাদের কষ্ট-ক্লিষ্ট প্রাণ ধারণের জন্য শুধু দুটি অন্ন, একটি আশ্রয় তাহারা লাভ করিতে পারে, তাহাই প্রত্যাশা করি।

"বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।"

"মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘ-মুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্ম প্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে।"

কল্যাণকর রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য সংগ্রাম লাঞ্ছিত মানুষকে মনুষ্যত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করা, মনুষ্যত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা।

স্বাধীন ভারতের কল্যাণকর রাষ্ট্র এই সত্য প্রতিশ্রুতি সার্থক করে তুলিবেন আমরা বিশ্বাস করি।

স্বাধীনতার দশটি বৎসর

জাতির ইতিহাসে দশটি বৎসর নিতান্ত সামান্য সময় কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে ভারত কল্যাণকর রাষ্ট্রের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ভারত রাষ্ট্রকে কয়েকটি

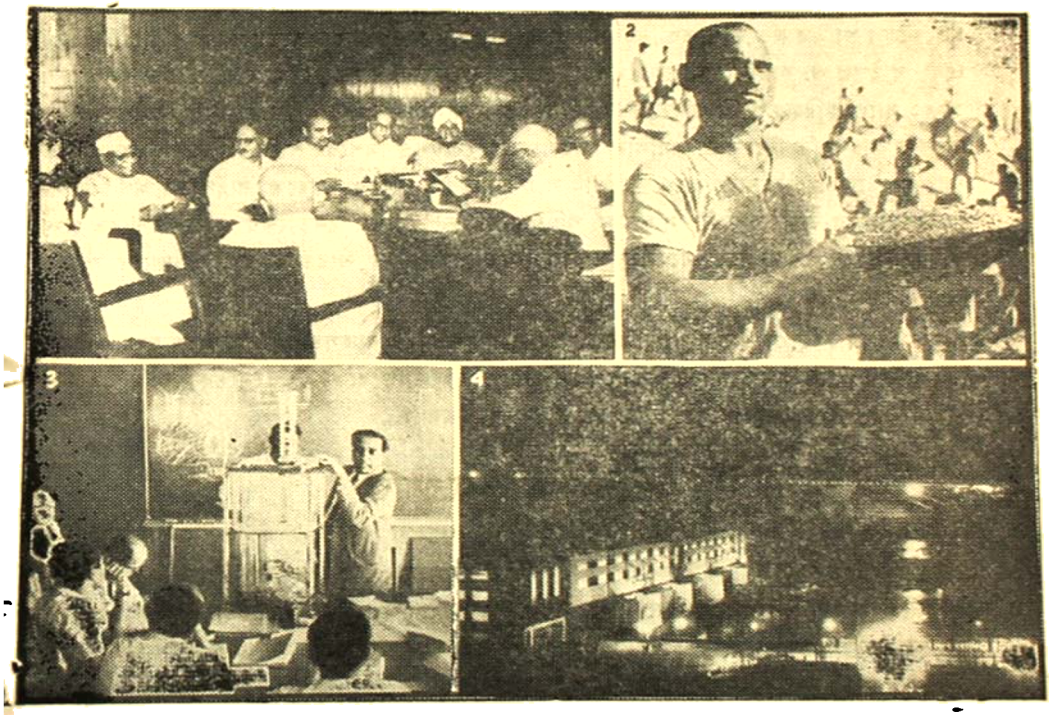

১নং চিত্রে প্রধানমন্ত্রী পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যদের সম্মুখে দ্বিতীয় খসড়া পরিকল্পনা পেশ করিতেছেন। ২নং চিত্রে রাজস্থানের একজন বলিষ্ঠ কর্মীকে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ করিতে দেখা যাইতেছে। ৩নং চিত্রে ডাঃ এইচ, জে, ভাবা আণবিক শক্তি কেন্দ্রের উদ্বোধন করিতেছেন। ৪নং চিত্রে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুকে হীরাকুদ বাঁধের প্রথম ও প্রধান অংশের সমাপ্ত হইলে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিতে দেখা যাইতেছে।

গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি উদ্বাস্তু পুনর্বাসন এবং দ্বিতীয়টি কাশ্মীরের সৈন্য সমাবেশ ও পাকিস্তানের স্বেচ্ছাচার আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। ইহার পরেই আসে কয়েক শত দেশীয় রাজ্যের ভারত রাষ্ট্রের সহিত একত্রীকরণ। ১৯৫৬ সালে পুনর্গঠনের দ্বারা এই কার্য সম্পূর্ণ করা হয়।

১৯৫০ সালে ভারতের সাধারণতন্ত্রী সংবিধান গৃহীত হয় এবং ১৯৫১ সালে ও ১৯৫৬ সালে দুইটি সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক অভ্যুদয় ঘোষণা করা হয়। এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য ভারতে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং পর পর দুইটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রবর্তন ইহারই পদক্ষেপ।

প্রথম পরিকল্পনায় ভাকড়া-নাঙ্গাল, হীরাকুদ ও দামোদর উপত্যকা কর্পরেশনের ভিত্তি স্থাপিত হয় যেগুলির সুফল এখন অতিরিক্ত কৃষি উৎপাদন ও শিল্প সম্প্রসারণ কার্যে পাওয়া যাইতেছে। সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনায় ভারতের বৃহত্তর জনগণকে আত্মচেতনা ও জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে উদ্বুদ্ধ করা হইতেছে। শান্তির জন্য ভারতের নিরন্তর প্রচেষ্টা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। এবং রাষ্ট্রপুঞ্জ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অবদান স্বীকৃত হইয়াছে। ১৯৫১ সালে কোরিয়ায় শান্তি প্রবর্তনে অবদান উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৪ সালেও ইন্দোচীনে ভারতের অনুরূপ কার্যপদ্ধতি বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছে। সেদিনও মিশরের শান্তি রক্ষায় ভারতের সৈন্য বাহিনী উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। মাত্র গত বৎসর ভারতে রাষ্ট্রপুঞ্জের অর্থ বিজ্ঞান-সংস্কৃতি সংস্থার নবম বার্ষিকী সম্মেলনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের আতিথ্য ভারত গ্রহণ করিয়াছিল এবং বৌদ্ধ-জয়ন্তী-সম্মেলন তাহাদের সাদর আপ্যায়ন ভারতকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসন দান করিয়াছিল।

১৯৫৬ সালের ১৫ই মে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া লোকসভায় উপস্থাপিত হয়। প্রথম পরিকল্পনার দ্বিগুণ আয়তনের ও ব্যয়সাপেক্ষ দ্বিতীয় পরিকল্পনা ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতি ত্বরান্বিত করিবে—যাহার প্রথম পাদক্ষেপ হইয়াছিল প্রথম পরিকল্পনা।

পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি

সমগ্র ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গ আজ উৎসব মুখর। আমরা স্বাধীনতা লাভের দশম বর্ষ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করিতেছি। বিগত দশ বৎসর যাবৎ জাতীয় কল্যাণের যে কর্মসূচী আমরা রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিতেছি তাহার মূল আদর্শ সমাজতান্ত্রিক ছাঁচে ঢালা এক নূতন সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতেই এই শান্তিপূর্ণ নীরব বিপ্লবের সূচনা। এই আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যে সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টা ফলবতী করিতে সমর্থ হইয়াছি অথবা যে সমস্ত পরিকল্পনা রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিতেছি তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণীর জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা। অনগ্রসর দেশ বলিয়া আমাদের সম্পদ সীমাবদ্ধ। এই সম্পদের সর্বাধিক প্রয়োগের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে আমাদের বৈষয়িক ও সামাজিক আদর্শ সার্থক রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী যে সমস্ত ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কার্য সমাপ্ত হইয়াছে, তাহা হইতে জাতির অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

খাদ্য—১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে মোট ৪১·৩৩ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। ১৯৫৫ সালের উৎপাদন ছিল ৩৮·৯২ লক্ষ টন। ১৯৫৬ সালে বন্যা ও অনাবৃষ্টির জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে খাদ্যশস্য দুর্মূল্য হইয়া উঠে। খাদ্যশস্যের মূল্য যাহাতে বৃদ্ধি না পায় তাহার জন্য সরকার ন্যায্যমূল্যে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। পল্লীঅঞ্চলেও ন্যায্য মূল্যের দোকান হইতে সাত আনা সের দরে চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে।

কৃষি ও পশুপালন—বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ এবং জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে এই বৎসর প্রতি একরে ১১·৭৩ মণ চাউল পাওয়া যায়। গমের উৎপাদনও এই বৎসর অন্যান্য বৎসরের তুলনায় যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৭-৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে মোট ২১,৪০০ টন গম উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৫৬-৫৭ সালে এই উৎপাদনের পরিমাণ হয় ৪৩,০০০ টন। পাটের উৎপাদনও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে মোট ১৬·৪৮ লক্ষ গাঁট পাট উৎপন্ন হয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে এই উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২২·৬৬ লক্ষ গাঁট।

জনস্বাস্থ্য—১৯৫৬-৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনপ্রতি তিনটাকা দুই আনা ও পাঁচ পাই চিকিৎসা এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ব্যয় করেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে এই খরচের হার ছিল পনের আনা তিন পাই। ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে মোট ৪৮৫টি হাসপাতাল ছিল। ১৯৫৭ সালে মোট হাসপাতালের সংখ্যা ৯৫৩। ইহার মধ্যে ২৬৬টি পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র। জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন মূলক বিভিন্ন পরিকল্পনা কার্যকরী হইবার ফলে হাজার প্রতি মৃত্যুর হার ছিল ১৮·১ হইতে কমিয়া ১৯৫৬ সালে মৃত্যুর হার দাঁড়ায় ৮·২তে। কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগ জনিত মৃত্যুর হারও অনেক কমিয়া গিয়াছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে ১৭,৯৪,৭০৭ লোককে পরীক্ষা করিয়া ৭,৫৭,২১৬ জনকে, বি, সি, জি. টিকা দেওয়া হইয়াছে।

সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা—১৯৫২ সালে ২রা অক্টোবর সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়। পশ্চিমবঙ্গের ১,৫০০টি গ্রাম প্রথমে এই পরিকল্পনার আওতায় আসে। আলোচ্য বর্ষে ১৫০০০টি গ্রামে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চলিতে থাকে। ১০৩টি ব্লকে, কৃষি, পশুপালন, কুটিরশিল্প ও পানীয় জল সরবরাহের উন্নতির জন্য বহুবিধ পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয়।

সেচ ব্যবস্থা—১৯৫৬ সালে খরিফ শস্য উৎপাদনের সময় প্রায় ২০,০০০ একর জমিতে, দামোদর খাল হইতে জল সেচের ব্যবস্থা করা হয়। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার জল বিদ্যুৎ পরিকল্পনাটি ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে কার্যকরী করা হয়। ময়ূরাক্ষী জলাধার হইতে খরিফ ফসল উৎপাদনের জন্য মোট ২,৪৯,১০৪ একর জমিতে সেচ ব্যবস্থা করা হয়। কংসাবতী জলাধার পরিকল্পনার কাজ আলোচ্য বর্ষে যথেষ্ট অগ্রসর হয়। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং হুগলী জেলার ৮ লক্ষ একর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা হইবে। সোনারপুর আমাপাঁচ দ্বিতীয় পর্যায় এবং বাগজোলা, ঘুনি, যাত্রাগাছি পরিকল্পনার কাজ দ্রুতগতিতে সমাপ্ত হইতেছে। পরিকল্পনাটি কার্যকরী হইলে প্রায় ৪৮,০০০ একর জলাজমি পুনরুদ্ধার করিয়া কৃষি কার্যের উপযোগী করিয়া তোলা সম্ভব হইবে। ১৯৫৬ সালে ১১টি ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয়। ইহা হইতে ২৮,২৪০ একর জমিতে সেচের জল দেওয়া যাইবে।

ভূমি সংস্কার—১৯৫৫ সালের ১৫ই এপ্রিল জমিদারী ও মধ্যসত্বের বিলোপ সাধন করায় ফলে চাষীরাই এখন প্রকৃত পক্ষে জমির মালিক। ১৯৫৬ সাল হইতে একর প্রতি ২৲ টাকা হিসাবে

সাময়িকভাবে খাজনা ধার্য করা হইয়াছে। জমিদার এবং মধ্যস্বত্বাধিকারীদের ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৯৫৭ সালের ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত মোট ৫১,২১,০০০ টাকা দেওয়া হয়।

ভূমি হস্তান্তর—১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর, রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বিহার রাজ্য হইতে পশ্চিমবঙ্গে ৩১৬৬ মাইল ভূমি হস্তান্তর করা হয়। এই এলাকার লোকসংখ্যা ১৪,৪৬,৩৮৫। মানভূম জেলা হইতে যে এলাকা পশ্চিমবঙ্গকে হস্তান্তর করা হয়, তাহা লইয়া পুরুলিয়া জেলা নামে একটি নূতন জেলা হইয়াছে। পূর্ণিয়া জেলা হইতে প্রাপ্ত এলাকাটি পশ্চিম দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ মহকুমার সহিত যুক্ত করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় পরিবহণ—আলোচ্য বর্ষে প্রায় ৪০০টি বাস, বিভিন্ন রাস্তায়, দৈনিক প্রায় ৫ লক্ষ যাত্রী বহন করে। রাষ্ট্রীয় পরিবহনে প্রায় ৬,৩৫০ জন লোকের কর্ম সংস্থান হইয়াছে। উহাদের অধিকাংশই পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু। পরিবহনে বাৎসরিক যে আয় হইতেছে, তাহা যাত্রীদের এবং পরিবাহণের কর্মিদের অধিকতর সুযোগ সুবিধার জন্যই ব্যয় করা হইবে।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন—১৯৫৭ সালের ৩১শে মার্চ পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ছিল ৩১·৮৫ লক্ষ। উহাদের মধ্যে ২·৮৫ লক্ষ উদ্বাস্তু শিবিরে অবস্থান করিতেছে। ১৯৫৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ১৯ লক্ষ উদ্বাস্তুকে গৃহনির্মাণের জন্য ঋণ দেওয়া হইয়াছে এবং পুনর্বাসনের জন্য অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। সরকারী প্রচেষ্টায় ৯২,৪৮৬ জনের কর্মসংস্থান হইয়াছে। প্রায় ৩০,০০০ হাজার উদ্বাস্তুকে কারিগরী ও অন্যান্য হাতের কাজের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। উহাদের শিক্ষার জন্য এ পর্যন্ত প্রায় ৭ কোটি টাকা খরচ করা হইয়াছে। ১৯৫৭ সালের ৩১শে মে পর্যন্ত উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বাবদ মোট ৮৬ কোটি টাকা খরচ করা হইয়াছে।

বন্যাত্রাণ—১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ জেলায় বন্যায় প্রভূত ক্ষতি হয়। বন্যার্তদের ত্রাণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। বন্যায় যাহাদের ঘরবাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহাদের প্রত্যেক পরিবারের জন্য ১০০ টাকা করিয়া গৃহ মেরামতি ঋণ দেওয়া হয়। যাঁহাদের নূতন করিয়া গৃহ নির্মাণ করিতে হইবে স্বল্প সুদে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দানের ব্যবস্থা করা হয়। ঋণের পরিমাণ ১৫০০৲ টাকা। ইহা ছাড়া "নিজেদের গৃহনির্মাণ কর"—পরিকল্পনায়, সরকারী সাহায্য করা হইয়া থাকে। এই পরিকল্পনায় ১২০ বর্গফুট পরিধির একটি শয়ন কক্ষ, টিনের ছাত ও পাকা দেওয়াল) ও ৪০ বর্গফুট বারাণ্ডাযুক্ত একটি বাড়ি হইবে। উহার খরচ প্রায় ২৫০৲ টাকা। ইহা ভিন্ন দুর্গতএলাকায় ৪৬৭৬টি টিনের অস্থায়ী আশ্রয়েরও ব্যবস্থা করা হয়। তাহাদের প্রত্যেক পরিবারের জন্য।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গঠনমূলক কার্যের জন্য মোট ১৫৩·৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। বিহার হইতে হস্তান্তরিত এলাকার উন্নয়নের জন্য আরও ৪ কোটি টাকা অধিক ব্যয় হইবে। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার উন্নতির জন্য ২১·৩০ কোটি, স্বাস্থের উন্নতির জন্য ১৯·২৬ কোটি কৃষি ও পশুপালনের উন্নতির জন্য ১৪·০১ কোটি, শিল্পের জন্য ৯·৪৮ কোটি, যানবাহন ও পণ্যঘাটের উন্নতির জন্য ১২·০৩ কোটি এবং সেচ ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ৩০·৪০ কোটি টাকা খরচ করা হইবে। ১৯৫৬-৫৭ সালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৩৫·২৭ কোটি টাকা খরচ করা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে।

স্বাধীনতার দশটি বৎসরে ভারতের অগ্রগতি

সাম্যের পথে

শ্রীশচীন চৌধুরী

মাত্র কিছুদিন পূর্বের কথা—ভারতবর্ষে তখন আর্থিক ও সামাজিক বিষমতা বড়ই প্রবল। এক তো দেশের জনসাধারণ দরিদ্র, তার মধ্যে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে হৃদয়হীন পার্থক্য। আর্থিক ও সামাজিক জাতি ভেদ দ্বারা আবহমান কাল হ'তে তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকদের জন্য বিশেষ রকম আর্থিক ও সামাজিক সুবিধা অথচ অপরের প্রতি বারপর নাই বিতৃষ্ণা ও অবহেলা, অস্পৃশ্যতা; এসকলই যুগ যুগ হ'তে ভারতীয় সমাজের চরম অভিশাপ হয়ে আছে। সমাজ সংস্কার যে দেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের এক অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল তা আকস্মিক নয়। একদা গান্ধীজী অস্পৃশ্যতা দূর করবার কাজকে রাজনৈতিক সকল কাজ অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

এ কথা সত্য যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সাথে সাথে দেশীয় রাজন্যবর্গ এবং তাদের বিপুল ঐশ্বর্য অতীতের কাহিনীতে পর্যবসিত হ'য়েছে এবং বিশাল জমিদারীগুলিও এখন খণ্ড খণ্ড হ'য়ে গেছে। কিন্তু উপার্জনক্ষেত্রে এবং ধনী ও নির্ধনের অবস্থার মধ্যে অত্যধিক বিষমতা এখনও বর্তমান।

পৃষ্ঠভূমি—স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ছিল অপরিসীম ও মর্মান্তিক ব্যবধান আর তারই সাথে ছিল শিক্ষিত সম্প্রদায় ও অশিক্ষিত বা কেবলমাত্র স্বাক্ষর জনসাধারণের মধ্যকার দূরত্ব। শিক্ষা প্রাপ্তির সুবিধা বিশেষত উচ্চ শিক্ষার সুবিধা কেবলমাত্র শহরের মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই শেষোক্তদের মধ্যেও আবার অধিক সুবিধাপ্রাপ্ত আর এক শ্রেণী ছিলেন। তাঁরা ছিলেন এমন সব বড় চাকুরে বা ব্যবসায়ী যার জন্য দীর্ঘ দিনের অধ্যয়ন বা শিক্ষার প্রয়োজন হত। বলা বাহুল্য সেই জন্য কেবল অপেক্ষাকৃত ধনী ব্যক্তিরাই সেই পেশাগুলির সুবিধা পেতে পারতেন। কলকারখানার সাধারণ মজুর বা কেরাণীরা এই পেশাগুলিতে প্রবেশ করবার সুবিধা পান নি—কেবল বড় চাকুরেরাই সে সুবিধা পেয়েছিলেন। এদের উপার্জনে যথেষ্ট তারতম্য ছিল। এছাড়া কৃষক বা ভূমি মজুরের সঙ্গে কারখানার মজুরদের মজুরীর হারেও যথেষ্ট পার্থক্য ছিল।

দেশের শিক্ষিত সমাজ এবং জনসাধারণের মধ্যে দূরত্ব শহরবাসী ও গ্রামবাসীদের মধ্যে মূলগত কতকগুলি পার্থক্য ছিল।—এ পার্থক্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক সকল ক্ষেত্রেই প্রবল ছিল। এর মূল কারণ ছিল আমাদের সমাজে জমাট বেঁধে ওঠা ভারসাম্যহীনতা, ভূমি উৎপাদনের উপর অত্যধিক চাপ এবং ভূমির উৎপাদনও স্বল্প এবং এরই সাথে সাথে গ্রামের কুটির শিল্পগুলির উত্তরোত্তর অবনতি। আধুনিক কলকারখানা ও খনি অঞ্চলের উৎপাদনের সহিত তুলনায় গ্রামের কুটিরশিল্প ও ভূমিজাত উৎপাদন অতি অল্প। সেই জন্যই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির প্রধান উদ্দেশ্য এই ভারসাম্যহীন আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং ভূমি চাষীদের সংখ্যা হ্রাস ও ভূমিজাত উৎপাদনের বৃদ্ধি। এইরূপে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যকার ব্যবধান ক্রমশ নষ্ট করবার প্রয়াস হচ্ছে। ভারতের নতুন সংবিধান রাজনৈতিক ও সামাজিক সাম্যের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তা কার্যকরী করবার জন্য আর্থিক পরিকল্পনাগুলি ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আর্থিক বিষমতা দূর করবার কাজে নিযুক্ত।

আর্থিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এই দৃষ্টিকটু ও অন্যায় ব্যবধানের প্রতিবাদ আমাদের সাহিত্যে, নাটকে ও ব্যঙ্গরচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু সে ব্যবধান এখনও বর্তমান যদিও তা দূর করবার চেষ্টার ত্রুটি নেই। উচ্চ ও নীচ জাতি ভেদে, স্ত্রী ও পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক নৈতিক ও সামাজিক বিধান, পুত্রবধূর অসহায় অবস্থা, কন্যার বিবাহে যৌতুকদানের প্রথা জনিত সমাজে কন্যার হীন অবস্থা, এই সকল সামাজিক ও আর্থিক অন্যায়গুলি হতে সমাজকে মুক্ত করবার চেষ্টা হচ্ছে।

সংবিধান ও সাম্য—সংবিধান দ্বারা ভারতের সমাজে কতকগুলি অন্যায়ের মূলে আঘাত করা হয়েছে। যথা অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, ভারতীয় স্ত্রী—সমাজের প্রতি অন্যায় বিধানগুলির প্রতিবিধান এবং প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নরনারীর ভোট দেবার অধিকার। পূর্বে শিক্ষা ও সম্পত্তির দ্বারা ভোট দানের ও নির্বাচনের অধিকার নির্ণয় হত। বর্তমানে লিঙ্গ, জাতি, সামাজিক বা আর্থিক অবস্থা নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কের ভোট দেবার অধিকারে কোনরূপ বাধা দেওয়া সংবিধানের বিরুদ্ধাচারণ। এটি একটি উদাহরণ, এরূপ আরও সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত মূল অধিকারগুলিকে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা দ্বারা বাস্তবে কার্যকরী করার চেষ্টা হচ্ছে।

বৈধানিক পন্থা—অনেকগুলি আইন প্রবর্তন করে উপরিউক্ত মূল অধিকারগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা হচ্ছে। যথা অস্পৃশ্যতা নিবারণ আইন। এই আইনটির সাহায্যে সংবিধান অনুযায়ী মূল ঐক্যের প্রতিশ্রুতিকে কাজে পরিণত করা হয়েছে। স্ত্রী সমাজের মূল অধিকারগুলি নিশ্চিত করবার জন্য সংসদে হিন্দু কোডের বিভিন্ন ধারা প্রবর্তিত করে নারীর বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার স্বত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। তপশীল ভুক্ত শ্রেণীর উন্নয়ন কল্পে আইন প্রবর্তন এবং উক্ত শ্রেণীর অবস্থার দ্রুত উন্নতির জন্য বিশেষ অর্থ সাহায্য দ্বারা সংবিধান সম্মত মূল অধিকারগুলি বাস্তবে কার্যকরী করার প্রয়াস হয়েছে।

ভূমি ব্যবস্থা সংক্রান্ত আইন—যদিও বর্তমানে জমীর মালিকের নিকট অধিকতম সঞ্চিত ধন নেই, তবুও একথা অনস্বীকার্য যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধনের মধ্যে ভূমি স্বত্বটি সর্বপ্রধান। ঐতিহাসিক কারণে জমির মালিকনা স্বত্ব এক শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলির দ্বারা উত্তরোত্তর শ্রেণী বিশেষের বিশিষ্ট অধিকারগুলির মূলোচ্ছেদ করা হয়েছে। বর্তমানে যে পদ্ধতিতে কাজ হচ্ছে তা সম্পূর্ণ হলে এবং উন্নত উৎপাদন প্রণালী দ্বারা ভূমি চাষীদের অবস্থার উন্নতি সাধন হলে ভূমিজাত উৎপাদনের বর্ধিত আয় দ্বারা চাষীদের হীন অবস্থার অবসান স্বাভাবিক রূপেই হবে।

যারা সোজাসুজি জমির উৎপাদন হতে জীবিকা অর্জন করেন তাদের মধ্যে কেবল যে অধিক পরিমাণে জমির মালিক জমিদার অথবা স্বল্প ভূমির মালিক কৃষাণের অবস্থার বৈষম্য দূর করাই নয়, উপরন্তু বহু সংখ্যক ভূমিহীন মজুর চাষী আছে। এদের অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন করতে হলে জমি পুনর্বণ্টনের প্রয়োজন, অথচ জমির একান্ত অভাব। ধনী জমিদার ও ভূমিহীন কৃষকদের আর্থিক অবস্থার দুস্তর ব্যবধান দূর করতে হলে এক পক্ষের জমির পরিমাণ হ্রাস করে অপর পক্ষকে সেই জমির স্বত্বাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। ভারত সরকার এবিষয়ে অবহিত এবং ভূমিহীন চাষীদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এর দ্বারা অবস্থার দ্রুত প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী।

আর্থিক বিষমতার কারণ—আর্থিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য প্রথমে দেখা দরকার যেন জাতীয় উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হতে না পারে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রযোজকেরা বলেছেন—লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে শ্রেণীগত বৈষম্যতা দূরীকরণের জন্য যেন জাতীয় উৎপাদনের ধারাটি ব্যাহত না হয়। কারণ তা হলে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাটিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। সেইজন্য ভূমিবণ্টনের কাজেও ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হচ্ছে, যাতে ভূমিজাত উৎপাদনে কোন বাধা উপস্থিত না হয়। উন্নত চাষের ব্যবস্থার অনুপ্রেরণা নষ্ট না হয় এবং কৃষিজাত উৎপাদনের সতত বৃদ্ধি হতে থাকে। এবং দু'টির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে অগ্রসর হতে হবে। উৎপাদনের সতত বৃদ্ধি হতে থাকে, এই দুটির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হবে। ভূমি স্বত্ব ভিন্ন অন্যান্য সম্পত্তির সম্বন্ধে এ কথা অবশ্যই সত্য যে বিগত দিনের সঞ্চিত ধনই বর্তমানের আর্থিক বৈষম্যের প্রকৃত কারণ। অন্যান্য যে সকল দেশে সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল এবং ব্যবসা বাণিজ্য তথা উৎপাদন সামগ্রীর মূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তি স্বাধীনতা বর্তমান সে সকল দেশেই অপেক্ষাকৃত অল্প সুবিধা প্রাপ্ত শ্রেণীর অবস্থা ক্রমশঃ হীনতর হয়ে পড়েছে এবং আর্থিক অসাম্য স্পষ্টতর হয়ে পড়েছে। আমাদের দেশেও সম্পত্তির অধিকার ও অর্থকরী কাজ সমূহে যদ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জন ও সঞ্চয় সম্ভবপর হয়েছে সেগুলি বিশেষ জাতির লোক ও স্বল্প সংখ্যক দেশবাসীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

আধুনিক শ্রমশিল্পগুলি যে সামাজিক ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠভূমির উপর গড়ে উঠেছে তা সাম্যের অনুকূল ছিল না। বিনিময় ব্যাঙ্ক সমূহে, চা-বাগান ও পাটের ক্ষেতসমূহে, খনিজ ও যন্ত্র শিল্পোদ্যমগুলিতে, নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সম্পন্ন বৃটিশ এজেন্সি হোলগুলির অস্তিত্বের প্রথম কারণ। অপরদিকে দেশের বিশেষ কিছু সম্প্রদায়ের হাতে বিভিন্ন ব্যবসায় ও মূলধনের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এর দ্বিতীয় কারণ। এমন অবস্থায় সহজেই দেশের ব্যবসা বাণিজ্য—মূলধনের কর্তৃত্ব কার্যকুশলতা ও অভিজ্ঞতা উত্তরোত্তর অল্পসংখ্যক ব্যক্তির করায়ত্ত হয়েছে। উপরিউক্ত কারণগুলি ছাড়াও কিছু ব্যবসা ও উৎপাদন স্থান বিশেষে সহজসাধ্য ও সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে এবং সামগ্রিক তৎপরতার জন্যও সহজেই সেগুলি কেন্দ্রীভূত হতে পেরেছে ও বিশেষ শক্তিশালী হয়েছে। জাতি ভেদের দ্বারা উদ্ভূত বিশেষ বিশেষ কারণেও আর্থিক বৈষম্যতা প্রবল ও স্পষ্ট হয়েছে। তপশীলভুক্ত উপজাতি ও তথাকথিত নিম্নজাতিগুলির অনুন্নত ও শোচনীয় অবস্থার কারণও এই বিষমতা।

আর্থিক বিষমতা নিবারণ—বর্তমানে এই বিষমতা নিবারণ বা হ্রাস করবার জন্য দুইভাবে সংগ্রাম চালাতে হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান আর্থিক সম্প্রসারণের জন্য দ্বার উন্মুক্ত রাখা এবং তারই সঙ্গে কোম্পানী আইন সংশোধন দ্বারা স্বত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অত্যধিক কেন্দ্রীকরণের সুবিধাগুলি সঙ্কুচিত করার প্রয়োজন হয়েছে। এই কারণেই দেশের বৃহত্তম ব্যবসায়িক ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ও দেশবাসীর সঞ্চয়ের যে বিরাট অংশ বীমা কোম্পানীগুলির খাতে জমা হয় সেই বীমা কোম্পানীগুলির রাষ্ট্রীয়করণ প্রয়োজন হয়েছে। শিল্পোদ্যমে প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহের সুবিধাকল্পে বিত্ত সংস্থাগুলির স্থাপনা হয়েছে। বিশেষভাবে নতুন শিল্পোদ্যমগুলির মূলধন সরবরাহ ও অন্যান্য অভাব পূরণ করবার জন্য কিছু পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করাও হয়েছে।

এগুলির উদ্দেশ্য দ্রুত আর্থিক উন্নয়ন এবং আর্থিক উদ্যোগগুলির সম্প্রসারণ। আর্থিক ক্ষমতা বাস্তবে রূপায়িত করাই এই সকল সংশোধন ও পরিবর্তনের কার্য ধারার সামাজিক উদ্দেশ্য।

এইগুলির সাহায্যে আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে। ভূমি ব্যবস্থার, সংস্কার, কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যমগুলির সাহায্যকল্পে সমবায় সংস্থার ব্যবস্থা, এও মূল সামাজিক উদ্দেশ্যেরই আর এক অঙ্গ।

শ্রমশিল্প উদ্যোগগুলির রাষ্ট্রীয়করণ—চালু শিল্প বাণিজ্য উদ্যোগগুলির উন্নয়ন ও আর্থিক সম্প্রসারণের ফলে আর্থিক বিষমতার সম্ভাবনা দেখা যায়, যার ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যমগুলি নষ্ট হয়ে যায়। এই সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করবার জন্য ও ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যমগুলির সাহায্যের জন্য একটি বলিষ্ঠ ও কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করার প্রয়োজন ছিল। কারণ সমাজতন্ত্রের ছাঁচে দেশকে গড়ে তোলার যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তার জন্য আর্থিক ক্ষমতা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। বৃহৎ শিল্পোদ্যমগুলির রাষ্ট্রীয়করণ দ্বারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে। বৃহৎ যন্ত্রশিল্প উদ্যোগগুলির আর্থিক উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত বৃহৎ যন্ত্রশিল্প উদ্যোগগুলির গুরুভার দ্বারা ব্যক্তিগত আয়ত্বাধীন শিল্পগুলির কেন্দ্রীকরণের আশঙ্কা ও সম্ভাবনা নিবারিত হবে। অল্প সংখ্যক লোকের আয়ত্বে অত্যধিক আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হ্রাসও এর একটি উদ্দেশ্য।

সাম্যের পথে—মূলধন সরবরাহ ও তা অপেক্ষাকৃত সহজ প্রাপ্য করবার ব্যবস্থা ও কোম্পানী আইনের সংশোধন দ্বারা শ্রমশিল্প উদ্যোগগুলির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, সমবায় সংস্থাগুলির উন্নতি বিধান ক'রে যেগুলির সাহায্যে ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগ ও কুটির শিল্পগুলির নিরাপত্তার তথা ব্যক্তি আয়ত্ব শ্রম শিল্পোদ্যমগুলিতে আধিকাধিক কেন্দ্রীকরণ নিবারণ এবং ভারী যন্ত্রশিল্প উদ্যমগুলির রাষ্ট্রিয়করণ এই তিন উপায় অবলম্বনে ক্রমশ সর্বশ্রেণীর মধ্যকার খানিক বিষমতা হ্রাস করবার চেষ্টা করা হয়েছে। অপর দিকে ভূমি ব্যবস্থা আইন প্রবর্তন করে সামুদায়িক বিকাশ ঘোজনা কেন্দ্রগুলিতে উন্নয়নের জন্য মান ও বিবিধ সাহায্যের ব্যবস্থা করে এবং রাষ্ট্রিয় বিস্তার সেবা কেন্দ্রগুলির সাহায্যে দেশব্যাপী উৎপাদন বৃদ্ধির আন্দোলন দ্বারা ভূমি উৎপাদন ক্ষেত্রেও এই বৈষম্য হ্রাসের প্রয়াস হচ্ছে।

আর্থিক উপায়—দেশের বর্তমান কর ধার্য পদ্ধতি দ্বারাও আর্থিক ক্ষেত্রে শ্রেণী বৈষম্য দূর করবার প্রয়াস হয়েছে। এতক্ষন বর্তমান আর্থিক বৈষম্য হ্রাস করবার এবং ভবিষ্যতে বৈষম্যের পথ বন্ধ করবার জন্য যে সকল সরকারী নীতি গৃহীত হয়েছে সেই সম্বন্ধে বলা হল। এর ফলে আর্থিক ক্ষেত্রে মূলগত পরিবর্তন হচ্ছে সে পরিবর্তন সমাজের আর্থিক কাঠামোকে রূপান্তরিত করে সমাজ-তন্ত্রের পথে দেশকে অগ্রসর করছে। করভার নির্ধারণ পদ্ধতি ও এই সামাজিক আর্থিক বৈষম্য নিবারণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই গৃহীত হচ্ছে। প্রত্যক্ষ কর নির্ধারণের হার পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং উচ্চতম উপার্জন স্তরে ধার্যিত করের হার প্রায় দণ্ডমূলক করা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রেও এই সামাজিক ব্যবস্থাটিকে নির্ধারিত সীমার মধ্যে সঙ্কুচিত করা হয়েছে কারণ তা না করলে আর্থিক উন্নয়ন শিল্প সম্প্রসারণের পথ বাধাগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা আছে।

উত্তরাধিকার ও মূলধন লাভ শুল্ক—দেশের বর্তমান কর নির্ধারণের ক্রমিক পদ্ধতি যথেষ্ট প্রগতিশীল হলেও সম্পত্তির অক্ষম স্বত্বাধিকার ও উপার্জনের ক্ষেত্র অন্যায় বৈষম্য প্রত্যক্ষ করের এলাকার মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভবপর হয়নি। এখন কর নির্ধারণ ক্ষেত্রের এই অভাবটির খুব দ্রুত পূরণ হচ্ছে। উত্তরাধিকার শুল্ক প্রবর্তন করে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির পরিমাণ

হ্রাস করাই হয়েছে। এ ছাড়া সম্প্রতি মূলধন লাভ শুল্ক (Capital gains tax) প্রবর্তিত হয়েছে। এই দুইটি করের মাধ্যমে বিষমতার কিঞ্চিৎ সমীকরণ হবে। এই কর দুইটির দ্বারা সঞ্চিত সম্পত্তির পরিমাণ পূর্বের তুলনায় হ্রাস হতে থাকবে।

এইভাবে কাজ অগ্রসর হলে সমাজে আর্থিক কাঠামোর পরিবর্তিত রূপটি এমন হবে, যাতে ভবিষ্যতে আর্থিক উন্নয়ন প্রধানত ধনীদের সঞ্চিত মূলধনের উপর নির্ভরশীল না থাকে। তা'হলে ভবিষ্যতে সামাজিক ও আর্থিক অগ্রগতির জন্য আর্থিক বিষমতার প্রয়োজনও থাকবে না। উপরন্তু বিলাস সামগ্রীর আমদানীর উপর শুল্কের হার বৃদ্ধি করে ও স্বদেশে ঐ সামগ্রীগুলির উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করে এবং দ্বিতীয়টি, তদ্বারা নিম্নস্তরের মান বৃদ্ধি। যদিও সর্বপ্রকারে জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য হ্রাস করা একান্ত কর্তব্য। তবুও একথা স্মরণ রাখতে হবে যে সংবিধি দ্বারা কোন একটি বিশেষ চরম সীমা আরোপ এক্ষেত্রে নিরাপদ নয়। কারণ উন্নতি সাধনের অনুপ্রেরণা সম্পূর্ণ লোপ করে দিলে উন্নতির অগ্রগতির রুদ্ধ হয়ে যাবে। এ সমস্যাটির সমাধানের জন্য দরিদ্রতম শ্রেণীর উপার্জন বৃদ্ধি দ্বারা জীবনযাত্রার নিম্নতম শ্রেণীর উপার্জন বৃদ্ধি দ্বারা জীবনযাত্রার নিম্ন মানটি উন্নয়নই শ্রেয়কর। নতুন চাকরী ও উপার্জনে বৃত্তি-গুলির বিকাশ সাধন, ভূমিজাত উৎপাদন বৃদ্ধি, সাধারণ ও বৃত্তি শিক্ষার অধিকতর সুবিধা ও সমাজসেবা কাজের বিস্তার, এইগুলি দেশকে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর করে দেবার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সমাজতন্ত্রের মূল অর্থ সামাজিক ও আর্থিক সাম্য।

প্রথম পরিকল্পনার সাফল্যের বিবরণী

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্যরূপে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হইয়াছে। তাহা ছাড়া, ইহা অনেকগুলি গঠনতান্ত্রিক ও সামাজিক রূপান্তরের সূচনা করিয়াছে। পরিকল্পনা ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে আগ্রহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছে এবং আজ দেশের সর্বত্রই যে দ্রুত উন্নয়নের জন্য একটা নূতন দুর্দমনীয় আগ্রহ দেখা দিয়াছে তাহার মূলেও রহিয়াছে এই পরিকল্পনা। সম্প্রতি পরিকল্পনা কমিশন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফলের যে বিবরণী (১৯৫০-৫১ সালের অগ্রগতির হিসাব সহ) প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে উক্তরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে। পরিকল্পনা কমিশনের সহকারী সভাপতি শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী ইহার মুখবন্ধে বলিয়াছেন, "এই বিবরণীতে প্রথম পরিকল্পনাটিকে সম্পূর্ণভাবে পর্যালোচনা করিয়া উহার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কার্যসূচী রূপায়ণের দ্বারা যে ফল লাভ হইয়াছে তাহার একটি বস্তুনিষ্ঠ বিচারের চেষ্টা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাটির কার্যসূচীর সার্থক রূপায়ণের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক তাহা সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিই এই বিবরণী হইতে সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।"

ইহাতে বলা হইয়াছে, প্রথম পরিকল্পনাটি ছিল একটা প্রারম্ভিক ব্যবস্থা মাত্র। দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন প্রচেষ্টা চালাইতে গেলে সম্পদ সংগ্রহ, প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ঘাটতি পূরণ এবং বিভিন্ন পর্যায়ে বাধার সমস্যা আসিয়া পড়ে। প্রথম পরিকল্পনাকালে এই সকল সমস্যা পরিপূর্ণরূপে দেখা দেয় নাই। যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন দিকে সুসমঞ্জস পূর্ণ অগ্রগতির কথা বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে আমাদের প্রকৃত কাজ এখনও বাকী আছে।

মোট অর্থ ব্যয়—প্রথম পরিকল্পনাটি ১৯৫২ সালে রচিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারসমূহ একযোগে মোট ২,০৬৯ কোটি টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়া উহাতে প্রস্তাব করা হয়।

পরে পরিকল্পনা সম্প্রসারিত হয়। প্রধানতঃ মোট অর্থ ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া অধিক পরিমাণ কর্ম সংস্থানের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনাটির নানাভাবে রদবদল করা হয়। ইহাতে পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৩৭৮ কোটি টাকা। উহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত ব্যয়ের পরিমাণ ১৩৯০ টাকা এবং রাজ্যগুলির মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৯৮৮ টাকা কিন্তু পরিকল্পনার জন্য সংশোধিত বরাদ্দের পরিমাণ ২৩৭৮ কোটি টাকা হইলেও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারসমূহ মোট ২০১২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করিয়াছেন বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে কেন্দ্রের অংশ ১,১১৫ কোটি টাকা এবং রাজ্যসমূহের অংশ ৮৯৭ কোটি টাকা। পরিকল্পনার প্রথম চারি বৎসরের যথার্থ হিসাব এবং পঞ্চম বৎসরের সংশোধিত হিসাই ধরিয়া এই হিসাব করা হইয়াছে। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে পুনর্গঠিত অঞ্চলসমূহের ১৯১৫৫-৫৬ সালের ব্যয়ের হিসাব পাইতে কিছু সময় লাগিবে। ইহা ছাড়াও সমগ্র পরিকল্পনাকালে বেসরকারী ক্ষেত্রে কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প, নির্মাণ কার্য এবং সংগঠিত শিল্পসমূহে ১৭০০ কোটি টাকা ব্যয় নির্ধারিত ছিল। প্রথম পরিকল্পনাকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

	পরিকল্পনায় বরাদ্দ (কোটি টাকা হিসাবে)	মোট অর্থ ব্যয় (কোটি টাকা হিসাবে)
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন	৩৫৪	২৯৯
সেচ ও বিদ্যুৎ	৬৪৭	৫৮৫
শিল্প ও খনি অঞ্চল	১৮৮	১০০
যানবাহন ও যোগাযোগ	৫৭১	৫৩২
সমাজ সেবা	৫৩২	৪২৩
বিবিধ ক্ষেত্রে	৮৭	৭৪
	মোট—২৩৭৮	২০১০

সাধারণতঃ সংশোধিত হিসাবের তুলনায় প্রকৃত ব্যয় কম হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে সংশোধিত হিসাবের ক্ষেত্রে এই কমতি ধরিলে পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৬০ কোটি টাকা দাঁড়াইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। পরিকল্পনাকালে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারসমূহের ব্যয়ের ক্রমবৃদ্ধির পরিমাণ খুবই উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৫-৫৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৯৫১-৫২ সালের ব্যয়ের তুলনায় তিন গুণের ও কিছু কম এবং রাজ্য সরকারসমূহ প্রথম পরিকল্পনায় প্রথম বৎসরে যে পরিমাণ ব্যয় করিয়াছে আলোচ্য বৎসরে ব্যয় হইয়াছে তাহার দ্বিগুণ। পরিকল্পনার প্রতি বৎসরে ব্যয় কিরূপভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া হইল : —

পরিকল্পনায় অর্থ ব্যয়

বৎসর	কোটি টাকার হিসাবে
১৯৫১-৫২	২৫৯·৪
১৯৫২-৫৩	২৬৭·৬
১৯৫৩-৫৪	৩৪৩·০
১৯৫৪-৫৫	৪৭৫·৯
১৯৫৫-৫৬	৬৬৬·৫
	মোট—২০১২·৪

পরিকল্পনা রূপায়নের উপায়—পরিকল্পনাকালে সরকারী উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়নের বিদেশ হইতে ঋণ ও সাহায্য হিসাবে ২৯৬ কোটি টাকা পাইয়াছেন। উহার মধ্যে ১৮৮ কোটি টাকা পাঁচ বৎসরে ব্যয়িত হইয়াছে। বাকী ১০৮ কোটি টাকা দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্য রাখা হইয়াছে।

পরিকল্পনায় ১৯৬০ কোটি টাকা ব্যয়ের মধ্যে কত টাকা কোন খাতে পাওয়া গিয়াছিল তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

		শতকরা
(১) কর ও রেলওয়ের উদ্বৃত্ত	৭৫২ কোটি টাকা	৩৮
(২) বাজারে ধার	২০৫ " "	১০
(৩) স্বল্প সঞ্চয় ও তহবিলবিহীন ঋণ	৩০৪ " "	১৬
(৪) অন্যান্য মূলধনী খাতে	৯১ " "	৫
(৫) বাহিরের সাহায্য	১৮৮ " "	১০
(৬) ঘাটতি	৪২০ " "	২১
	১৯৬০ " "	১০০

স্বল্প সঞ্চয়—পরিকল্পনাকালে স্বল্প সঞ্চয় অভিযানে ২২৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হইবে বলিয়া লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছিল। কিন্তু সংগৃহীত হইয়াছে ২০৭ কোটি টাকা। ইহা দ্বারা পরিকল্পনার ব্যয়ের শতকরা ১২ ভাগ পূরণ করা সম্ভব হইয়াছে। ইহা ছাড়া, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও অন্যান্য খাতের টাকা হইতে পরিকল্পনাকালে ৬৭ কোটি টাকা পাওয়া যায়। স্বল্প সঞ্চয় অভিযান এখনও গ্রামাঞ্চলে পৌঁছায় নাই এবং সহরাঞ্চলের যথার্থ স্বল্প সঞ্চয়কারীদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে নাই। অনুন্নত আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে স্বল্প সঞ্চয় অভিযান উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভের পক্ষে অপরিহার্য। আর্থিক ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রধান সমস্যা হইল জাতীয় আয়ের বেশীর ভাগ টাকা সরকারী তহবিলে লওয়া। প্রথম পরিকল্পনার শেষের দিকে এ বিষয়ে কাজ সুরু হইয়াছে মাত্র বলা যায়। ১৯৫৩-৫৪ সালে পণ্যমূল্যের বাড়তি কমতি ঘটে। উহার পরে মূল্য কমিতে থাকে। ফলে সরকারকে পণ্যদ্রব্যের বিশেষতঃ খাদ্য ও কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য স্থির রাখিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে মূল্য বাড়িতে থাকে। সে সময় হইতে পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত মূল্যহার শতকরা প্রায় ১৪ ভাগ অধিক ছিল। সেই সময় হইতেই ক্রমাগত মূল্য বাড়িয়া চলিয়াছে। কাজেই বুঝা যায় যে, সরবরাহের তুলনায় চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে। মোট কথা উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপায়ন হেতু অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর খুব বেশী চাপ পড়ে নাই। কারণ পরিকল্পনার মধ্য ভাগে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। ১৯৫৯ সালের প্রথম ভাগে আর্থিক পরিস্থিতি ন্যূনাধিক সম্প্রসারিত হয়।

জাতীয় আয়—প্রথম পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে জাতীয় আয় শতকরা ১৭·৫ ভাগ বাড়িয়াছে। কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় ১৯৫৩-৫৪ ও ১৯৫৪-৫৫ সালে অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পরবর্তী দুই বৎসরে জাতীয় আয় বৃদ্ধির পর হ্রাস পায় এবং ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা নামমাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরিকল্পনাকালে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ শতকরা ১·৫ ভাগ বাড়ে। বিনিয়োগের পরিমাণ জাতীয় আয়ের শতকরা ৫ ভাগ হইতে বাড়াইয়া প্রায় ৭ ভাগ অর্থাৎ পাঁচ বৎসরে মোট ৫০০০-৩৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছিল। সরকারী উদ্যোগে অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা, কিন্তু বে-সরকারী উদ্যোগে অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণ হইয়াছে ১৬০০ কোটি টাকার মত। পরিকল্পনা শেষে অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৯৫০-৫১ সালের প্রায় দ্বিগুণ।

পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে উন্নয়ন খাতে তেমন বেশী অর্থ ব্যয় করা যায় নাই। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বৎসরে ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমশ বাড়িতে থাকে, শেষ ছয় বৎসরের ব্যয়ের পরিমাণ পাঁচ বৎসরের মোট ব্যয়ের দুই তৃতীয়াংশ। এই ব্যয় বৃদ্ধি অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। শেষ দুই বৎসরে সরকারী উদ্যোগে শতকরা ৫০ ভাগেরও অধিক অর্থ-বিনিয়োগ করা হইয়াছে। এই দুই বৎসরে বে-সরকারী উদ্যোগে অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। কাজেই পরিকল্পনায় দুইটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্যায়ে সরকারী এবং বে-সরকারী উদ্যোগে বিনিয়োগের হার খুবই কম ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে বিনিয়োগ লক্ষ্যনীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৩-৫৪ সালের কাছাকাছি উৎপাদন খুবই বৃদ্ধি পায় এবং তাহার পরে বৃদ্ধির হার কমিয়া যায়। পরিকল্পনার শেষভাগে দ্রব্যমূল্যের উপর যে চাপ বৃদ্ধি পায় তাহা ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

পরিকল্পনার শেষ দিকে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার করিতে থাকে, কিন্তু অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণ স্থির গতিতে বাড়ে, কাজেই অর্থবিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধির মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে না। প্রথমত কৃষি নির্ভরশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশেষত যে দেশে কৃষিকার্য বৃষ্টির মুখাপেক্ষী সেখানে জাতীয় আয়ের বাড়তি কমতি না হইয়া পারে না। সেখানে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের মধ্যে একটা পরিষ্কার সম্পর্ক গঠনের পূর্বে বেশ কিছুদিন যাবৎ নিয়মিতভাবে অর্থবিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। পরিকল্পনাকালে যে সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহার কতকগুলি উহা নিতান্ত আকস্মিক। প্রথম পরিকল্পনায় যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা বস্তুত পরিপূর্ণ পর্যায়ের নহে বরং সম্প্রসারণ পর্যায়ের সূচনা মাত্র।

কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন—প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন অপ্রত্যাশিত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬ কোটি ৪৮ লক্ষ টন। উহা ১৯৪৯-৫০ সালের তুলনায় ১ কোটি ১০ লক্ষ টন অধিক। ১৯৫৩-৫৪ সালে এদেশে ৬ কোটি ৮৮ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হইয়াছিল। ১৯৫৪-৫৫ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬ কোটি ৬৩ লক্ষ টন তুলা, পাট ও তৈলবীজের উৎপাদনও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৪৯-৫০ সন ১০০ এই ভিত্তিতে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের সূচক সংখ্যা ১৯৫০-৫১ সালের ৯৫·৬ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৩-৫৪ সালে ১১৪·৩ ও ১৯৫৪-৫৫ সালে ১১৪·৩ ও ১৯৫৪-৫৫ সালে ১১৬·৪ হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে উৎপাদনের পরিমাণ কিছু হ্রাস পায়। মোটের উপর পরিকল্পনা কালের প্রথমে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের সূচক সংখ্যা যাহা ছিল পরিকল্পনাকালের শেষে তাহা শতকরা ১৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

পরিকল্পনায় ৭ কোটি ৬০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের যে লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল উহাতে ছোট ও বড় সেচ পরিকল্পনা, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বীজ, ভূমি পুনরুদ্ধার ও অন্যান্য পরিকল্পনা রূপায়নের ফলে খাদ্যোৎপাদন যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব তাহার হিসাবও ধরা হইয়াছে। বস্তুতপক্ষে দেশে খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ অত নহে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে দেশের খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৬০ লক্ষ টন কম হইয়াছে। উপরে সমগ্র ভারতের খাদ্যোৎপাদন পরিস্থিতির একটা হিসাব দেওয়া হইয়াছে। বিহার ও উত্তর প্রদেশ রাজ্যে যে খাদ্যোৎপাদন হ্রাস পাইয়াছিল মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ এবং রাজস্থানে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির ফলে তাহা পোষাইয়া গিয়াছিল। অনুকূল আবহাওয়ার দরুণ খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ প্রধানত সর্বত্রই বৃদ্ধির দিকে ছিল। প্রথম পরিকল্পনা রূপায়নের অভিজ্ঞতা হইতে বোঝা যায় যে, গত কয়েক বৎসর ধরিয়া কৃষির উৎপাদন বিষয়ে যে যে ব্যবস্থা এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নানাভাবে কাজ করিয়াছে। প্রত্যেক রাজ্যকে যে সকল বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা না করিয়া দেখিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। দেশের সামগ্রিক উৎপাদনের গতি-প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অতি সতর্কভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। বিবরণীতে এই বলিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে যে, প্রথম পরিকল্পনাকালে কৃষি বিভাগ এবং সম্প্রসারণ সংস্থাগুলি স্থানীয় সার সম্পদের উন্নয়নের প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগ দেয় নাই। তবে সহযাকলে পচাই সার উৎপাদনে যথেষ্ট অগ্রগতি লক্ষ্য করা গিয়াছে। ইহাতে আরও বলা হইয়াছে উন্নত ধরণের শঙ্কবীজ উদ্ভাবন এবং প্রচুর পরিমাণে সেগুলির উৎপাদনে ও বিতরণে বিশেষ কাজ করা হয় নাই। পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়েই যে কাজ শেষ করা উচিত ছিল তাহা দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্য রাখিয়া দেওয়া হইত।

সেচ ও বিদ্যুৎ—প্রথম পরিকল্পনাকালে সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যসূচী রূপায়নে ৫৬৯ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ইহা সমগ্র পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের ২৯ ভাগ। প্রথমাবস্থায় এই বাবদ ৫৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইবার পূর্ব হইতেই কয়েকটি বৃহৎ পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া প্রথম পরিকল্পনায় বৃহৎ পরিকল্পনা রূপায়নের উপর

(অবশিষ্টাংশ ৩৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

তাঁতশিল্প প্রসঙ্গ

শ্রীআভাস দাসগুপ্ত

তাঁত ভারতের বৃহত্তম কুটীর শিল্প। কাহুনগো কমিটির রিপোর্ট হইতে জানা যায়, এদেশে তাঁত-শিল্পের উপর নির্ভরশীল নরনারীর সংখ্যা প্রায় দেড় কোটীর কাছাকাছি। অর্থাৎ এদেশের শতকরা ৪ জন তাঁতশিল্পের উপর নির্ভরশীল। এদেশে বর্তমানে তাঁতের সংখ্যা প্রায় ২৮ লক্ষ এবং তাঁতশিল্পে উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ প্রায় ১৪০ কোটী গজ। তাঁতবস্ত্রের দ্বারা সমগ্র ভারতবর্ষের শতকরা ২৫ ভাগ বস্ত্রের চাহিদা মিটানো হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—উভয় পরিকল্পনাতেই তাঁত-শিল্পের উন্নতির জন্য সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। পরিকল্পনার উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। তাঁহারা বলিতে চাহেন, যে, তাঁতশিল্পের মাধ্যমে এদেশে একটি বিরাট সংখ্যক নরনারীর অন্ন সংস্থান হইতেছে। এই শিল্পের প্রসার ঘটিলে আরও অধিক সংখ্যক নরনারীর কর্মসংস্থান হইবে। এখানে কর্মসংস্থান কথাটীর মধ্যে আরও একটু বিশেষ গুরুত্ব আছে। সাধারণতঃ তাঁতশিল্পের সহিত যাহারা সংশ্লিষ্ট, তাহারা জাতিতে তাঁতি বা তন্তুবায়। কাপড়কল স্থাপনের পূর্বে এদেশে যাবতীয় বস্ত্রের অভাব তাঁতিরাই মিটাইত। কাপড় কল স্থাপিত হইবার পর হইতে ক্রমশঃ তাঁতিদের অবস্থা দিশেহারা হইয়া পড়ে। বহু সংখ্যক তাঁতি জাতি ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া অন্য উপজীবিকা গ্রহণ করে। তাঁত বয়নে তাঁতিদের স্বাভাবিক উৎকর্ষ রহিয়াছে, আর তাহা ছাড়া ভারতীয় তাঁতিদের বয়ন ক্ষমতা অতুলনীয়। জাতিগত ব্যবসায়ের মাধ্যমে অধিকসংখ্যক তাঁতিদের কর্মসংস্থানে সাহায্য করিলে দেশের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর নরনারীর কর্মসংস্থান ব্যবস্থা যেমন ত্বরান্বিত হইবে, তেমনই দেশের একটী প্রাচীন গৌরবোজ্জ্বল শিল্প বাঁচিয়া থাকিবার সুযোগ পাইবে এবং সেই সঙ্গে দেশবাসীও মিল বস্ত্রের একচেটিয়া অস্তিত্বে ভারাক্রান্ত না হইয়া রুচিসম্মত বস্ত্র ক্রয়ের সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে না।

ইংরাজ সরকার আর যাহা কিছুই করিয়া থাকুক না কেন, তাঁতশিল্পের উন্নতির জন্য তাঁহারা উল্লেখ-যোগ্য কিছুই করেন নাই। "তাঁত-শিল্পকে সাহায্য প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে সিমলায় একটি বৈঠকের আহ্বান করেন। এখানে ঠিক করা হয়, যে, প্রাদেশিক সরকার সমূহের মারফৎ বারো বৎসরের জন্য তন্তুবায় শ্রেণীর সাহায্যের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বাৎসরিক ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন। কিন্তু এই বৎসামান্য আর্থিক সাহায্যের ফলে কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না।" ইংরাজ সরকার কাপড় কলের স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখিতেন, কারণ উহাতে তাহাদের নিজেদের স্বার্থ ছিল। তবে একটি কাজের জন্য ইংরাজ শাসনের সময়কে ধন্যবাদ দেওয়া যায়। বর্তমানে সমগ্র ভারতবর্ষে তাঁতশিল্পের উন্নয়নের দায়িত্ব যে হ্যাণ্ডলুম বোর্ডের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে, সেই বোর্ডের পরিকল্পনা ইংরাজ আমলের। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে তাঁতশিল্প সম্বন্ধে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হয় এবং পরবর্তী বৎসরে এই কমিটি রিপোর্ট দাখিল করেন। এই রিপোর্টে একটি সর্বভারতীয় তাঁত সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম বোর্ড স্থাপিত হয়, কিন্তু দুইবৎসর পরে ইহার কাজ বন্ধ হইয়া যায়।

তাঁতের সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু কাপড় কল। সেজন্য কাপড় কলের সংঘাত হইতে প্রথমে তাঁতশিল্পকে রক্ষা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার একটি বিশেষ ঘোষণা

দ্বারা রঙ্গীন শাড়ী, সারং, লুঙ্গি, গামছা, ঘরকাটা তোয়ালে, গজ, ব্যাণ্ডেজ ও জ্যাকোনেট কাপড়ের উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে তাঁতশিল্পের জন্য সংরক্ষিত করেন। দুই বৎসর পরে কাপড় কলের উপর একটি উৎপাদন কর (Excise duty) বসানো হয়। এই কর বাবদ প্রাপ্ত অর্থ তাঁতশিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হইতে থাকে। এই করের নাম "তাঁত ও খাদি সেস"। এই কর বাবদ বৎসরে প্রায় ৪ কোটী টাকা পাওয়া যায়। প্রথম বৎসরে এই টাকা হইতে তাঁতিগণের সাহায্যের জন্য ৩ কোটী ৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং বাকী ৯৪ লক্ষ টাকা হ্যাণ্ডলুম বোর্ডের সংরক্ষিত তহবিলে রাখিয়া দেওয়া হয়।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের প্রচেষ্টায় পুনরায় অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম বোর্ডের কাজ সুরু হয়। বোর্ডের কার্য ধারা মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত—(১) তাঁতশিল্পের উন্নয়ন ও প্রসার এবং (২) তাঁত-বস্ত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা। কাপড় কলের উৎপাদনের উপর গজ প্রতি ১ পয়সা উৎপাদন শুল্ক বসাইয়া বৎসরিক যে ৪ কোটী টাকা পাওয়া যায়, সেই অর্থের দ্বারাই বোর্ডের কাজ চালানো হয়। রাজ্য সরকার সমূহের মাধ্যমে বোর্ডের বরাদ্দ অর্থ বিভিন্ন রাজ্যে তাঁতি ও তাঁতশিল্পের জন্য ব্যয় করা হয়। ভারতীয় কুটীর শিল্পের উন্নয়নের জন্য যে তিনটী বোর্ড গঠন করা হইয়াছে, তন্মধ্যে গত কয়েক বৎসরে হ্যাণ্ডলুম বোর্ডই সবচেয়ে বেশী কাজ করিয়াছে। সমবায়ের তাঁতশিল্প পরিচালনার জন্য বোর্ডের তরফ হইতে সবিশেষ লক্ষ্য প্রদান করা হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের তাঁতশিল্প প্রধান রাজ্য সরকার সমূহ তাহাদের রাজ্যে এই সমবায় পরিকল্পনা কার্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য সচেষ্ট। যে সকল তাঁতি সমবায় সমিতিতে যোগদান করিবে তাহারা অধিক সুযোগ সুবিধা পাইবে। তাঁতিদের উন্নত ধরণের তাঁত ও মাকু, রঞ্জনদ্রব্য, সুতা এবং অন্যান্য মাল মসলা বোর্ডের তরফ হইতে সর-বরাহের ব্যবস্থা এবং নূতন নূতন ডিজাইনের বস্ত্র বয়ন সম্বন্ধে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। সুতার সুবিধার জন্য ভারত সরকারের আদেশে প্রত্যেক কাপড়ের কলকে উৎপন্ন সুতার একটি নির্দিষ্ট অংশ তাঁতশিল্পের ব্যবহারের জন্য বিক্রয় করিতে হয়। ইহার ফলে তাঁতগুলি সুতার অভাবে অচল হইয়া থাকেনা। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁতশিল্পে সুতা সরবরাহের পরিমাণ ছিল মাসিক ৮৫ হাজার বেল। বিক্রয়ের দিক হইতে বোর্ডের ব্যবস্থায় ও রাজ্য সরকারসমূহের কার্যকরিতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে যথেষ্ট সংখ্যক দোকান স্থাপিত হইয়াছে। তাঁতবস্ত্রের কাটতি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বোর্ডের অধীনে একটী কেন্দ্রীয় বিক্রয় বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। ইহার প্রধান কার্যালয় মাদ্রাজে অবস্থিত। এই বিভাগের প্রচেষ্টায় মাদ্রাজ, বোম্বাই, বেনারস, নাগপুর, গোয়ালিয়র ও কলিকাতায় বড় ধরণের বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত এই বিভাগের দ্বারা তাঁতবস্ত্রের রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন, কলম্বো এবং বাগদাদে মার্কেটিং অফিসার নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুর, এডেন এবং ব্যাঙ্ককে বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ পূর্ব এসিয়ার দেশগুলি ভারতীয় তাঁত-শিল্পের প্রধান আমদানীকারক। তাঁতবস্ত্রের মধ্যে সাধারণতঃ লুঙ্গি, সারং, মাদ্রাজী রুমাল ও চেলি এবং পর্দা অধিক পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে। বর্তমান বৎসরে গতে ৬ কোটী গজ তাঁতবস্ত্র রপ্তানি হয় ইহার মূল্য মোটামুটি ৬।৭ কোটী টাকা।

গত কয়েক বৎসরে আমাদের দেশে তাঁতশিল্পের প্রভূত উন্নতি ঘটিয়াছে। দেশের সর্বত্র আজকাল তাঁতবস্ত্রের বিক্রয় কেন্দ্র দেখা যায়, যেমন সুন্দর সুন্দর তাঁতের জিনিষ তৈয়ারী হইতেছে তেমনি

জনসাধারণও অনেক বেশী তাঁতবস্ত্র ক্রয় করিতেছে। তাঁতবস্ত্র অধিক কাটতির একটি বড় কারণ হইতেছে সরকারী আদেশ দ্বারা রঙীন শাড়ী বয়ন সম্পূর্ণ ভাবে তাঁতশিল্পের আওতার মধ্যে রাখা। মিলে আর রঙীন শাড়ী তৈয়ারী হয় না, অথচ এদেশে রঙীন শাড়ীর যথেষ্ট চাহিদা। রঙীন শাড়ীর চাহিদা মিটাইবার সুযোগ পাইবার দরুণ তাঁতশিল্পের প্রসার ঘটিতেছে খুব দ্রুত।

ভারতবর্ষের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ, অন্ধ্র প্রভৃতি রাজ্যগুলিতে তাঁতশিল্পের সর্বাপেক্ষা প্রসার ঘটিয়াছে। এই সকল অঞ্চলের রাজ্য সরকারগুলি তাহাদের এলাকার মধ্যে তাঁতশিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষ যত্নবান, আগ্রহশীল ও সচেষ্ট। দক্ষিণ ভারতে বেকার সমস্যা প্রবল। তাঁতশিল্পের মাধ্যমে সেখানে বহু নরনারীর কর্মসংস্থান হইতেছে। ভারত সরকারের প্রচেষ্টায় তাঁতশিল্পের উন্নয়ণের জন্য যে সকল সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইতেছে, দক্ষিণ ভারতীয় তাঁতিগণ সেগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতেছে এবং একথা বলাও অনুচিত হইবেনা যে হ্যাণ্ডলুম বোর্ডের কার্যধারা দক্ষিণ ভারতেই চোখে পড়ে বেশী। দক্ষিণ ভারতের তাঁতবস্ত্রে সমগ্র দেশ ছাইয়া গিয়াছে।

ঠিক এই পটভূমিকায় পশ্চিমবঙ্গের তাঁতিদের কথা ভাবিলে দুঃখের সীমা থাকেনা। এই বাংলা দেশে একদিন তাঁতশিল্প সর্বাপেক্ষা অগ্রণী ছিল। কিন্তু আজ ফরাসডাঙ্গা শান্তিপুরকে ছাড়াইয়া বাংলার বাজারেই বাঙ্গালোরে প্রস্তুত তাঁতবস্ত্র বেশী বিক্রয় হইতেছে। বাঙ্গালোরের কাপড় দামে সস্তা। গত কয়েক বৎসরে বাংলার তাঁতশিল্পের কিছুটা উন্নতি ঘটিলেও অগ্রগতির হিসাব তেমন কিছু আকর্ষণীয় নয়। দক্ষিণ ভারতে তাঁতশিল্পে সমবায় আন্দোলন যেমন সার্থকতা লাভ করিয়াছে, পশ্চিম বাংলা সে তুলনায় যথেষ্ট পশ্চাদপদ্ অথচ গুণে বয়নের উৎকর্ষ এবং নক্সার দিক হইতে বাংলার তাঁতবস্ত্র আজিও অতুলনীয়। ফরাসডাঙ্গা ও শান্তিপুরের তাঁতবস্ত্রের কাছে বাঙ্গালোরের তাঁতবস্ত্র নিতান্ত খেলো জিনিষ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার হ্যাণ্ডলুম বোর্ডের কার্যধারার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেছেন না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কার্যধারায় বাস্তববাদী দৃষ্টির অভাব। পশ্চিম-তাঁতবস্ত্র যাহাতে অপেক্ষাকৃত সস্তায় বিক্রয় হয় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। পশ্চিমবাংলার তাঁতবস্ত্র যাহাতে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয়, সে ব্যবস্থাও করা উচিত। তাঁতশিল্প সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দূরদৃষ্টির অভাবের একটি পরিচয় দিতেছি। হ্যাণ্ডলুম বোর্ডের তরফ হইতে তাঁতবস্ত্র কাটতি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ক্রেতাকে টাকা প্রতি দুই আনা পর্যন্ত ফেরৎ দেওয়া হইয়া থাকে। তাঁতবস্ত্রের উপর বিক্রয় কর রহিত করা হইয়াছিল ঐ একই উদ্দেশ্যে। কিন্তু পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থদপ্তর হঠাৎ ঘোষণা করিলেন যে তাঁতবস্ত্রের উপর বিক্রয় কর ধার্য করা হইবে। অবশ্য তাঁতবস্ত্র ব্যবসায়ীদের আন্দোলনের ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা সম্ভব নয় নাই। তাহা ছাড়া, আইন যদি এই ভাবে তৈয়ারী হয়, যে, পশ্চিম বাংলার বাহির হইতে আমদানী তাঁতবস্ত্রের উপর বিক্রয় কর দিতে হইবে এবং পশ্চিমবঙ্গে তৈয়ারী তাঁত- বস্ত্রের উপর বিক্রয় কর দিতে হইবে না, তাহা হইলে কোন আপত্তির কারণ নাই।

ভারত সরকার ও আমদানী নীতি

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

বিগত ১৯৫৬-৫৭ সালে ভারতে কতটি পরিমান পণ্য আমদানী বৃদ্ধি পেয়েছিল সেটা হয়ত আমাদের সকলেরই জানা আছে। অর্থাৎ এটি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে হাজার কোটি টাকার অঙ্কে দাঁড়িয়েছিল। অথচ রপ্তানি প্রায় আগের অবস্থায় রয়েছে। অর্থাৎ ছয় শত পঞ্চাশ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানী হয়ে গেছে। প্রশ্ন হতে পারে, কেন ১৯৫৬-৫৭ সালে আমদানী খাতের খরচ বেড়ে গিয়েছিল। ঐ বছর এমন কতকগুলি জিনিষ আমদানী করতে হয়েছিল যে সেগুলোর সাহায্যে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল। এ ছাড়া বহুল পরিমাণে লৌহ, ইস্পাত, যন্ত্রপাতি এবং বিভিন্ন ধরণের কাঁচা মাল আমদানী করতে হয়েছে। তাই আমদানী খাতের ব্যয় বেড়ে গেছে। বিগত কয়েক বছর ধরে ভারতে বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করা হচ্ছে। কিন্তু ভারত সরকারের বর্তমান মনোভাব বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, সরকার কেবলমাত্র সে সব পরিকল্পনা কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ করতে সচেষ্ট। সেগুলো পাঁচশালা পরিকল্পনার অন্তর্বিশেষ। অবস্থি যদি অবস্থার উন্নতি হয় তাহলে সরকার পাঁচশালা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নয় এই ধরণের পরিকল্পনাগুলোর ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ করতে দ্বিধা করবেন না। শুধু তাই নয়, তখন সরকার হয়ত সে সব পরিকল্পনাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন বৈদেশিক সাহায্যের অভাবে সেগুলোর রূপায়ন এখন সম্ভবপর হচ্ছে না। তবে আপাততঃ সরকার নূতন আমদানী নীতি এখন কঠোরভাবে আরোপ করতে সচেষ্ট, যার ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় নয় এই ধরণের ভোগ্যদ্রব্য এবং যন্ত্রপাতি কম আমদানী করা হবে। এই বছরের ২৯শে জুন তারিখে সরকার যে নীতি ঘোষণা করেছেন সে নীতি "aims at drastic reduction in imports to stem the heavy drain on foreign exchange, its most conspicuous feature is the abolition of O. G. L. for the next three months."

যেপরোয়াভাবে কি রকম বছর দুয়েক আগে ভারত সরকার কর্তৃক বিলাসপণ্য আমদানী করার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল সেটা হয়ত আমাদের অনেকেরই জানা আছে। এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে। প্রশ্নটি হল কেন সরকার তখন এইভাবে লাইসেন্স বিতরণ করতে অতটি উৎসাহিত হয়েছিলেন। সরকারের হাতে সে সময়ে একটি স্বচ্ছলতার সুযোগ এসেছিল, যদিও সে সুযোগের মেয়াদ বেশী দিন ছিল না। এই সুযোগের ফলে সরকার বিভিন্ন ধরণের বিলাস দ্রব্য আমদানীর জন্য লাইসেন্স বিতরণ করতে অতটুকু দ্বিধা করেননি। ২৯শে জুন তারিখে সরকার যে আমদানী নীতি ঘোষণা করেছেন সে নীতির তাৎপর্য হল "During the next quarter no license will be issued for importing finished goods, while licences for essential raw materials will be issued on ad hoc basis after strict scrutiny. The import of capital goods will continue to be only on deferred payment." ভারতের বাণিজ্য সচিব মাত্র অল্প কয়েক দিন আগে আমদানী উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছেন। সে বৈঠকে তিনি আমদানী সম্পর্কীয় নানা বিষয়ের অবতারণা করেছেন। তাঁর ভাষণ থেকে জানা যায়, বহির্বাণিজ্যে ১৯৫৭ সালের প্রথম দু মাসে গড়ে ত্রিশ কোটি টাকা ঘাটতি পড়েছে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, দিনের পর দিন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারিত হচ্ছে। বাণিজ্যের প্রসারের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জোর চেষ্টা চলছে যেহেতু এঁরা ভালভাবেই জানেন, নিজেদের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে হলে রপ্তানি ও বাণিজ্যের বিস্তার ছাড়া উপায় নেই সেহেতু রপ্তানি বাণিজ্যের বিস্তারের দিকে এঁদের বিশেষ দৃষ্টি রয়েছে। তাই সে সব দেশে স্বাভাবিকভাবে রপ্তানি বাণিজ্যের বিস্তার ঘটেছে। কিন্তু আমাদের দেশে বহির্বাণিজ্যে ক্রমশঃ ঘাটতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধু তাই নয়, শীঘ্র আমাদের দেশে বহির্বাণিজ্যের অবস্থা আশাপ্রদ হয়ে উঠবে বলেও মনে হয় না। তাই সরকার আমদানী হ্রাস করতে বাধ্য হয়েছেন। বিগত ৯ই জুন তারিখের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা মন্তব্য করেছেন, "The deferred payments scheme for imports, launched in a rather uninspiring manner, is now receiving from the Government the detailed attention that it deserves. There is prospect of a liberalization of capital imports. But in general restrictions balance is still necessary."

যদি আমদানীর পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয় তাহলে পণ্যের ঘাটতি পড়বেই। ভারত সরকার ও এ সম্বন্ধে সচেতন বলে মনে হয়, কারণ বাণিজ্য সচিব পণ্যের ঘাটতির সুযোগ নিয়ে দর না চড়াবার জন্য ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করেছেন। অবশ্যি ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য সচিবের অনুরোধ অনুযায়ী চলবেন কিনা সেটা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। বরঞ্চ বেভাবে এর আগে ব্যবসায়ীরা সরকারী উপদেশ অগ্রাহ্য করে চলেছেন তা'তে এঁদের ভবিষ্যৎ আচরণ সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হচ্ছে। আমদানী উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে বাণিজ্য সচিব বলেছেন, যে সব ব্যবসায়ী আমদানী হ্রাসজনিত পণ্য ঘাটতির সুযোগ নিয়ে অবৈধভাবে মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করবেন সরকার সে সব ব্যবসায়ীর অনুকূলে বিতারিত লাইসেন্স একেবারে বাতিল করে দিবেন. কিভাবে এবং কতটা পরিমাণ তাঁর এই সাবধান বাণী অনুযায়ী সরকারী নীতি নির্ধারিত হবে সেটা আমরা আগ্রহের সাথে লক্ষ্য করতে থাকব।

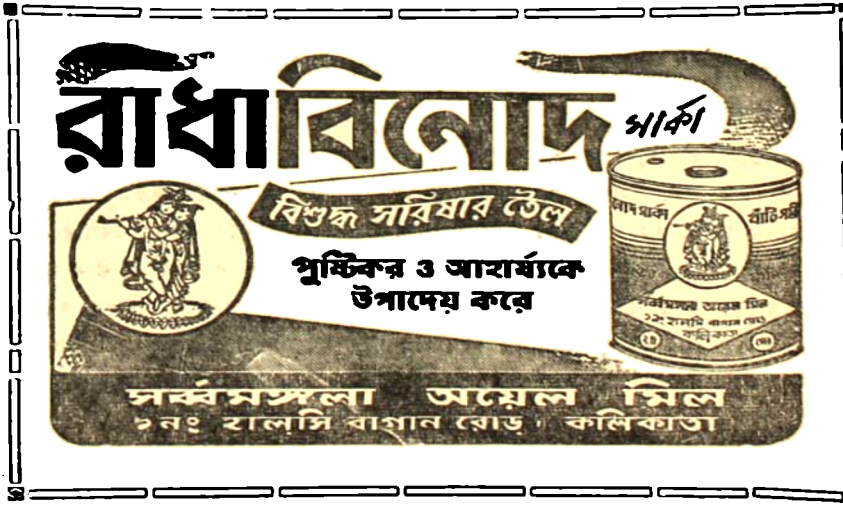

পশ্চিম বাংলার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লাক্ষার গুরুত্ব

শ্রী এ. কে. শরণ, পরিসংখ্যান অফিসার,
ভারতীয় লাক্ষা কর কমিটি

প্রায় চা এবং পাটের অনুরূপ লাক্ষাও পশ্চিম বাংলার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া আছে। ভারতের রাজ্যসমূহের পুনর্গঠনের ফলে বিহারের কতকগুলি লাক্ষা উৎপাদন কেন্দ্র পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই কারণে পশ্চিম বাংলায় লাক্ষার বার্ষিক উৎপাদন ৪৫ হাজার বাড়িয়া ২ লক্ষ ৪৫ হাজার মণে দাঁড়াইয়াছে। ভারতে উৎপন্ন লাঠি লাক্ষার এক-তৃতীয়াংশ কলিকাতায় পরিশোধন করিয়া গালায় পরিণত করা হয়। সমগ্র দেশে লাক্ষা পরিশোধনের যে ৪০০টি দেশী কারখানা আছে উহাদের মধ্যে ১৬০টি পশ্চিম বাংলায় অবস্থিত। তাহা ছাড়া, এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের অর্দ্ধাংশ কলিকাতায় কার্যরত আছেন। লেখক এই প্রবন্ধে পশ্চিম বাংলার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লাক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন।

রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে বহু পরিমাণ লাক্ষা উৎপাদক অঞ্চল পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহাতে পশ্চিম বাংলার বার্ষিক লাক্ষা উৎপাদনের পরিমাণ ৪৫ হাজার মণ হইতে বাড়িয়া ২ লক্ষ ৪৫ হাজার মণ অর্থাৎ ভারতের মোট উৎপাদনের মধ্যে ৪·০৮ শতাংশ হইতে বাড়িয়া ২২·২২ শতাংশে দাঁড়াইয়াছে। তাই পশ্চিম বাংলার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লাক্ষা আজ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। লাক্ষা গরীবের ফসল। ছারপোকার মত দেখিতে এক প্রকার কীটের নিঃসৃত লাক্ষাই হইতেছে লাক্ষা। পলাশ, বের, কুসুম, প্রভৃতি গাছের রস খাইয়া উহারা জীবন ধারণ করে। পশ্চিম বাংলার মাঠেও বাগৃহের সন্নিহিত জমিতে এই সকল গাছ যথেষ্ট জন্মে। এই সকল গাছে লাক্ষা কীট ছাড়িয়া দিবার পর লাক্ষা সংগ্রহ করা পর্যন্ত চাষীবাড়ের মত আর কোনও কাজ করিতে হয় না। এই কারণে নিতান্ত গরীবেরাও স্বল্প ব্যয় ও মেহনতের দ্বারা লাক্ষা ফলাইয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতে পারে। এজন্য পশ্চিম বাংলার দরিদ্র কৃষকদের নিকট লাক্ষা হইতেছে প্রকৃতি মায়ের অকুণ্ঠ দান। আর গরীব আদিবাসীরাই এই দানের অধিকাংশ ভোগ করিয়া থাকে।

পশ্চিম বাংলার মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় যথেষ্ট লাক্ষা উৎপন্ন হয়। উহা উহা পরিশোধনের জন্য বলরামপুর, ঝালদা, তুলিন, পুরুলিয়া ও কাত্রায় কুটির শিল্পের ভিত্তিতে অনেক কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। এগুলি ছাড়া যান্ত্রিক পদ্ধতিতে গালা উৎপাদনের জন্য কলিকাতায় দুইটি বড় কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। পশ্চিম বাংলায় যথেষ্ট লাক্ষা উৎপন্ন হইলেও এই রাজ্যে উহার ব্যবহার খুবই কম এবং অধিকাংশ নগদ মূল্যে বিক্রয় করা হইয়া থাকে। সময় সময় দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথা, লবণ, কেরোসিন ও মিষ্ট দ্রব্যের বিনিময়েও লাক্ষা বিক্রয় হয়। এই কারণে লাক্ষা একটি মূল্যবান অর্থকরী ফসল এবং পশ্চিম বাংলার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাট এবং চায়ের প্রায় অনুরূপ উহার গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

লাক্ষার ব্যবহার—পশ্চিম বাংলায় খেলনা, চুড়ি, স্বর্ণালঙ্কার ও আসবাবের পালিশে লাক্ষা ব্যবহৃত হয়। তাহা ছাড়া, নূতন বাসনপত্রের নীচে আঁচড় রোধ এবং সীল করার কাজেও উহার

ব্যবহার আছে। উপরোক্ত কার্যাদিতে একমাত্র খারাপ জাতের লাক্ষা ব্যবহৃত হয় এবং তাহাও পরিমাণে খুবই কম।

লাক্ষার বেশী ব্যবহার হয় বার্ণিশ, গ্রামোফন রেকর্ড, সীলের গালা, টুপি, পেষাইয়ের চাকা, বৈদ্যুতিক ইনস্যুলেটিং দ্রব্যাদি যথা, স্তরবিশিষ্ট, কাগজের বোর্ড ও টিউব, অভ্রের স্তরবিশিষ্ট পাত, বার্ণিশ করা সুতী ও রেশমী কাপড়, ইনস্যুলেটিং বার্ণিশ ও ইনস্যুলেটিং সিমেণ্ট প্রস্তুত করিবার সময়। ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, অতীব শিল্প-সমৃদ্ধ দেশ যেখানে জীবন ধারণের ব্যয়মানও বেশ উন্নত, সেগুলি ছাড়া অন্যত্র এই সকল দ্রব্য উৎপাদন তথা লাক্ষার যথেষ্ট ব্যবহার সম্ভব নয়। উৎপন্ন লাক্ষার মাত্র প্রায় ৮ শতাংশ ভারতে ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট ৯২ শতাংশ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মাণী, রাশিয়া, ফ্রান্স, জাপান এবং আরও কয়েকটি দেশে হয়। এই কারণে লাক্ষা বিক্রয় করিয়া ভারতের যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা আয় এবং উহার অধিকাংশই হইতেছে ডলার। ভারতের বার্ষিক গড়পড়তা লাক্ষা রপ্তানির মূল্য হইতেছে ১০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, দেশের মোট উৎপাদনের প্রায় ২২ শতাংশ লাক্ষা পশ্চিম বাংলায় জন্মে। তাহা ছাড়া, ভারতের মোট লাঠি-লাক্ষার এক তৃতীয়াংশ কলিকাতার দুইটি সুবৃহৎ কারখানায় যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিশোধিত গালায় পরিণত হয়। সমগ্র দেশে লাক্ষা পরিশোধনের যে ৪০০টি দেশী কারখানা আছে উহাদের মধ্যেও ১৬০টি পশ্চিম বাংলায় অবস্থিত। ভারতে লাক্ষা শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের প্রায় অর্দ্ধাংশেরও অন্ন সংস্থান হয় পশ্চিম বাংলার লাক্ষা কারখানাগুলি হইতে।

লাক্ষার মূল বিপণণ কেন্দ্র—সমগ্র দেশের মধ্যে কলিকাতাই হইতেছে লাক্ষা বিপণণের মূল কেন্দ্র। কস্তুতঃ দেশের সকল লাঠি লাক্ষা, গালা প্রভৃতি বিক্রয়ের জন্য কলিকাতায় প্রেরিত হয় এবং কলিকাতা বন্দরের মারফতেই লাক্ষার সকল প্রকার আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। যথেষ্ট সংখ্যক চাষী এবং এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকগণ ছাড়াও এই রাজ্যের বহু মধ্যবর্তী ব্যক্তি যথা, পাইকার, দালাল, রপ্তানিকারক প্রভৃতি লাক্ষার আয় হইতে জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। এই কারণে পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদের মাথা পিছু আয়ের মধ্যে লাক্ষার অবদান কম নয়।

লাক্ষা উৎপাদনের বার্ষিক হিসাব

রাজ্য	রাজ্য পুনর্গঠনের পূর্বে	মোট উৎপাদনের শতকরা	রাজ্যপুনর্গঠনের পরে	মোট উৎপাদনের শতকরা হার
বিহার	৬,৫০,৫০০ মণ	৫৮·৯৭	৪,৫০,৫০০ মণ	৪০·৮৪
মধ্যপ্রদেশ	২,৮৭,০০০ ,,	২৬·০২	২,৭৫,৫০০ ,,	২৪·৯৮
পশ্চিমবাংলা	৪৫,০০০ ,,	৪·০৮	২,৪৫,০০০ ,,	২২·২১
উত্তর প্রদেশ	১১,০০০ ,,	১·০০	১১,০০০ ,,	২১·০০
বিন্ধ্য প্রদেশ	৩৪,৫০০ ,,	৩·১৩	—	—
বোম্বাই	১৫,০০০ ,,	১·৩৬	৬৫,০০০ ,,	৫·৯০
উড়িষ্যা	১৮,০০০ ,,	১·৬৩	১৮,০০০ ,,	১·৬৩
আসাম	১৮,০০০ ,,	১·৬৩	১৮,০০০ ,,	১·৬৩
পাঞ্জাব	২,০০০ ,,	·১৮	২,০০০ ,,	·১৮
অন্যান্য রাজ্য	২২,০০০ ,,	২·০০	১৮,০০০ ,,	১·৬০
	মোট—১১,০২,০০০ ,,	১০০·০০	১১,০৩,০০০ ,,	১০০,০০

পশ্চিম বাংলার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লাক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া রাজ্য সরকার ও ভারত সরকার উহার সকল প্রকার সমস্যা—যথা, লাক্ষা কীটের অভাব, মূল্যের তেজমন্দি, মধ্যবর্তী ব্যক্তিদের দ্বারা ভেজাল মিশান, চুরি, ওজনের প্রকার ভেদ প্রভৃতির সমাধানে যত্নবান হইয়াছেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—অভাবের সময় লাক্ষা কীট সরবরাহের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাকালে এই কীটের চাষ কেন্দ্র খোলা হইবে। চুরি ও অসময়ে লাক্ষা সংগ্রহ রোধ এবং বিপণ্ন ব্যবস্থার উন্নয়নের উদ্দেশে সমবায় লাক্ষা সমিতি স্থাপন করা হইবে। তাহা ছাড়া, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চাষীদিগকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে। এই সকল পরিকল্পনা কার্যে রূপান্তরণের ফলে ভারতে লাক্ষার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। চাষীদের আয় বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জীবনধারনের মানও উন্নত হইবে।

———

সাম্প্রতিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি

শ্রীসুখেন্দুবিকাশ দে

বর্তমানে যে গুরুতর সমস্যাটি সরকারকে বিশেষ করে জনসাধারণকে চিন্তিত করে তুলেছে, তা দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাও নয়, বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কটজনক পরিস্থিতিও নয়—তা হচ্ছে সাম্প্রতিক আভ্যন্তরীণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। এমন অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি স্বাধীনোত্তর ভারতের ইতিহাসে সত্যই বিরল। একদিকে দুঃসহ করভারের জ্বালা অন্যদিকে খাদ্যদ্রব্যাদির অগ্নিমূল্য—এই দুইয়ের চাপে জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যানচাল হবার উপক্রম হয়ে উঠেছে। কিন্তু জনৈক প্রভাবশালী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী (সতর্ক পাঠকেরা নিশ্চয়ই নামটি মনে করতে পারবেন) জোর গলায় পার্লামেন্টে বলেছেন যে, সাম্প্রতিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির (?) পরিচায়ক। কিন্তু কাদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে? যারা সমাজের উপরের তলায় থাকেন, বর্তমান পুঁজিবাদী শ্রমিক শোষিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে যাদের আয় তথা ক্রয়ক্ষমতা বাড়বার কথা শুধু তাদেরই ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। কিন্তু যারা সমাজের নীচের তলায় পড়ে আছেন, সেই চির অবহেলিত, দুঃস্থ সংখ্যা গরিষ্ঠ জনসাধারণের মোটেই ক্রয়ক্ষমতা বাড়েনি। তাই এইভাবে আবোল তাবোল বলে জনসাধারণকে যেমন একদিকে উপহাস করা হয়, অন্যদিকে জনসাধারণের চোখে নিজেরাও হীন প্রতিপন্ন হন। বিগত দশ বৎসরে ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশের খাদ্যসমস্যা সমাধানে সরকারী অক্ষমতা ও দোষ ত্রুটি ঢাকবার জন্য এই হীন অপকৌশল কেন?

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নানা কারণে ঘটতে পারে। যেমন (১) দেশের স্বাভাবিক প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন হ্রাস, (২) অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে শস্যহানি ও ক্ষতি (৩) বিদেশ হতে আমদানি হ্রাস বা পূর্ণবন্ধ। (৪) বিদেশে খাদ্যশস্যাদি রপ্তানি (৫) যুদ্ধের সময় সরকার কর্তৃক দেশের মধ্যে সামরিক প্রয়োজনে খাদ্যশস্যাদি ক্রয় (৬) সরকার কর্তৃক দেশের মধ্যে ঘাটতি ব্যয় নীতি অনুসরণ, (৭) বাজেটে বিভিন্ন দ্রব্যের উপর নূতন নূতন কর স্থাপন (৮) মুদ্রা স্ফীতি (৯) ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক খাদ্যশস্যাদি মজুতকরণ (১০) ব্যাঙ্ক কর্তৃক কৃষকদের শস্যের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত দাদন দান। দেশে যে আজ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, উপরোক্ত অনেক কারণই তার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

বর্তমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে বিগত কয়েক বৎসরের দ্রব্য মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। স্বাধীনোত্তর ভারতে ১৯৫০ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি হতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরে হ্রাস পেয়ে বর্তমান অবস্থায় পৌছেছে। বিগত ছয় বৎসরে দ্রব্যমূল্য যেভাবে হ্রাস বৃদ্ধি পেয়েছে, তারই একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র নিয়ে দেওয়া হ'ল। (ক) ১৯৫০ সালের জুন মাস হতে ১৯৫১ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫০ সালের জুন মাসে কোরিয়া যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধের দরুণ আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যশস্য এবং কাঁচামালের মূল্য প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ইহা ছাড়া আমেরিকার Stock piliug প্রোগ্রামও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান সহায়ক ছিল। যুদ্ধের প্রভাবের ফলেই আমাদের দেশেও পণ্যমূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৩৯ সালে সূচক সংখ্যা ১০০ ধরলে ১৯৫০ সালের জুন মাসে খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে ৪০৭·১ হয়েছিল।

১৯৫১ সালের এপ্রিলের পর থেকে ১৯৫২ সালের মার্চ পর্যন্ত দ্রব্যমূল্য হ্রাস। কোরিয়ার যুদ্ধের ব্যাপারে সন্ধি স্থাপনের ফলে যুদ্ধের আশঙ্কা হ্রাস পায়। তার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য হ্রাস পেতে থাকে এবং তার প্রতিক্রিয়া আমাদের দেশেও দ্রব্যমূল্যের উপর পরিলক্ষিত হয়।

১৯৫২ সালের মার্চের পর থেকে ১৯৫৪ সালের আগষ্ট পর্যন্ত মন্দাভাব দূরীভূত হয়ে পুনরায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস হতে ১৯৫৫ সালের মে মাস পর্যন্ত পুনরায় দ্রব্যমূল্য হ্রাস পেতে থাকে। এই কয়েক বৎসর নিয়মিত এবং সময় মত মৌসুমী বৃষ্টি হওয়ায় শস্যের উৎপাদন প্রচুর বৃদ্ধি পায়। তার ফলেই দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়।

কিন্তু ১৯৫৫ সালের জুন মাস থেকে ক্রমাগত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে পেতে বর্তমান অবস্থায় পৌচেছে। গত দু বৎসরে দ্রব্যমূল্য কিভাবে বেড়েছে তা নিম্নে প্রদর্শিত চার্টটি অনুসরণ করলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে।

ভিত্তি বৎসর : ১৯৩৯=১০০

	এপ্রিল ১৯৫৫ সাল	এপ্রিল ১৯৫৬ সাল	ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭	মার্চ ১৯৫৭ সাল	৮ই জুন ১৯৫৭ সাল
খাদ্যশস্য	২৮৩·৬	৩৬০·৯	৪০৬·০	৪০২·৫	৪৩৫·৭
শিল্পের কাঁচামাল	৩৯৮·৬	৪৭২·৮	৫২০·৫	৫১৮·০	৫৩৯·৯
অর্ধ-সমাপ্ত শিল্পদ্রব্য	৩২৭·৪	৩৭৭·০	৩১০·৬	৪০৩·৩	৪১৪·৫
শিল্পদ্রব্য	৩৭৭·১	৩৭৫·৬	৩৮৫·৫	৩৮৪·১	৩৯০·৬
সাধারণ সূচক	৩৪৫·৪	৩৯১·২	৪২৫·০	৪২১·০	৫৭০·৭

ইহা ছাড়া সমস্ত দ্রব্যের পাইকারী দ্রব্য মূল্যের এর সূচক সংখ্যা ৩৯১·১ (২৬শে মে ১৯৫৬) হতে বৃদ্ধি পেয়ে গত ১৫ই জুন তারিখে ৪৩৭·৬ তে এসে দাঁড়িয়েছে। এই একটানা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি জনসাধারণের জীবন যাত্রার মানকে কতখানি ব্যাহত করেছে তারও একটি চিত্র নিয়ে দেওয়া হ'ল।

ভিত্তি বৎসর : ১৯৪৯—১০০

	সময়	খাদ্যশস্য	সাধারণ
১৯৫৫ সাল	জুন	৮৯	৯৩
,,	আগষ্ট	৯৫	৯৭
,,	নভেম্বর	৯৫	৯৮
,,	ডিসেম্বর	৯৬	৯৮
১৯৫৬ সাল	জানুয়ারী	৯৫	৯৭
,,	মার্চ	৯৯	১০০
,,	এপ্রিল	১০৩	১০৩
,,	জুন	১০৬	১০৬
,,	আগষ্ট	১১০	১০৯
,,	নভেম্বর	১০৯	১১০
,,	ডিসেম্বর	১১০	১০৯

এবার সাম্প্রতিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক যদিও ১৯৫৫ সালের জুলাই মাস হতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে সুরু করেছে, তথাপি ১৯৫৭ সালের প্রথম থেকেই খুব দ্রুত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়ে জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যাবার উপক্রম করেছে। এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নানা কারণে ঘটেছে। তারমধ্যে নিম্নলিখিত কারণগুলিই অধিক মাত্রায় দ্রব্যমূল্যের উপর প্রতিক্রিয়া করেছে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রথম এবং প্রধান কারণ হচ্ছে দেশের অভ্যন্তরীন প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন হ্রাস। ১৯৪৫-৫৫ সাল, ১৯৫৫-৫৬ সালের খাদ্যোৎপাদনের তুলনায় গতবৎসর খাদ্যোৎপাদন বেশ হ্রাস পেয়েছে। এদিকে আভ্যন্তরীন চাহিদাও প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তার মূলে রয়েছে সরকারের "উন্নয়নমূলক ব্যয়" (Development Expenditure). এই উন্নয়নমূলক ব্যয়ের ফলে দেশের নিরন্ন, অর্দ্ধভুক্ত শ্রমিক ও আধা-শ্রমিকদের হাতে "ক্রয় ক্ষমতা" সৃষ্টি হচ্ছে, আর আর সঙ্গে সঙ্গে চাহিদাও বাড়ছে। কিন্তু উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় চাহিদা ও যোগানের অসামঞ্জস্য হেতু স্বাভাবিক ভাবেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। খাদ্যোৎপাদনের হ্রাসের প্রধান কারণ হচ্ছে গত দুবছর যাবৎ দেশের বিভিন্ন অংশ বন্যার তাণ্ডব লীলা। এই বন্যার ফলে উত্তর প্রদেশে, বিহারে উড়িষ্যায় পশ্চিমবঙ্গে "kharip crops" এর বিশেষ করে জোয়ার, বাজরা ও কুট্টা শস্যের ক্ষতি হয়। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবে গম ও চালের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু গম ও চাল গত দুইবৎসর যাবৎ "মৌসুমী বৃষ্টিপাতের খামখেয়ালীর জন্য বিশেষ ভাবে ব্যাহত হয়। ১৯৫৩-৫৪ সালের তুলনায় ২৫ লক্ষ টন শস্য উৎপাদন হ্রাস পায়। পুনরায়, ১৯৪-৫৫ সালে ১৯৫৩-৫৪ সালের তুলনায় ৫০ লক্ষ টন শস্য উৎপাদন ক্রম হয়। শস্যোৎপাদন হ্রাসের জন্য খাদ্যদ্রব্যমূল্যের সূচক সংখ্যা ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসের ২৮৩'৬ হতে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে বৎসরের শেষে ৩৫১৬ দাঁড়ায়। চাউলের সূচক সংখ্যা ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসের ৪১২ হতে বৃদ্ধি পেয়ে সেপ্টেম্বর মাসে ৫০৯ দাঁড়ায়। পরে মূল্য হ্রাস পেয়ে ১৯৫৬ সালের জানুয়ারী মাসে ৪৪৯ হয়েছিল। কিন্তু পুনরায় মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫৬ সালের শেষদিকে সূচক সংখ্যা ৫০৪ হয়। গমের সূচক সংখ্যাও ১৯৫৫ সালের মে মাসে ৩৫২ হতে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে সূচক সংখ্যা ৫৪৫ হয়।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ঘাটতি ব্যয়-নীতি অবলম্বন হেতু মুদ্রাস্ফীতি। ঘাটতি-ব্যয় নীতি অবলম্বন করে ১৯৫৫ সালে ১৯৫৩ এবং ১৯৫৪ সালের তুলনায় দ্বিগুণ পরিমাণ নোট বাজারে ছাড়া হয়েছে। রিজার্ভব্যাঙ্কে ইস্যু ডিপার্টমেন্টে Currency expansion এবং Rupee securities এবং বৃদ্ধির পরিমাণ দেখলেই উপরোক্ত ব্যাপারটি বোঝা যাবে। পূর্বেই বলেছি ১৯৫৪ এবং ১৯৫৬ সালে উৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু এদিকে ১৯৫৫ সালে ঘাটতি-ব্যয়নীতির মাধ্যমে দ্বিগুণ পরিমাণ নোট ছাড়ায় স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই মুদ্রাস্ফীতির দরুণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির তৃতীয় কারণ হচ্ছে ব্যাঙ্ক কর্তৃক অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবসায়ী এবং কৃষকদের শস্যের বিরুদ্ধে দাদন দান। ১৯৫০-৫১ সাল হতে ১৯৫৪-৫৫ সাল পর্য্যন্ত গড়ে ব্যাঙ্কের দাদনের পরিমান ছিল ১.৮ কোটী টাকা। কিন্তু সেই দাদনের পরিমাণ ১৯৫৫-৫৬ সালে অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ১৭২ কোটী টাকায় দাড়ায়। ব্যবসায়ী ও কৃষকেরা সাধারণতঃ মন্দার সময়ে শস্যের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক হতে দাদন গ্রহণ করে। এই দাদন গ্রহনের ফলে তাদের "মন্দার" সময় শস্যাদি বিক্রয় করিতে হয় না। পরে মূল্যবৃদ্ধি পেলে উচ্চমূল্যে বিক্রী করে। কিন্তু এই দাদন না পেলে ব্যবসায়ীদের "মন্দা বাজারেই শস্যাদি বিক্রয় করতে হয়। ফলে ব্যবসায়ীরা ফাটকবাজী খেলবার সুযোগ এবং মাল মজুত রেখে বাজারে "কৃত্রিম অভাব" সৃষ্টির সুযোগ পায় না এবং দ্রব্যমূল্যও বিশেষ হারে বৃদ্ধি পায় না।

দ্রব্যমূল্যের চতুর্থ কারণ হচ্ছে বিদেশ হতে বহু অত্যাবশ্যকীয়, দ্রব্যাদির আমদানী হ্রাস এবং বন্ধ। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলতে হলে বিদেশ হতে আমাদের প্রচুর যন্ত্রপাতি, কলকব্জা আমদানী করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন অজস্র বৈদেশিক মুদ্রা। কিন্তু আজ নানা কারণে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে। তাই পরিকল্পনার কাজ এতে ব্যাহত না হয় এবং বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষেণের জন্য বিদেশে হতে অনেক দ্রব্যাদির আমদানী বন্ধ করে দিয়েছে। এর ফলে ব্যবসায়ীরা তাদের পূর্বের আমদানীকৃত মাল গুলিকে মজুত করে রেখে বাজারে একটা কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করে তুলেছে এবং সুবিধামত চড়াদামে সেই সকল জিনিষ গুলিকে বিক্রী করছে। শিশুদের বিলেতী দুধ, ব্লেড, জমান দুগ্ধ প্রভৃতি জিনিষের বিভিন্ন দোকানে বিভিন্ন রকমের পণ্য দেখলেই উপরোক্ত জিনিষটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

দ্রব্যমূল্যে বৃদ্ধি পাবার পঞ্চম কারণ হচ্ছে বর্তমান বাজেটে বিভিন্ন দ্রব্যের উপর কর স্থাপন। স্বাধীনতার পর যে কয়টি বাজেট হয়েছে তার মধ্যে বর্তমান বৎসরের বাজেটের সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের উপর কর স্থাপন করা হয়েছে। তাই আজ জনসাধারণকে চড়ামূল্যে দিয়াশলাই, সিগারেট, চা, চিনি স্পিরিট প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যদ্রব্যাদি ক্রয় করতে হচ্ছে। সাধারণ ভাবে আর একটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। যে কোন দেশেই পরিকল্পনা কালে অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মানুসারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটবেই। কিন্তু অস্বাভাবিকভাবে যদি দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পায় অন্য কোন কারণে তা ঘটে থাকবে।

এবার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিরোধে সরকারী ব্যবস্থা আলোচনা করব। দেশে যে শুধু খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে তা নয়, দেশের অনেক অংশে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে খাদ্যাভাবও

ঘটেছে। সেই সকল খাদ্যাভাব অঞ্চল সমূহের অবস্থা দেখে এলাকাগুলিকে দুর্ভিক্ষ অঞ্চল বললেও খারাপ হবে না। খাদ্য মন্ত্রী শ্রী এ. পি জৈন আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে খাদ্যের অবস্থা মোটেই আশঙ্কাজনক নয় এবং উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই! কেন্দ্রীয় সরকারের যে মজুত গম ও চাল আছে তাদ্বারাই সকল "ঘাটতি এলাকাগুলির" অভাব পূরণ করা যাবে। কিন্তু খাদ্যমন্ত্রী যতই সান্ত্বনা দিন না কেন, দেশে যে খাদ্যাভাব ঘটেছে এবং মূল্য বৃদ্ধিও ঘটেছে ইহা তিনি অস্বীকার করতে পারবেন না। দেশের যে সকল জায়গায় খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষের মত অবস্থা ঘটেছে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ সেখানে আংশিক রেশনিং এর ব্যবস্থা করেছেন এবং বিভিন্ন সহরে এবং গ্রামে গ্রামে fair price shop খুলেছেন। এই সকল দোকানের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক বাঁধা দরে অল্প আয়সম্পন্ন লোকদের চাল সরবরাহ করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ দেশের উদ্বৃত্ত এলাকা হতে পার্শ্ববর্তী এলাকায় এবং অঞ্চলগুলিতে খাদ্যশস্যাদি প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ কেন্দ্রীয় সরকারের মজুত গম ও চাল প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন রাজ্যসরকারগুলিকে সরবরাহ করা হচ্ছে।

চতুর্থতঃ বিদেশ হতে চাল ও গম আমদানী করে দেশের যোগান বৃদ্ধি করে মূল্যবৃদ্ধিরোধের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। ব্রহ্মদেশ ১৯৫৬ সালের ১লা জুন থেকে আগামী পাঁচ বৎসরে ২০ লক্ষ টন চাল সরবরাহের জন্য এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। "নূতন আন্তর্জাতিক গম চুক্তিতে" তিন বৎসরের জন্য ভারত সভ্য হয়েছে এবং সেই অনুসারে ভারত গম আমদানী করবে। যুক্তরাষ্ট্র ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ১৭৫ কোটি টাকার মূল্যের খাদ্যশস্য সরবরাহ করতে রাজী হয়েছে পঞ্চমতঃ দেশ হতে বিদেশে খাদ্যশস্য রপ্তানির উপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ষষ্ঠতঃ খাদ্যশস্য মূল্য বৃদ্ধি রোধকল্পে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা হচ্ছে ব্যাঙ্ক কর্তৃক ব্যবসায়ীদের খাদ্য শস্যের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার দাদন লক্ষের নির্দেশ।

সপ্তমতঃ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্যসরকারসমূহকে তাহাদের এলাকায় মজুতদারদের গত তিন মাসে খাদ্যশস্যের গড়মূল্যে বিক্রয় করতে বাধ্য করবার ক্ষমতা দান। অষ্টমতঃ বিভিন্ন রাজ্য সরকার কর্তৃক রেলওয়ে ইয়ার্ডে মজুত মাল খালাস করবার নির্দেশ দান। সরকার যে উল্লিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন তাতে খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি কিছুটা কমেছে এবং ক্রমে ক্রমে আরও কিছু কমবে। গত বৎসরের তুলনায় এ বৎসর গম ও ধান যথাক্রমে ৪,৩০,০০০ টন এবং ১·২৯ মিলিয়ন টন বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং আগামী বৎসর খাদ্যাভাবের আশঙ্কা খুবই কম। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির উপর সরকারকে সজাগ এবং সতর্ক দৃষ্টি সর্বদা রাখতে হবে। কারণ খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি পেলেই অপরাপর বিভিন্ন শিল্পজ, আধা শিল্পজ দ্রব্যেরও মূল্যবৃদ্ধি পাবে। উহাতে জীবনযাত্রার ব্যয় ও বাড়বে আর অপরদিকে পরিকল্পনার খরচও বাড়বে। আগামী কয়েক বৎসরের কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর আমাদের পরিকল্পনার সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করছে। তাই আমাদের প্রয়োজন একটা নির্দিষ্ট Price policy এই ব্যবস্থা সরকারকেই করতে হবে। শ্রীঅশোক মেটার সভাপতিত্বে যে খাদ্য কমিটি তৈয়ারী করা হয়েছে তা আমাদের অনেকটা প্রয়োজন সাধন করবে বলে মনে হয়।

রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অ, আ, ক, খ

শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ

অষ্ট পাঠ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভোট গ্রহণ ও নির্ব্বাচন মণ্ডলী

দেশের কর্মচারীদের রাষ্ট্রিক ক্ষমতা নাই—অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতের শাসন ব্যবস্থারও যান্ত্রিক কলেবর অনেক পরিমাণে স্থায়ী কর্মচারী বা অস্থায়ী কর্মচারীদের দ্বারাই গঠিত হয়। এই ভাবে পুলিশ, জেলার বা ম্যাজিষ্ট্রেট কিংবা আয়-কর কিংবা বন্দরের শুল্ক আদায়-কারী কর্মচারীরাই দেশ শাসন করেন এমন ধারণা কাহারো মনে আসিতে পারে ? ইহাদের শাসন-ক্ষমতা আছে সন্দেহ নাই কিন্তু যে ভাবে হাত-পা ঠিক মানুষ নয় তেমনি পুলিশ জেলার কিংবা তাহাদের সর্বোচ্চ বড় কর্মচারীরাও কোন চূড়ান্ত বা রাষ্ট্রিক ক্ষমতার দাবী করতে পারে না। এই রাষ্ট্রিক ক্ষমতা থাকে আইন-সভার এবং আইন-সভা হইতে নির্বাচিত মন্ত্রিমণ্ডলীর। আবার যেহেতু এই আইন-সভা গুলির কায়েম হয় গণ-ভোটের ফলে, কাজেই এ কথা বলা যাইতে পারে যে গণ-ভোটে যে ভোটার তাহার হাতেই আখেরের বিচারে রাষ্ট্রিক ক্ষমতা ন্যস্ত। নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটার তাহার এই রাষ্ট্রিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে ;

আইনসভা গঠনের জন্য নির্বাচনমণ্ডলীপ্রতিষ্ঠা—কেন্দ্রীয় দুইটী আইন সভার অঙ্গকে বলা হয় লোকসভা ও রাষ্ট্র পরিষদ। রাষ্ট্রতন্ত্রের বিধান মতে দেশের প্রতি ৭৫০,০০০ লোকের জন্য একজন করিয়া সদস্য নির্বাচিত হইবে। রাজ্যের বিধান সভা সম্বন্ধে নির্দেশ আছে যে প্রতি ৭৫০০০ লোকের জন্য একজন করিয়া সদস্য নির্বাচিত হইবে। দেশে যদি আনুপাতিক নির্বাচন প্রথা থাকিত তাহা হইলে ৭৫০০০ ভোট যিনি নির্বাচনে লাভ করিবেন তাহাদের প্রত্যেককে রাজ্য সভার সদস্য বলে ঘোষণা করা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতে এই প্রকার আনুপাতিক নির্বাচন-পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় নাই। কাজেই প্রতি রাজ্যকে লোকসভা ও বিধান-সভার সদস্য নির্বাচনের জন্য কতিপয় স্থানীয় মণ্ডলীতে বিভক্ত করা হয়। এই স্থানীয় মণ্ডলীতে বিভক্ত করা হয়। এই স্থানীয় মণ্ডলী হইতে এক একটি সদস্য নির্বাচিত হইবার ব্যবস্থা থাকে তবে অল্প ক্ষেত্রে একজন দ্বিতীয় তপশীলভুক্ত জাতির প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবার ও ব্যবস্থা থাকে। এই প্রকার এক একটী সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যে এক একটী স্থানীয় গণ্ডী নির্দিষ্ট হয় তাহাকে নির্বাচনমণ্ডলী বলা হয়। ভাষান্তরে বলা যায়—

> যে নির্ধারিত সীমানার অন্তর্ভুক্ত প্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসীরা তালিকাভুক্ত হইয়া সকলে কোনও আইন সভার এক একটী সদস্য নির্বাচনের জন্য

নির্ধারিত দিবসে সকলে ভোট প্রদান করিতে পারে সেই এলাকাকে স্থানকে একটী নির্বাচন-মণ্ডলী বলা হয়। স্থানীয় নীতি গ্রহণ না করিয়া অন্য নীতির আশ্রয় করিয়া ও যখন অভিন্ন সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোটার দিগের তালিকা প্রস্তুত করা হয় তাহাকে ও একটী নির্বাচন-মণ্ডলী বলা যাইতে পারে।

বিবিধ আইন সভার সভ্যসংখ্যা—কেন্দ্রীয় লোকসভার সভ্য সংখ্যা ৪৯৭। ইহার মধ্যে কাশ্মীর রাজ্যের ৮টী প্রতিনিধি ব্যতীত সকলেই গণভোটে নির্বাচিত। অবশ্য নির্বাচন মণ্ডলী সংখ্যা সদস্য সংখ্যা হইতে কিছু কম। কেননা কোন কোন মণ্ডলীতে একজন তপশীল জাতির প্রতিনিধি নির্বাচনেরও ব্যবস্থা আছে। এই ৪৯৭ জনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত নির্বাচন-মণ্ডলী হইতে নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা ৩৪। ক শ্রেণীর রাজ্য ৯টী, খ শ্রেণীর ৮টী এবং গ শ্রেণীর রাজ্য ৫টী, মোট ২২টী রাজ্য বিধান সভার মোট সদস্য সংখ্যা ৩২৮৩। এখানেও নির্বাচন মণ্ডলীর সংখ্যা কিছু কম এবং এখানেও সকলেই গণ-ভোট নির্বাচিত হন।

রাষ্ট্র-পরিষদের সভ্যসংখ্যা ও নির্বাচন—কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র পরিষদের মোট সভ্যসংখ্যা বর্তমানে ২১৬। রাষ্ট্র তন্ত্রের বিধান মতে পরিষদের ২৫০ জনের বেশী সভ্য হইতে পারে না। তন্মধ্যে অনুর্দ্ধ ১২ জন সভ্য হইবেন রাষ্ট্রপতি দ্বারা মনোনীত সাহিত্য বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সমাজ-সেবায় পারদর্শী ব্যক্তিগণ যাহাতে পরিষদে স্থান পাইতে পারেন এই জন্যই রাষ্ট্রপতি অনুর্দ্ধ ১২জন সদস্যকে মনোনীত করিতে পারেন। বাকী অনুর্দ্ধ ২৩৮ জনের নির্বাচন হইবে রাজ্যের বিধান সভাগুলি কর্তৃক কিন্তু গ শ্রেণীর রাজ্যের ক্ষেত্রে সংসদের নির্দেশ অনুসারে তাহাদের প্রতিনিধি সমূহের পদ পূর্ণ হইবে? পশ্চিমবঙ্গ হইতে অনুর্দ্ধ ১৪ জন সদস্য নির্বাচিত হইবার ব্যবস্থা আছে। ক শ্রেণীর রাজ্য মোট ১৪৫ জন প্রতিনিধি, খ শ্রেণীর রাজ্য হইতে ৫৩ জন প্রতিনিধি এবং গ শ্রেণীর রাজ্য হইতে মোট ৭ জন প্রতিনিধি, সাকুল্যে রাজ্যে সমূহের এই ২০৫ জন প্রতিনিধি নির্বাচনেরই ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত রাষ্ট্রতন্ত্রে রহিয়াছে।

রাজ্য-ব্যবস্থাপক পরিষদের সভ্য সংখ্যা ও নির্বাচন—রাজ্যের ব্যবস্থাপক পরিষদে—যে সাতটি রাজ্যের জন্য তাহাদের ব্যবস্থা আছে—সভ্যসংখ্যা অন্যূন ৪০ হইবে এবং উর্ধে ঐ রাজ্যের বিধান সভার এক চতুর্থাংশের বেশী হইবে না। পশ্চিমবঙ্গের ব্যবস্থাপক পরিষদের বর্তমান সংখ্যা ৫১ জন। রাষ্ট্রতন্ত্রের বিধান এই যে কোন ব্যবস্থাপক পরিষদের এক তৃতীয়াংশ সভ্য ঐ রাজ্যের বিধান সভার সভ্যগণ দ্বারা নির্বাচিত হইবে, অপর এক তৃতীয়াংশ রাজ্যের সমুদায় মিউনিসিপালিটী ও জেলা বোর্ডগুলির সম্মিলিত মণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হইবে, এক দ্বাদশাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ কর্তৃক, অপর এক দ্বাদশাংশ ঐ রাজ্যের অন্তর্গত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির রেজিষ্ট্রীকৃত গ্র্যাজুয়েটগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবে এবং বাকী এক দ্বাদশাংশ রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত

হইবে? এই মনোনয়ন দ্বারা রাজ্য-পাল যাহাতে পরিষদে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সমবায় আন্দোলন বা সমাজ সেবায় পারদর্শী ব্যক্তিগণ ব্যবস্থাপক পরিষদে স্থান পাইতে পারেন, সেইজন্যই স্বীয় মনোনয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন? বলা বাহুল্য কি রাষ্ট্রপতির রাষ্ট্র-পরিষদে মনোনয়ন রাজ্যপালের কিংবা ব্যাবস্থাপক-পরিষদে মনোনয়ন—সকলই স্ব স্ব মন্ত্রী মণ্ডলীর উপদেশ অনুসারে কার্য করিয়া থাকেন?

নির্বাচন ও রাজনৈতিক দল—এখানে নির্বাচনের প্রসঙ্গে একটী কথা জানিয়া রাখা ভাল। অত্যন্ত প্রথিত-যশা ব্যক্তি না হইলে লক্ষ লক্ষ এমন কি হাজার হাজার ভোটারের পক্ষে একটী প্রার্থী সম্বন্ধে সম্যকভাবে অবহিত হইয়া তাহাকে স্বপক্ষে কিংবা বিপক্ষে ভোট প্রদান করা দুরূহ ব্যাপার। কাজেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নয়—যদিও ব্যক্তিই ভোট-প্রার্থী হইয়া থাকেন—প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে—যাহারা প্রার্থী মনোনয়ন করিয়া তাহাকে নির্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ করান কিংবা অবতীর্ণ কোন প্রার্থীবিশেষকে সমর্থন করিয়া দলের পক্ষ হইতে তাহারই জন্য ভোট-দাতাদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। ফলে একটী নির্বাচন-মণ্ডলীতে একাধিক একটি দলের প্রতিনিধি থাকিতে পারে না। প্রার্থী সংখ্যা ইহাতে কমিয়া যায় এবং ভোটদাতা দিগের পক্ষে ও ভোট-প্রদান অনেকটা আয়ত্তের মধ্যে চলিয়া আসে। ভারতের মত গনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মর্মস্থল যেমন গণ-নির্বাচন এই দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতাকেই তেমনি গণ-নির্বাচনের মর্মকথা বলা যাইতে পারে? দলের উৎপত্তি হয় এক একটি পৃথক শাসন-কার্যের সূচীকে আশ্রয় করিয়া। নাগরিক মাত্রকেই এই পরস্পর-বিরোধী শাসন-সূচীর ছকের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক—কেন না তাহা না হইলে দেশে রাজ-নৈতিক দল গঠন হইতে পারে না এবং রাজনৈতিক দল গঠন না হইলে রাষ্ট্রতন্ত্রের কাটামোর মধ্যে শাসন-ব্যবস্থা পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে পারে না।

সপ্তম পাঠ

জেলা শাসন ও স্বায়ত্ব শাসন

মন্ত্রীমণ্ডলীর খাস কর্মচারী—ভারতের সকল নাগরিকই কোন না কোন রাজ্যের অধিবাসী। কিন্তু এ কথা মনে করা ঠিক হইবে না যে রাজ্য-শাসনের উপরিতন শাসন ব্যবস্থা যাহা মন্ত্রিমণ্ডলী ও আইনসভা লইয়া গঠিত (বিচার বিভাগের কথা এই প্রসঙ্গে ছাড়িয়াই আলোচনা হইতেছে) তাহার মধ্যেই রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা আবদ্ধ। মন্ত্রিমণ্ডলী ও আইন সভার উভয়েরই, বিশেষতঃ প্রথমোক্তের অধীনে অনেক খাস কর্মচারী থাকেন এই সব খাস কর্মচারীদের বলা হয় রাজ্যসরকারের সেক্রেটারী। রাজ্যের শাসন কার্যকে কয়েকটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হয় যথা :—

রাজ্যের বিবিধ ব্যাপারে বিভাগীয় কর্তা—কর্মচারী বিভাগ, পুলিশ বিভাগ,

রাজস্ব বিভাগ, শিল্প বিভাগ, কৃষি বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিভাগ ইত্যাদি। এই প্রত্যেকটি বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক একজন সেক্রেটারী থাকেন, অবশ্য একই ব্যক্তি একাধিক বিভাগের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত থাকিতে পারেন। কয়েকটি করিয়া বিভাগের শাসনভার এক একটি মন্ত্রীর হতে ন্যস্ত হয়। তাহার মানে এই নয় যে ঐ বিভাগের যাবতীয় শাসন ব্যাপার সেই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর একার সিদ্ধান্তেই চালিত হয়। প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না? সিদ্ধান্তের গুরুত্ব থাকিলেই তাহাকে মন্ত্রীমণ্ডলীর বৈঠকে পেশ করিয়া মণ্ডলীর মতামত গ্রহণ করিতে হয়। সে যাই হউক, এই বিভাগীয় সেক্রেটারীদের নিম্নে অর্থাৎ মন্ত্রীমণ্ডলীর খাস দপ্তরের নিম্নে প্রত্যেক শাসন বিভাগের একজন স্বতন্ত্র বিভাগীয় কর্তা থাকেন, যেমন পুলিশ বিভাগের কর্তা ইনস্পেক্টর জেনারেল অব্ পুলিশ, জেল বিভাগের কর্তা ইনস্পেক্টর জেনারেল অব্ জেলস্, চিকিৎসা বিভাগের কর্তা ডিরেক্টর অব্ হেলথ কিংবা শিক্ষা বিভাগের কর্তা ডিরেক্টার অব্ পাব্লিক্ ইনষ্ট্রাকশন ইত্যাদি। এই সব বিভাগীয় কর্তারা খাস দপ্তরের অংশ নহেন? খাস দপ্তরের সেক্রেটারী মারফত মন্ত্রীমণ্ডলীর বা রাজ্য সরকারের যে হুকুম তাহাদের কাছে প্রেরিত হয় তাহা কার্যে পরিণত করাই বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। এই বিভাগীয় কর্তারা সরকারের শাসন কার্যের এক একটি বাহু বিশেষ। এই খাস-দপ্তর ও বিভাগীয় দপ্তর দুইই রাজ্যের প্রধান সহরেই অবস্থিত থাকে। কিন্তু এইখানেও রাজ্য-শাসন-ব্যবস্থায় দাঁড়ি টানা যায় না।

জেলা—শাসন কার্যের জন্য প্রতি রাজ্যই কতকগুলি জেলায় বিভক্ত থাকে। পশ্চিম-বঙ্গের অন্তর্গত ঐরূপ ২৬টী রাজ্য আছে, কম-বেশী হাজার বর্গ মাইল লইয়া এক একটী জেলা গঠিত হইয়াছে। উপরে যে শাসনের বিভিন্ন বিভাগের কথা বলা হইয়াছে প্রত্যেক জেলাতেই সেই বিভাগীয় নিম্নতন কর্মচারীরা নিযুক্ত থাকেন—যেমন চিকিৎসা বিভাগের জন্য সিবিল সার্জন, শিক্ষা বিভাগের জন্য ডিষ্ট্রিক্ট ইনস্পেক্টর অব স্কুলস, জেলের জন্য ডিষ্ট্রিক্ট জেলার, পুলিশের জন্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ পুলিস্ এবং ভূমি রাজস্ব বিভাগের জন্য ডিষ্ট্রিক্ট কালেক্টার? এই জেলা কর্মচারীদের ডিষ্ট্রিক্ট কালেক্টারই সর্বপ্রধান। তিনি শুধু জেলার প্রধান ভূমি রাজস্বের আদায় কর্তা নহেন, তিনি জেলার সর্বপ্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট। কাজেই জেলা কালেক্টারকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটও বলা হয়।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট—পুলিশ সুপারেন্টেডেণ্ট বা অন্যান্য বিভাগীয় জেলা প্রতিনিধিরা সরাসরিভাবে তাহার অধীনস্থ না হইলেও সকলকেই তাহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া চলিতে হয়। ইহা শুধু প্রথা নহে, অনেক সময় শাসন-ব্যবস্থা ও আইনের বিধানও তাহাই। জেলাকে যদি একটি ক্ষুদ্র রাজ্য বলে ধরা যায়, তবে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে সে ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা বলিলে খুব বেশী অত্যুক্তি হয় না? এক একটী জেলার অন্তর্ভুক্ত দুই-তিনটী করিয়া মহকুমা থাকে। এই মহকুমার জেলা কর্মচারীদের অধীনস্থ কর্মচারী

থাকেন এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনস্থ মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট থাকেন—তাহাকে সাব্ ডিভিশনের অফিসার বলা হয়।

মহকুমা—মহকুমায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের প্রাথমিক ব্যবস্থা থাকে, জেলখানা, পুলিশ ষ্টেশন ইত্যাদিও থাকে। এক একটী মহকুমার অন্তর্গত কয়েকটী পুলিশের থানা থাকে এবং সমগ্র ভারতের প্রতিটি গ্রামই কোন না কোন থানার এলাকার মধ্যে অবস্থিত বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। মহকুমার নিম্নে আনাই একমাত্র রাজ্য শাসনের ব্যবস্থা? বলা বাহুল্য রাজ্য শাসনের বহু অংশের মধ্যে পুলিশ বিভাগ একটী অংশ মাত্র—ইহার গুরুত্ব যতই থাকুক্ না কেন।

রাজ্য শাসনের বিভাগীয় বা জেলার ধাপে যে শাসন-ব্যবস্থা তাহা সম্পূর্ণই কর্মচারীদের হাতে। অবশ্য এই সব কর্মচারীদের কোন রাষ্ট্রিক ক্ষমতা নাই—তাহা সম্পূর্ণই ন্যস্ত আইন-সভা ও মন্ত্রীমণ্ডলীর উপর। কাজেই মন্ত্রীমণ্ডলী ও আইনসভা ব্যতিরেকে অন্য কোন শাসনাংশে জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে কাহারও সংস্রব নাই। এই সংস্রব আছে অন্য এক প্রকার স্থানীয় শাসনে যাহাকে বলা হয় স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাসন। ইংরাজ আমলে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম এই স্বায়ত্ব-শাসন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় কিন্তু ইতিমধ্যে তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে।

> **স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাসন কাহাকে বলে**—যখন কোন জেলা, সহর ও গ্রামের শাসন ব্যাপারের কোন কোন অংশ রাজ্য-সরকারের শাসন-ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হস্তে অর্পণ করা হয় তাহাকে স্বায়ত্ব-শাসন বলা হয়?

গ্রাম্য ও নাগরিক স্বায়ত্ব-শাসন—পশ্চিম বাংলায় স্থানীয় স্বায়ত্ব দুই প্রকারের—এক গ্রাম্য, দ্বিতীয় নাগরিক স্বায়ত্ব-শাসন। গ্রাম্য শাসনের মধ্যে দুইটী শ্যথা আছে এক জেলা বোর্ড, দ্বিতীয় ইউনিয়ন বোর্ড। এই দুইটী পরস্পর বিরোধী নয়। একই গ্রাম একটী ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত হইতে পারে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জেলা বোর্ডের এলাকারও অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। নাগরিক স্বায়ত্ব-শাসন সর্বত্রই একই ধারার কিন্তু তাহাদের মর্যাদার বিভিন্নতা আছে। এই বিভিন্ন মর্যাদা-ধারা তিন রকমের প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে যথা :—(১) কর্পোরেশন, (২) মিউনিসিপ্যালিটী ও (৩) ইউনিয়ন।

গ্রাম্য স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মতালিকা ও আয়ের সংস্থা—প্রাথমিক শিক্ষা, গ্রাম্য ঔষধালয় ও গ্রামঞ্চলে রাস্তা নির্মাণ এই তিনটীই হইল জেলা বোর্ডের প্রধান কাজ। ভূমি রাজস্বের সঙ্গে সঙ্গে যে সব কর আদায় করা হয় তাহাই জেলা বোর্ডের প্রধান আয়। বোর্ডে ৯ জন হইতে ৩০ জন সভ্য থাকেন এবং সব করদাতাদের ভোটে বোর্ডের সভ্যেরা চার চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন? ইউনিয়ন বোর্ডের

আয় আসে প্রধানতঃ "ইউনিয়ন রেইট" হইতে এবং যাহারা অন্যূন ছ'আনা বাৎসরিক "ইউনিয়ন রেটের" কর দেন কিংবা বাৎসরিক আট আনা পথ-কর দেন, তাহারাই ভোটে চার চার বৎসরের ইউনিয়নের বোর্ডের সভ্যদের নির্বাচিত করেন। কতিপয় গ্রাম লইয়া একটী ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়। রাস্তাঘাট মেরামত করা, জলাশয়-নর্দামা পরিষ্কার রাখা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেওয়ানী মামলার বিচার করাই ইউনিয়ন বোর্ডের কর্তব্য।

নাগরিক স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মতালিকা ও আয় সংস্থান—পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে এক কলিকাতা সহরেই কর্পোরেশন আছে। প্রাথমিক শিক্ষা, শোধিত ও অশোধিত জল সরবারাহ, রাস্তাঘাট মেরামত করা, মল নিষ্কাষণের ব্যবস্থা করা, রাত্রিযোগে রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করা এবং সহরের স্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নতিকল্পে বিবিধ কার্যসূচী অবলম্বন করাই এই কর্পোরেশনের কর্তব্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। সহরে যত ঘর-বাড়ী আছে প্রধানতঃ তাহার মালিক ও বাসিন্দার উপর কর স্থাপন করিয়াই কলিকাতা কর্পোরেশন বৎসরে পাঁচ কোটীর টাকার মত আয় আমদানী করেন। করদাতাদের ৭৫ জন প্রতিনিধি ও তাঁহাদের নির্বাচিত ৫ জন অল্ডারমেন ও একজন পৌরপাল বা মেয়র লইয়া এই পৌর প্রতিষ্ঠানটী গঠিত। পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য সহরে কর্পোরেশনের পরিবর্তে মিউসিপ্যালিটী রহিয়াছে। তাহাদের আয় অনেক কম এবং তাহা গৃহ-কর, জল-কর ও মল-নিষ্কাষণ-কর হইতেই প্রধানতঃ লব্ধ। ছোট ছোট শিল্প কেন্দ্রে এবং কল-কারখানার সন্নিহিত স্থানে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হয়। তাহাদের আয় মিউনিসিপালিটী অপেক্ষাও কম এবং তাহাদের কার্যসূচী আরও সঙ্কীর্ণ। এই দুই রকমের প্রতিষ্ঠানই সাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়। তবে তাহাদের শাসনকার্যে সরকারী অনুমোদন ও হস্তক্ষেপের মাত্রা বৈষম্যে তাহাদের মর্যাদার মধ্যে অনেক প্রভেদ রহিয়াছে।

ভারতে সিমেণ্ট শিল্পের অগ্রগতি

শ্রীপ্রফুল্ল বসু

বর্তমান যুগে গৃহ উপকরণে ইস্পাতের স্থান সর্বাগ্রে, তার পরই সিমেণ্টের স্থান। কিন্তু ভারতে এখনও প্রয়োজন অনুযায়ী সিমেণ্টের চাহিদা কম। বলা বাহুল্য সরকারী সাহায্যে এবং বিদেশী মূলধনের সহায়তায় আমাদের সিমেণ্টের উৎপাদন ক্রমশঃই বর্ধিত হইতেছে। এবং অদূর ভবিষ্যতে এমনকি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় হয়ত আমাদের চাহিদা মিটিবে। উজ্জ্বল ভবিষ্যত তখন উজ্জ্বলতর হবে যখন অসমাপ্ত কলকারখানা, সাধারণ গৃহ সম্পূর্ণ হবে।

আমাদের দেশে সিমেণ্ট শিল্প প্রসারের এখনও প্রচুর সম্ভাবনা আছে। ভারতে প্রথম সিমেণ্টের কারখানা ১৯০৪ সালে মাদ্রাজে স্থাপিত হয়। পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্টের কারখানা অল্প পরিসরে

আরম্ভ হয় কিন্তু বর্তমান সিমেন্ট শিল্পের গোড়াপত্তন আরম্ভ হয় ১৯১২ সালে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে সিমেন্ট আমদানী বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। ফলে এখানকার শিশু শিল্প পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত হইবার সুযোগ পায়। তখন ভারতে মাত্র তিনটি কারখানা, পৌর-বন্দর, সৌরাষ্ট্র, কাটনি মধ্যপ্রদেশ এবং লাখেরি রাজস্থান এবং উৎপাদন প্রায় ৮৫ হাজার টন। তখন অংশ প্রায় সমস্ত প্রয়োজনই বিদেশ থেকে আমদানী করা হ'ত। ১৯১৯ সাল থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে আরও সাতটি কারখানা এখানে কাজ আরম্ভ করে। তারপর ভারতের সিমেন্ট শিল্পের দুর্দিন দেখা দেয়। সেই সঙ্কট কালে ভারতীয় মালিকগণ প্রায় আড়াই কোটি টাকা নষ্ট করিতে বাধ্য হয়। ১৯২৫ সালে ভারতীয় সিমেন্ট উৎপাদক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আর কয়েক বছর পরে সিমেন্ট মার্কেটিং কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়া সদস্যভুক্ত কারখানা গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়। সেই সময় ভারতীয় বনিকগণ সিমেন্ট শিল্প প্রসারের জন্য মূলধন নিয়োগ করিতে চাহিত না, কিন্তু সিমেন্ট মার্কেটিং কোম্পানীর প্রচারের ফলে ভারতের সিমেন্ট শিল্প সে যাত্রা কোন রকমে সামলে নেয়। ১৯৩৬ সাল ভারতীয় সিমেন্ট শিল্পের নতুন অধ্যায় সংযোজনা করে। তখনই ছোট ছোট কারখানাগুলি একত্রিত হইয়া এ. সি. সি. (Assoiated Cement Company Ltd) প্রতিষ্ঠা করে। এই মিলনের ফলে আমাদের উৎপাদন ও প্রযুক্ত উন্নত হয় এবং ক্রমশঃ বৎসরের পর বৎসর উৎপাদন বাড়িয়াই চলিতেছে। নতুন নতুন কারখানাও ইতিমধ্যে ভারতের নানা স্থানে স্থাপিত হইতেছে। বর্তমানে ভারতে ২৮টি কারখানা আছে এবং এই কারখানাগুলি বৎসরে সর্বাধিক ৬ লক্ষ মিলিয়ন টনের মত উৎপাদন করিতে পারে। উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে উৎকৃষ্ট সিমেন্ট যাহাতে উৎপাদন হয় সেইদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট এবং পৃথিবীর যে কোন সিমেন্টের সঙ্গে এর তুলনা করা চলে। ভারত সরকারের নিজস্ব কারখানা সিক্রী হইতে শীঘ্রই প্রচুর পরিমান সিমেন্ট উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল পাওয়া যাইবে এবং শুধু কাঁচামাল সরবরাহই নয় সিক্রীর সিমেন্ট কারখানাটি পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম কারখানা এবং এই কারখানায় প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম কারবোনেট উৎপাদন হয়। ভারতে গত কয়েক বৎসরের সিমেন্ট উপাদনের হিসাব নিচে দেওয়া হইল।

বৎসর	উৎপাদন [মিলিয়ন টনের হিসাব]	বৎসর	উৎপাদন [মিলিয়ন টনের হিসাব]
১৯৫১	৩·১৯	১৯৫৪	৪·৩৯
১৯৫২	৩·৫৩	১৯৫৫	৪·৪১
১৯৫৩	৩·৭৮	১৯৫৬	৪·৯২

ভারতে জনপ্রতি সিমেন্ট ব্যবহারের পরিমাণ অতি অল্প। যেখানে সুইডেন ব্যবহার করে ৭৪০ পাউণ্ড, বেলজিয়াম ৭১৩, আমেরিকা ৫১৬, ডেনমার্ক ৪১৬, যুক্তরাজ্য ৪১১, জাপান ৯০ এবং সেখানে ভারত মাত্র ২৭ পাউণ্ড।

ভারতের শিল্পনীতি এবং প্লানিং কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের ১৫ লক্ষ মিলিয়ন টনের মত সিমন্ট উৎপাদন করা এবং এই উৎপাদনে পৌঁছিবার জন্য মূলধন নিয়োজিত করা প্রয়োজন প্রায় ১২৫ হইতে ১৫০ কোটি টাকা। খুব দ্রুত গতিতে যাহাতে না উৎপাদন হয় সেদিকেই দৃষ্টি থাকা দরকার। নচেৎ হয়তো মূলধন অপচয় হইবার সম্ভাবনা দেখা দিবে।

সিমেণ্ট শিল্পের জন্ত কাঁচামাল প্রয়োজন হয় প্রধানতঃ লাইমষ্টোন, জিপসাম এবং কয়লা। মোটামুটি ভাবে এক টন সিমেণ্টের জন্ত ১·৬ টন লাইমষ্টোন, শতকরা ৪ ভাগ জিপসাম এবং শতকরা ৩০ ভাগ কয়লার প্রয়োজন। পাকিস্থানে লাইমষ্টোন এবং জিপসামের প্রাচুর্য থাকায় স্বাধীনতার পর ভারত প্রধানতঃ পাকিস্থান হইতে লাইমষ্টোন আমদানী করিয়া তৎপরিবর্তে পাকিস্থানের পাঁচটি কারখানার জন্ত প্রয়োজনীয় কয়লার অধিকাংশই ভারত চালান দিত। বর্তমানে সৌরাষ্ট্র, মধ্য-প্রদেশ, রাজস্থান এবং দাক্ষিণাত্যে প্রচুর পরিমানে লাইমষ্টোন পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু লাইম-ষ্টোন আমাদের শিল্পগুলিতে ব্যবহার খুব সহজ সাধ্য নয় অপর পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান প্রভৃতি দেশগুলি অতি সহজেই এই কাঁচামাল সিমেণ্ট শিল্পে ব্যবহার করে। ভারতে কয়লা পর্যাপ্ত। কিন্তু কয়লাখনি হইতে সিমেণ্ট কারখানায় কয়লা আনয়ন করিতে ব্যয় বেশী হয় কারণ কয়লা খনি গুলি দূরে দূরে অবস্থিত। কয়লা পরিবহন ব্যবস্থার উপর সরকারের দৃষ্টি নিবদ্ধ এবং ওয়াগন নিয়ন্ত্রণ করিয়া সরকার এ শিল্পকে যথাসাধ্য উন্নত করিবার জন্ত আগ্রহশীল। অনেক অভিজ্ঞ লোকের মতে কাদা মাটি পোড়াইয়া অন্যান্ত রাসায়নিক পদার্থ সহযোগেও নাকি সিমেণ্ট (blended cement) উৎপন্ন করা যায়। কিন্তু নানরকম বাঁধ তৈয়ারিতে এগুলি ব্যবহার করা সম্ভব হইবে না; তবে সাধারণ কাজে হয়ত এগুলি লাগান যাইতে পারে। এ নিয়ে গবেষণা প্রয়োজন এবং ঠিক কি কাজে এ সিমেণ্ট চলিবে তাহা না জানিলে জনসাধারণ অধিক মূল্য দিয়া ভাল সিমেণ্ট কিনতে বাধ্য হইবে।

সিমেণ্ট শিল্পের জন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা আমরা বিদেশ হইতে কিনিয়া থাকি। বর্তমানে এ. সি. সি Rotary kilns, clinker coolers, hammar crushers, grinding mills, elevetors, conveyors, dust collectors প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ভারতেই উৎপন্ন করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতেও আমাদের চাহিদা মিটে না। বিদেশী বণিকগণের সহায়তায় এ শিল্প আরম্ভ হইয়াছিল কিন্তু বর্তমানে খুব সামান্তই বিদেশী মূলধন সিমেণ্ট শিল্পে রহিয়াছে। জাপান, পাকিস্থান, সুইডেন, যুক্তরাজ্য হইতেই আমরা প্রধানত সিমেণ্ট আমদানী করি এবং আমাদের যে কিরূপ অর্থ ব্যয় হয় তাহা নিম্নের পরিসংখ্যান হইতে উপলব্ধি করা যাইবে।

	লক্ষ টাকার হিসাব
১৯৪৮-৪৯ সাল	১৫৯·৬
১৯৪৯-৫০ "	২৭৫·৭
১৯৫০-৫১ "	২১·৫

ভারতের শিল্পনীতি পরিবর্তিত হওয়ার দরুণ বিদেশ হইতে সিমেণ্ট আমদানী করিবার পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে। বলা বাহুল্য, ভারত ও আশেপাশের দেশগুলিতে সামান্ত সিমেণ্ট রপ্তানি করিয়া থাকে। ভারতে সিমেণ্ট শিল্পে প্রায় কুড়ি পঁচিশ হাজার শ্রমিক নিয়োজিত আছে। সরকার শ্রমিকদের জন্ত প্রচুর সুবিধা দিতেছেন—স্কুল, হাসপাতাল, ক্লাব, লাইব্রেরী, ক্যানটিন, বাসস্থান নির্মাণ করিয়া শ্রমিকদের মনোরঞ্জন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রমিকদের সুব্যবস্থা আমেরিকা ও ইউরোপের সঙ্গে তুলনীয় প্রায় ১৫ হইতে ২০ ভাগ কম। যদিও এখানে প্রচুর শ্রমিক পাইবার সম্ভাবনা আছে। ভারতে সিমেণ্ট শিল্পে বিশেষজ্ঞের অভাব উপলব্ধি করা যাইতেছে এবং এই সমস্যা সমাধান সম্ভব যদি সরকার এখানকার শিল্প অভিজ্ঞ লোকদের বিদেশে বিশেষ শিক্ষা লাভের জন্ত প্রেরণ করেন।

ট্যারিফ কমিশনের মতানুসারে এক টন সিমেন্টের মূল্য সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ভাবে নিরূপিত হয়।

(unpacked bulk)	৫৪·৫০ নয়া পয়সা	
Packing charges	১৩·৪৪ " "	
Marketing charges	১·৫০ " "	৬৯·৪৪
Average fright (estimated)		১৪·০০
Excise Duty	২০·০০	
Profit to the State Trading Corpn. on indigenous cement	১৪·০৬	৩৪·০৬
		১১৭·৫০

ইহা ছাড়াও প্রতি ক্রেতাকে সেল ট্যাক্স, পরিবহন ব্যয় ইত্যাদি বাবদ প্রায় ১৫ হইতে ২০ টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়। ভারতের সিমেন্ট শিল্প যে সুপ্রতিষ্ঠিত এ বিষয়ে মতান্তর নাই। যাহারা এ শিল্পে অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়াছিল তাহারাও প্রচুর পরিমাণে লভ্যাংশ পাইতেছে। ভারতের বহুমুখী পরিকল্পনা, বৃহত্তর শিল্প সংস্থা স্থাপন, পরিবহন উন্নতি সাধন, বৃহত্তর নগর পরিকল্পনার কাজ যতই অগ্রসর হইবে ততই সিমেন্টের চাহিদা বহুল পরিমাণে বাড়িবে। হয়ত জনসাধারণকে তখন সিমেন্ট লইবার জন্য আরও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতে হইবে।

———

দেশ-বিদেশের 'বৃক্ষ উৎসব'

তরুলতা মানব সমাজের তথা মানব সভ্যতার পক্ষে অপরিহার্য। তাই প্রাচীনকাল হইতেই প্রায় সকল দেশের লোক বৃক্ষ-বন্দনা বা বৃক্ষ-উৎসব পালন করিয়া আসিতেছে। বিভিন্ন দেশে ইহা বিভিন্ন নামে 'পরিচিত। কোথাও ইহার নাম 'আবহর দিবস' কোথাও বা বলা হয় 'বৃক্ষ উৎসব'। জাপানীরা ইহাকে বলে "সবুজ সপ্তাহ"। ইস্রায়েলে ইহা 'বৃক্ষের নববর্ষ দিবস', যুগোস্লাভিয়ায় 'বনায়ন সপ্তাহ', কোরিয়ায় "বৃক্ষ-প্রেম সপ্তাহ" এবং আইস্ল্যাণ্ডে 'ছাত্রদের বনায়ন দিবস' হিসাবে প্রতিপালিত হয়। প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী ভারতে প্রতি বৎসর বন-মহৎসব' পালন করা হইয়া থাকে।

বৃক্ষলতা আমাদের নগর ও গ্রাম ও ঘরবাড়ী সুশোভিত করিয়া রাখে। বৃক্ষই আমাদের গৃহপালিত গোরু বাছুর এবং বণ্যপশুদের আশ্রয়স্থল। গাছের শান্ত সুশীতল ছায়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ক্লান্তি ও শ্রান্তি দূর করে। কর্মক্লান্ত দিনের শেষে তাই আমরা ছুটিয়া যাই পার্কে, আর অবসর বিনোদনের জন্য যাই পল্লীর প্রাকৃতিক পরিবেশে। আবার এই গাছই আসবাবের প্রয়োজনীয় কাঠ, জ্বালানি কাঠ এবং ফুলফল দিয়া থাকে। বৃক্ষের প্রাচুর্য বা শূন্যতা দেশের শিল্প উন্নয়ণ, সামাজিক প্রগতি ও জাতীয় শক্তির উপরে সরাসরি প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ষষ্ঠ সম্মেলনে বৃক্ষের সৌন্দর্য গত স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক মূল্য সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয় এবং প্রতিটি সদস্য দেশের স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী প্রতি বৎসর বৃক্ষ উৎসব পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নে ফলের বিশেষতঃ আমগাছ শস্যক্ষেত্রের চারিধারে রোপন করা হইয়া থাকে। এই সব গাছে মৌমাছি ও পাখীরা

আসিয়া বাসা বাধে। এই গাছের ফুলে মৌমাছিরা আকৃষ্ট হইয়া আসে। সেই মৌমাছিগুলিই আবার অন্য ফুলের প্রতি ধাবিত হয়। ফলে পরাগযোগ ঘটে। ইহাতে ফলের উৎকর্ষ সাধিত হয়। উৎপাদনের পরিমাণও বাড়ে। নিউজীল্যাণ্ডে দেশীয় বৃক্ষ রোপন ও সংরক্ষণের উপর জোর দেওয়া হইয়া থাকে। এই বৃক্ষগুলি শস্যক্ষেত্রের চারিধারে ও রাজপথের দুই ধারে রোপন করা হয়। যে সব গাছে মৌমাছি আসিয়া বাসা বাঁধে, সেইসব গাছ এবং ফলের]গাছ রোপনেও উৎসাহ দেওয়া হইয়া থাকে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আব্বর দিবসের কর্মসূচীতে দুইটি নূতন বিষয় প্রবর্তন করা হইয়াছে এই বিদ্যালয়ের উৎসব হিসাবে পালন করা হয়। আইস্‌ল্যাণ্ডে 'ছাত্রদের বনায়ন' দিবস আইন চালু আছে। এই আইন অনুযায়ী প্রত্যেক ছাত্রকে বৎসরে একটি দিন বৃক্ষ রোপন করিতে হয়। বৃক্ষ রোপনের উপযুক্ত সময়ে এই দিনটি নির্ধারণ করা হয়। ইংলণ্ডে বন কমিশন বৃক্ষ দিবসের অনুষ্ঠানে গাছের চারা বিলি করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া, কমিশন স্কুলগুলির মধ্যে বনাঞ্চলের জমি বণ্টন করিয়া দেয় এই জমির উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের পূর্ণ দায়িত্ব বিদ্যালয়কে লইতে হয়। ইতালিতে বৃক্ষের প্রতি যত্নশীল ছাত্রদের পুরস্কারদানের ব্যবস্থা আছে। পূর্ব বৎসরে অন্যান্য অঞ্চলে বৃক্ষ রোপনের কিরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে তাহা প্রদর্শনের জন্য ছাত্রদের ভ্রমণের বন্দোবস্ত করা হয়। ভারতে বনমহোৎসবকে একদিন বা এক সপ্তাহের আনুষ্ঠানিক কাজ হিসাবে গ্রহণ করা হয় নাই। ইহা বর্তমান উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য এবং ভবিষ্যতের প্রতি অবশ্যের প্রতীক স্বরূপ। শুধুমাত্র বৃক্ষ রোপন অপেক্ষা বৃক্ষ-সংরক্ষণের প্রতি বর্তমানে অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন যে একটি বৃক্ষ কাটিয়া ফেলা খুবই সহজ, কিন্তু একটি বৃক্ষ জন্মাইতে এক যুগ বা আরও বেশী সময় লাগিয়া যায়। সম্ভাব্য বিকল্প না থাকিলে বা অপরিহার্য হইয়া না পড়িলে কোন বৃক্ষ না কাটিবার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়াছেন। সমবায় মন্ত্রী ডাঃ পাঞ্জাবরাও দেশমুখ মুখ্যমন্ত্রীদের নিকট এক পত্রে বলিয়াছেন যে, মানুষ যে সব শুভ কাজ করিতে পারে বৃক্ষ রোপন তাহার অন্যতম। কারণ মানুষ ইহার দ্বারা ভবিষ্যৎ দেশবাসীর শুভেচ্ছা অর্জন করিতে পারে।

শিল্প-বাণিজ্য জগৎ

(চা:-শিল্প সম্বন্ধে বাগচা তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট)

ভারতে চা, কফি ও রবার শিল্পের আর্থিক অবস্থা ও বিভিন্ন সমস্যা ব্যাপকভাবে তদন্ত করিবার জন্য কমিশনকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। কফি ও রবার শিল্পের রিপোর্ট দুইটি এখনও বিবেচনাধীন রহিয়াছে। ভারত সরকার চা-শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলির মতামত ভালভাবে বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

চায়ের ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে কমিশন কয়েকটি সুপারিশ করেন। সরকার স্থির করিয়াছেন যে চা-বোর্ডের চেয়ারম্যান মধ্যে মধ্যে চায়ের খুচরা বিক্রয়ের প্যাকেটগুলির মূল্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিবেন এবং মূল্য অত্যধিক হইয়াছে বুঝিলে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বা সরকারের নিকট সুপারিশ করিবেন।

ছোট ছোট প্যাকেটে চা-বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা সম্পর্কে একটি বিশেষ অনুসন্ধান করিবার জন্য কমিশন যে সুপারিশ করিয়াছেন সরকার তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। চা-বোর্ডকে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য অনুরোধ করা হইবে। ইহাতে ছোট ছোট প্যাকেটকারীদের অসুবিধা দূর হইবে এবং তাঁহারা ব্যবহারকদের সেবায় আরও বেশী আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন।

সর্বাধিক উৎপাদন—প্যাকিং প্রতিষ্ঠানগুলির বার্ষিক উৎপাদনের সর্বোচ্চ হার বাঁধিয়া দিবার যে সুপারিশ করা হয় সরকার তাহা গ্রহণ করেন নাই। কারণ সরকার মনে করেন এভাবে আভ্যন্তরীণ ব্যবহারকদের বিশেষ সুবিধা হইবে না। কলিকাতাস্থ সরকারী গুদামগুলির পরিচালনা বিষয়ে সরকার মনে করেন এগুলি পরিচালনার দায়িত্ব চা-বোর্ডেরই গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু কোচিনে পরিস্থিতি অনুরূপ না হইলে এ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দেরী হইবে। গুদামগুলির চার্জ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে সরকার বা চা-বোর্ডের নিকট এ বিষয়ে অভিযোগ করিলে সে বিষয়ে তদন্ত করা হইবে।

সরকার মনে করেন চা-এর রপ্তানির পরিমাণ মঞ্জুর ব্যবস্থা রদ করিলে চা-বাণিজ্য বা শিল্পের বিশেষ কোন সুবিধা হইবে না। তবে অপব্যবহার রোধ অথবা কমাইবার জন্য কোটার বরাদ্দ পরিবর্তন করিতে সরকার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কলিকাতায় এবং কোচিনে চা-এর বিক্রয় চা-বোর্ড কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ হওয়া উচিৎ এ সম্পর্কে কমিশন যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহা সরকার গ্রহণ করেন নাই। সরকার মনে যে চা-বোর্ড এবং চা-শিল্প কর্তৃক গঠিত সংস্থাগুলির মধ্যে ঘনিষ্টতম সংযোগ থাকা আবশ্যক।

খুচরা সরবরাহ—চা-এর খুচরা সরবরাহ করা চা-বোর্ডের পক্ষে ঠিক হইবে না বলিয়াই সরকার মনে করেন; কমিশন সুপারিশ করিয়াছিলেন যে ভারতে যে চা ব্যবহার করা হয় তাহার অর্ধেক পরিমাণ চা প্যাকেট করা ও সরবরাহের ভার চা-বোর্ডের লওয়া উচিত। অর্থ ও করধার্য বিষয়ে সুপারিশ করিতে গিয়া কমিশন বলিয়াছেন যে ভারতীয় মালিকদের চা-বাগানগুলির ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থার বিলোপ করিতে হইবে। সরকার এই সুপারিশ গ্রহণ করেন নাই। সরকার মনে করেন কমিশন যে যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহাতে অন্যান্য শিল্প হইতে চা-শিল্পকে পৃথক করিয়া বিবেচনা করা যায় না। ঠিক ঐ কারণেই লভ্যাংশ ঘোষণার জন্য সংগৃহীত তহবিল (সমহারে লভ্যাংশ ঘোষণার জন্য সংগৃহীত তহবিল ব্যতীত) হইতে অর্থ গ্রহণ নিষেধ করিয়া কমিশন যে সুপারিশ করিয়াছেন সরকার তাহা গ্রহণ করেন নাই।

অর্থ—চা-শিল্পকে পর্যাপ্ত পরিমাণে আর্থিক সাহায্য দিবার বিষয়ে সরকার নীতিগতভাবে সম্মত হইয়াছেন। আসাম বা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য অর্থ সাহায্য কর্পোরেশনের সুবিধা যাহাতে ত্রিপুরাও পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে সরকার সম্মত হইয়াছেন এবং ত্রিপুরা কর্তৃপক্ষকে এই দুইটির মধ্যে কোন একটি রাজ্যের সহিত যৌথ অর্থ সাহায্য কর্পোরেশন গঠনের বিষয়টি বিবেচনা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। অত্যন্ত ঋণগ্রস্থ বাগিচাগুলি সম্বন্ধে চা-বোর্ডের অনুসন্ধান করার বিষয়ে সরকার একমত। অর্থনৈতিক দুর্দশাগ্রস্থ চা-বাগানগুলি সম্বন্ধে সঠিক অনুসন্ধান করিবার জন্য চা-বোর্ডকে অনুরোধ করা হইবে। যে সব অবস্থায় ভারতীয় কোম্পানীগুলি সময়ে সময়ে কারবার গুটাইয়াছে সেই অবস্থার পর্যালোচনা করা যে প্রয়োজন সরকার তাহা স্বীকার করেন। চা-বোর্ডের হাতে এ ধরণের অবস্থা পর্যালোচনা করেন সেজন্য তাহাদিগকে অনুরোধ জানান হইয়াছে।

রপ্তানি শুল্ক—কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন যে, লণ্ডনের নীলামে ভারতীয় চা-এর পূর্ববর্তী ছয় মাসের গড় মূল্য স্থির করিতে হইবে। বর্তমানে পূর্ববর্তী মাসের গড়মূল্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চা-এর মূল্য নির্ধারণ করা হয়। বর্তমান ব্যবস্থায় মন্দার বাজারে ঠিক পরবর্তী মাসে রপ্তানি শুল্ক হ্রাস করা যাইতে পারে। কিন্তু ছয় মাসের গড়মূল্যের ভিত্তিতে চা-এর মূল্য নির্ধারণ করিলে রপ্তানি শুল্ক সহজে পরিবর্তন করা যাইবে না।

চা শিল্পের উন্নয়ন ও গবেষণা, ক্ষুদ্র চা উৎপাদকদের বিবিধ সমস্যা, চা শিল্পের শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে কমিশন যে সুপারিশ করেন সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিম্নে দেওয়া হইল:—

চা বোর্ডের যাহাতে কতকগুলি গবেষণা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করেন সেজন্য তাঁহাদিগকে পরামর্শ দেওয়া হইতেছে। গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে প্রয়োজনবোধে একটি বাগিচা রাখার প্রয়োজন হইবে। যে সব স্থানে চা শিল্পের বিশেষভাবে ক্ষুদ্র চা-উৎপাদকদের উপকার হইবে সেই সব স্থানে গবেষণা কেন্দ্রের সহিত বাগিচা রাখার দরকার হইবে। পাঞ্জাবের কাঙ্গড়া জেলায় চা-শিল্পের সহায়তার জন্য বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহলের সহিত পরামর্শক্রমে চা-বোর্ড একটি পরিকল্পনা রচনা করিবেন। সরকার ব্যক্তিগত বাগিচার আবাদের সম্প্রসারণ একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়ার পক্ষপাতী নহেন। সরকার ইতিপূর্বে যে নিয়মাবলী জারি করিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে, যে সব বাগিচায় ৫০০ একরের বেশী জমিতে চা আবাদ হয়, সেখানে চা বোর্ড পূর্ব হইতে সরকারের অনুমোদন না লইয়া সম্প্রসারণের অনুমতি দিতে পারেন না। এক বৎসর বা কয়েক বৎসরের জন্য চা-চারা বসাইবার লক্ষ্য কড়াকড়িভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া সরকার কার্যকরী বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু তাঁহারা নূতন নূতন চারা বসানর পক্ষপাতী।

সমবায় সমিতি—ক্ষুদ্র চা-উৎপাদকদের মধ্যে সমবায় প্রচেষ্টা চালনা সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ সরকার নীতিগতভাবে অনুমোদন করেন। তাঁহাদের ইচ্ছা এই যে, সমবায় সংগঠনের সাফল্য লাভের যেখানে সম্ভাবনা থাকিবে সেখানে চা-বোর্ড প্রয়োজনানুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। যেখানেই ক্ষুদ্র চা-উৎপাদকগণ সমবায় সমিতি গঠন করিয়া মিলিত হইবেন সেইখানেই সর্বপ্রকারে উৎসাহ ও সাহায্যদান করা হইবে। ক্ষুদ্র চা-বাগিচাগুলি যাহাতে স্বেচ্ছায় মিলিত হয় সেজন্য উৎসাহ দেওয়া উচিত বলিয়া কমিশন যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহা সরকার অনুমোদন করিয়াছেন। যে সব সদস্য এ বিষয়ে একমত হন নাই তাঁহাদের প্রস্তাব, যে সব রাজ্যে টুকরা কৃষি জমি সম্পর্কে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে সেইসব রাজ্যের সরকারদের সহিত পরামর্শক্রমে বিচার করা হইবে। শ্রমিক-মালিক বিরোধ, সম্ভব হইলে পারস্পরিক আলাপ আলোচনাক্রমে মীমাংসা করিয়া ফেলা উচিত বলিয়া কমিশন যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহা সরকার সমর্থন করেন। বর্তমানে আলাপ-আলোচনা যেভাবে চালান হয় সেইভাবেই উহা চলিতে থাকিবে। যে কোন প্রকার বিরোধ উপস্থিত হইলেই তাহা মীমাংসার জন্য ট্রাইব্যুনালে যাইতে হইবে এরূপ রীতি বন্ধ করিতে হইবে বলিয়া কমিশন যে সুপারিশ করিয়াছেন সরকার মোটামুটিভাবে তাহার সমর্থক। যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য কমিশনের মন্তব্য বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে জানান হইতেছে। শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে কমিশনের কতকগুলি প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট যোগ্য মন্ত্রণালয় বিবেচনা করিবেন। এই প্রস্তাবগুলি শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ হ্রাসের ব্যবস্থা। বাগিচা হস্তান্তরিত হইলে শ্রমিকদের প্রতি বাগিচার দায়িত্ব পালন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে।

ভারতীয়দের নিয়োগ—অভারতীয় মালিকানার বা অভারতীয় পরিচালিত কোম্পানীগুলির পরিচালনা ব্যাপারে অধিক সংখ্যক ভারতীয় নিয়োগ সম্পর্কে সরকারের ইচ্ছা যেরূপ, কমিশনের অভিমতও তদনুরূপ। এদিকে গত তিন বৎসরে যেরূপ অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে তাহা অব্যাহত থাকিবে বলিয়া সরকার আশা করেন। চা-বোর্ডের কার্যাবলীর প্রকৃতি ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে যথাযথ খোঁজ খবর লওয়ার পর সরকার উহার গঠনতান্ত্রিক পরিবর্তন সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ বিবেচনা করিবেন।

পরিবহন—ধুবড়ীর সহিত কেন্দ্রীয় ডুয়ার্সের স্থায়ী যোগাযোগ সাধনের উদ্দেশ্যে রেল লাইন স্থাপনের আবশ্যকতা সম্পর্কে সরকার কমিশনের মত সমর্থন করেন। এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান কার্য চালাইবার জন্য কমিশনের উক্ত সুপারিশ রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কমিটির নিকটে পাঠান হইয়াছে। রেল ষ্টেশনে চা রাখার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছাড়াও দক্ষিণ ভারতে চা চালান দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক ওয়াগনের বন্দোবস্ত করা হইবে। ইতিমধ্যে নিচ্ছিদ্র ওয়াগনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কতকগুলি সুপারিশ, বিশেষতঃ চা শিল্পে ও শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ও রাজ্য সরকারসমূহ কর্তৃক গৃহীত কর নির্ধারণ আইন বিষয়ে কমিশনের সুপারিশগুলি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। কমিশনের অপর কতকগুলি সুপারিশ সম্পর্কে চা শিল্পের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। "প্ল্যান্টিং" তহবিল গঠনসহ কমিশনের আরও কয়েকটি সুপারিশ সম্পর্কে সরকার এখনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। কমিশনের অসাধারণ চেষ্টার ফলে চা-শিল্পের বিভিন্ন দিকের অসংখ্য তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এজন্য সরকার কমিশনের কার্যাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

ভারতে পেটেণ্ট ও ডিজাইনের জন্য আগ্রহ বৃদ্ধি

নূতন নূতন পেটেণ্ট ও ডিজাইনের জন্য ভারতে আগ্রহ কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে পেটেণ্ট দপ্তরের ১৯৫৫ সনে প্রাপ্ত আবেদন পত্রগুলি হইতে তাহা অনুমান করা চলে। ঐ বৎসর পেটেণ্টের জন্য ২,৭৩৬টি ও ডিজাইন রেজেষ্ট্রীর জন্য ৩,৮৩৫টি আবেদন পত্র পাওয়া যায়। পূর্ববর্তী বৎসর ঐরূপ আবেদন পত্রের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২,৪৯৭টি ও ৩,৩০৩টি। আলোচ্য বৎসর ডিজাইন রেজেষ্ট্রীর জন্য প্রাপ্ত আবেদন পত্রগুলির শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগই ভারতীয়গণ দাখিল করেন এবং অবশিষ্ট আবেদন পত্র গুলির বেশীর ভাগ যুক্তরাজ্য হইতে পাওয়া যায়। ঐ বৎসর পেটেণ্টের জন্য ভারতীয়দের নিকট হইতে ৪৪৬টি অর্থাৎ পূর্ববর্তী বৎসরের প্রায় সমান সংখ্যক আবেদন পত্র পাওয়া যায় এবং উহাদের মধ্যে শতকরা ৫৫টি পশ্চিমবঙ্গ ও বোম্বাই হইতে দাখিল করা হয়। ভারতীয়দের অবশিষ্ট আবেদন পত্রগুলির অধিকাংশ উত্তর প্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর ও বিহার হইতে পাওয়া যায়। উপরোক্ত তথ্যসমূহ পেটেণ্ট দপ্তরের ১৯৫৫ সনের কার্য বিবরণী হইতে জানা যায়। ভারত সরকারের পেটেণ্ট ও ডিজাইনের কন্‌ট্রোলার সম্প্রতি উহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহা হইতে জানা যায় যে, ১৯৫৫ সনে শিল্প ও টেক্‌নোলজির বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে আবিষ্কার সম্পর্কে ভারতীয়গণ পেণ্টেটের জন্য আবেদন করিয়াছেন এবং ইক্ষুরস ও সাকারিন পরিষ্কার ও পরিশুদ্ধ করার উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রতিই তাহাদের অধিক মনোযোগ ছিল।

রসায়ণ শিল্প—প্রাপ্ত আবেদন পত্র গুলির প্রায় শতকরা ৩৯ ভাগ রসায়ণ শিল্প সংক্রান্ত। উহাদের মধ্যে অধিকাংশই ফিনোথিয়াজিন, এমিনোফেনাজী ও গলাইকান সংক্রান্ত। গ্যাসোসিন জাতীয় মূল্যবান রসায়ণ দ্রব্যপ্রস্তুত সম্পর্কে ঐ বৎসর ভারতীয় আবেদনকারীদের যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায়। এলকালয়েড ও তজ্জাত দ্রব্যাদির প্রতি আলোচ্য বৎসর ভারতীয় ও বিদেশী আবেদনকারীদের যথেষ্ট উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। টেট্রাসাইক্লিন, পেনিসিলিন, এরিথ্রোইসিন জাতীয় এন্টি-বায়োটিক ঔষধের আবিষ্কারও বাড়িয়া যায়। পূর্ববর্তী বৎসরের মত উক্ত বৎসরও কীট ও ছত্রাক নাশক গন্ধমিশ্রিত ঔষধের পেণ্টেটের জন্য অনেক আবেদন পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, লৌহ ও ইস্পাত, ইঞ্জিনীয়ারিং, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং বয়ন শিল্প সম্পর্কিতও বহু আবেদন পত্র দাখিল করা হইয়াছে। কার্য্য বিবরণী হইতে জানা যায় যে, ১৯৫৫ সনে পেটেণ্ট দপ্তরের ৮ লক্ষ ১৭ সহস্রাধিক টাকা আয় ও ৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসর আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা ও ৪ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা।

যৌথ প্রতিষ্ঠানের চলতি লাভ জমা সংক্রান্ত নিয়মাবলী

ভারত সরকার আয়কর আইনের ১০ নং ধারায় ২-সি নং উপধারা অনুসারে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে ১৯৫৭ সালের আয়কর য়্যালাউন্স নিয়মাবলী রচনা করিয়াছেন। ঐ নিয়মাবলী গত ২৯শে জুন (১৯৫৭) তারিখের গেজেট অব ইণ্ডিয়ায় প্রকাশিত হইয়াছে। জনসাধারণের মতামত জানিবার জন্য ঐ নিয়মাবলীর খসড়া পূর্বেই প্রকাশ করা হইয়াছিল। স্মরণ থাকিতে পারে যে ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে আয়কর আইনের যে সংশোধন করা হয়, তদনুসারে সকল যৌথ কোম্পানিকে তাঁহাদের অংশীদারদিগকে অবিলিকৃত লাভ, উন্নয়ন রিবেট ও ক্ষয়ক্ষতি য়্যালাউন্সের কিছু অংশ সরকারের নিকট জমা দিতে হয়। যে সব যৌথ প্রতিষ্ঠানকে বিশেষভাবে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে সেগুলি ছাড়া অন্যান্য যৌথ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শতকরা ৫০ ভাগ লাভ জমা দিতে হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। পূর্ব বিজ্ঞপ্তি অনুসারে নিম্নলিখিত শ্রেণীর যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলিকে লাভের টাকা জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছিল।

(১) সরকারী যৌথ প্রতিষ্ঠান, (২) বিধিবদ্ধ করপোরেশন, (৩) ব্যাঙ্কিং কোম্পানি (৪) বীমা কোম্পানি, (৫) বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে নিম্নলিখিত শ্রেণীর যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুরূপ অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে :—(১) ফিনান্সিয়াল করপোরেশন, (২) যে সব যৌথ প্রতিষ্ঠান 'হায়ার পারচেজ' ব্যবস্থায় অর্থ সরবরাহ করে, (৩) বিমান জাহাজ চলাচল প্রতিষ্ঠান সমূহ (ভারতীয় ও বিদেশী) নিয়মানুসারে শুধু বোর্ড অব রেফারিই কোন কোম্পানীকে লাভের টাকা জমা দেওয়ার দায় হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন বা জমা দেওয়া টাকা প্রত্যর্পণ করার ব্যবস্থা করিতে পারেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া রেফারি বোর্ড গঠন করা হইয়াছে—ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার (বোম্বাই) চেয়ারম্যান শ্রীপি, সি, ভট্টাচার্য (চেয়ারম্যান), বোম্বাইস্থ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার গবেষণা ও পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান উপদেষ্টা ডাঃ বি, কে, মদন। এই নিয়মাবলী কার্যকরী করিবার জন্য আয়কর কমিশনার ও বোর্ড অব রেফারির সুবিধার্থে নির্দেশাবলী প্রচার করা হইয়াছে। নির্দিষ্ট বিধিব্যবস্থা অনুসারে কি পরিমাণ লাভ জমা দিতে হইবে তাহা স্থির করা

এবং নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে উহা জমা দেওয়া যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্ব। টাকাটা কোন অনুমোদিত উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইয়াছে বা ব্যয় করা দরকার—এই কারণে যদি কোন কোম্পানি ঐ টাকার সবটা বা কিছুটা আটকাইয়া রাখিতে চান, তবে সেজন্য পূর্বেই প্রথমতঃ আয়কর কমিশনারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। আয়কর কমিশনার ঐ কোম্পানির অনুরোধ মঞ্জুর করিতে পারেন অথবা তাঁহার মন্তব্যসহ ঐ আবেদন রেফারি বোর্ডের নিকট পাঠাইতে পারেন। বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

জমা দেওয়া টাকা ফেরত পাইতে হইলে সরাসরি রেফারি বোর্ডের নিকট আবেদন করিতে হইবে। তাঁহারাই এ বিষয়ে আবশ্যক বিচার-বিবেচনা করিবেন। কি কি অনুমোদিত উদ্দেশ্যে, জমা-দেওয়া টাকা আটকাইয়া রাখা যাইতে পারে, বা জমা-দেওয়া টাকা ফেরত লওয়া যাইতে পারে তাহা নিয়মাবলীর মধ্যে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অনুমোদিত উদ্দেশ্যের মধ্যে মূলধনী ব্যয় ও ঋণ পরিশোধই প্রধান। তবে জাতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য অনুযায়ী শিল্পোন্নয়নে এই অর্থ যথার্থই প্রয়োজন কি না তাহা বিবেচনা করিয়া আবেদন মঞ্জুর করা হইবে। কোন উদ্দেশ্যে অনুমোদন করা যাইবে কি না তাহা নিম্নলিখিত বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিবেচনা করা হইবে—

(১) কার্যকরী মূলধনের যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজন, (২) ব্যবসায়ের আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন বা সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা; (৩) ১৯৫১ সালের শিল্প আইনের আওতায় পড়ে এমন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গত পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ, (৪) সাহায্যকারী কোম্পানীতে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ, অনুমোদনের সময় নিম্নলিখিত বিষয় বিচার করা হইবে না—

(১) ফাটকাবাজীতে অর্থ বিনিয়োগ, (২) কোম্পানির উপর কর্তৃত্ব রাখার জন্য শেয়ারগুলি কোণঠাসা করা, (৩) একচেটিয়া অধিকার বিস্তারের জন্য অর্থ তদনুরূপভাবে নিয়োগ করা, (৪) অত্যাবশ্যক নয় এমন পণ্য নির্মাণের পরিকল্পনার অথবা বৈদেশিক মুদ্রার উপর অস্বাভাবিক চাপ পড়ে এমন কাজে অর্থ বিনিয়োগ। সরকারের নিকট জমা দেওয়া টাকার উপর ১৯৫৭-৫৮ সালে শতকরা ৩½ হারে সুদ পাওয়া হইবে। রেফারি বোর্ডের অফিস—আয়কর ভবন, কুইন্স রোড বোম্বাই ঠিকানায় অবস্থিত থাকিবে।

———

প্রথম পরিকল্পনার সাফল্যের বিবরণী

(৩৫২ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল। পরিকল্পনাকালে বড় এবং মাঝারি সেচ পরিকল্পনা কার্যকরী করিয়া ৬০ লক্ষ একর জমিতে জল সেচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, হৃদিত ৮৫ লক্ষ একর জমিতে জল সেচনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে মাত্র ৪০ লক্ষ একর জমিতে এই জল ব্যবহৃত হইয়াছে। ছোট সেচ পরিপ্রল্পনার দ্বারা এক কোটি জমি উপকৃত হইয়াছে। এই সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতাও ২০ লক্ষ কিলোওয়াট হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৪ লক্ষ কিলোওয়াট হইয়াছিল। বিবরণীতে প্রত্যেক রাজ্যে সেচ ও বিদ্যুৎ পরিকল্পনার অগ্রগতির হিসাব আলাদাভাবে দেওয়া হইয়াছে।

সমষ্টি উন্নয়ন এবং জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনা—সমষ্টি উন্নয়ন এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সার্ভিস প্রথম পরিকল্পনাকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কার্যসূচী। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে

ভারত তাহার গ্রাম্য জীবনের উন্নয়নের যে বৈষয়িক ব্যবস্থা করিয়াছে এগুলি হইল তাহার প্রমাণ স্বরূপ। প্রথম পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বেই সরকার এবং কতকগুলি সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে এইরূপ উন্নয়নমূলক কার্য পরিচালনা করিতেছিলেন। ব্যাপকভাবে উন্নয়ন কার্য কোন দৃষ্টিভঙ্গী এবং পদ্ধতিতে আরম্ভ করিলে বিশেষ সফলতা লাভ করিবে তাহা এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাগুলি হইতে সঠিকভাবে জানা ও বোঝা গিয়াছিল। প্রথম পরিকল্পনার শেষের দিকে সমষ্টি উন্নয়ন এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সার্ভিসের কাজ ১৪০,০০০টি গ্রাম জুড়িয়া চলিতেছিল।

স্বাস্থ্য—পরিকল্পনাকালের প্রথম বৎসর স্বাস্থ্য খাতে ১১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল কিন্তু শেষ বৎসর পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যের জন্য মোট ১০১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। ১৯৫১ সালে মোট ৮৬০০টি হাসপাতাল, ডিসপেন্সারি ও অন্যান্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ছিল। বেডের সংখ্যা ছিল সর্বশুদ্ধ ১ লক্ষ ১৩ হাজার। পরিকল্পনার শেষ বৎসরে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ও বেডের সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০ হাজার ও ১ লক্ষ ২৫ হাজার। ইহা ছাড়া প্রসূতি ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্রেরও সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৯৫০-৫১ সালে এই ধরণের কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ১৬৫১। পরিকল্পনাকালে আরও ২০১টি কেন্দ্রস্থাপিত হইয়াছিল।

গৃহ নির্মাণ—পরিকল্পনাকালে পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় সহরাঞ্চলে ৩,২৩,০০০ গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় পূর্ত, গৃহ নির্মাণ ও সরবরাহ মন্ত্রণালয় ব্যতীত বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়গুলি ৩ লক্ষ গৃহ নির্মাণ করেন। সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা অনুযায়ীও ৭ লক্ষ ৪২ হাজার গৃহ নির্মিত হইয়াছে। বেসরকারী উদ্যোগে কত গৃহ নির্মিত হইয়াছে তাহার হিসাব দেওয়া শক্ত। তবে ৬ লক্ষ গৃহ বেসরকারী উদ্যোগে নির্মিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রথম পরিকল্পনাকালে সহরাঞ্চলে সর্বশুদ্ধ ১০ লক্ষ গৃহ নির্মিত হইয়াছে। পরিকল্পনাকালে পল্লী অঞ্চলে গৃহ নির্মাণের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। নানাবিধ অসুবিধার জন্য শ্রমিক এবং নিম্নবিত্তদের জন্য গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনাটির রূপায়ন সম্ভব হয় নাই।

অনুন্নত শ্রেণীর কল্যাণ—অনুন্নত শ্রেণীর কল্যাণের জন্য প্রথম পরিকল্পনায় যে কাজ সুরু করা হইয়াছিল তাহার ফলাফল নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে নানা দিকে উল্লেখযোগ্যভাবে কাজ সুরু করা হয়। ইহার ফলে অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে কর্মাকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ জাগান গিয়াছে। তাহারা এখন তাহাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে খুবই উৎসুক।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কর্ম—প্রথম পরিকল্পনাকালে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য ৯৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। ইহার মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানাগত উদ্বাস্তুদের জন্য ৪৮ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা এবং পূর্ব পাকিস্তানাগত উদ্বাস্তুদের জন্য ৪২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। ইহা ছাড়া, পুনর্বাসন আইন সাহায্য সংস্থা উভয় প্রকারের উদ্বাস্তুকে ৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ঋণ স্বরূপ দিয়াছেন।

কর্মসংস্থান পরিস্থিতি—প্রথম পরিকল্পনাকালে যে হারে শ্রমিক সংখ্যা বাড়িতেছিল সেই অনুপাতে কর্ম সংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায় নাই, বেকার ও অর্ধ বেকারদের সমস্যা তেমন কমে নাই, কারণ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে এই সমস্যা বদ্ধমূল হইয়া আছে। কিন্তু পরিকল্পনার শেষ পর্যায়ে কর্ম সংস্থান পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি ঘটে এবং কোন কোন উদ্যোগে আধা-নিপুণ ও কারিগরী কর্মীর ক্রমবর্ধমান অভাব অনুভূত হয়। শুধু উৎপাদনের দিক দিয়া নয়, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির দিক দিয়া যদি বাঞ্ছিত ফল লাভ করিতে হয়, তবে প্রথম পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত আশু প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়াও সুদূর প্রসারী গঠনতান্ত্রিক ও সামাজিক পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। পরিকল্পনায় বলা হয় যে, এই উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশে জাতীয় সম্প্রসারণ ও সমষ্টি উন্নয়ন আন্দোলন চালাইতে হইবে। ভূমি সংস্কার করিতে হইবে, সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির সম্প্রসারণ ঘটাইতে হইবে এবং সেগুলি শক্তিশালী করিতে হইবে ব্যাঙ্কিং ও ঋণদান ব্যবস্থার সংস্কার করিতে হইবে এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে নূতন ভাবে একটা সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে। পরিকল্পনাকালে এই সকল ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের সূত্রপাত করা হইয়াছে।

সমবায়—প্রথম পরিকল্পনাকালে ১৩০ কোটি টাকা সমবায় ঋণ হিসাবে দেওয়া হইবে বলিয়া বরাদ্দ হইয়াছিল। তন্মধ্যে স্বল্পমেয়াদী ঋণ ১০০ কোটি টাকা, মাঝারি মেয়াদী ঋণ ২৫ কোটি টাকা এবং দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ হিসাবে ১০ কোটি টাকা দেওয়ার প্রস্তাব হয়। কিন্তু পরিকল্পনাকালে মোট ৮০ কোটি টাকা পরিমাণ ঋণ দেওয়া হইয়াছে। উহার মধ্যে সমবায় সমিতি মারফৎ ৫৩ কোটি টাকা এবং রাজ্য সরকারগুলি মারফৎ ২৭ কোটি টাকা দেওয়া হয়। ঋণের গ্রহণের পরিমাণ এত কম হইবার প্রধান কারণ হইতেছে এই যে সমবায় আন্দোলনটি ব্যাপকতা লাভ করে নাই। আবার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি পণ্যের বিপণন কার্যসূচীর সহিত এই ঋণদান ব্যবস্থাকে যুক্ত করা হয় নাই। স্বল্প মেয়াদী ঋণদান ব্যবস্থারও কোনও প্রকার উন্নতি ঘটে নাই। বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে সমষ্টি উন্নয়ন এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সার্ভিস কার্যসূচীর সার্থক রূপায়নের দ্বারা সমবায় আন্দোলনকে জনগণের কার্যসূচী হিসাবে গড়িয়া তুলিবার যথেষ্ট সুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। পরিকল্পনাকালে কৃষি সম্পদ এবং কৃষি ঋণ সমিতিগুলি কার্য পরিধি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইলেও উহার কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু দুর্বলতা পরিলক্ষিত হইয়াছে। এই দুর্বলতা দূর করিয়া ক্রমে বলিষ্ঠ সংগঠন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে এবং সেই সঙ্গে উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি পাইবে। রাজ্যসমূহে সমবায় আন্দোলন খুবই দুর্বল ছিল। কোন কোন রাজ্যে একজন পরিদর্শকের অধীনে বহু সংখ্যক সমবায় সমিতি ছিল এবং হিসাব পরীক্ষকের বিশেষ অভাব ছিল। ক্রমে অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে।

ভূমি সংস্কার—রাজ্যগুলিতে ভূমি সংস্কার সম্পর্কে যথেষ্ট কাজ হইয়াছে; ঐগুলির অধিকাংশই অঞ্চল অথবা রাজ্যের স্বার্থে হইয়াছে, ভূমি সংস্কার পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে মধ্যবর্তী স্বার্থ উচ্ছেদ করা, সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে সরকার ও রায়তদের মধ্যে সরাসরিভাবে সম্পর্ক স্থাপন, রায়তদের জন্য প্রজাস্বত্ব ও ন্যায্য কর নির্ধারণ এবং জমির মালিকানা বিষয়ে অসামঞ্জস্য হ্রাস করা। জমিতে চাষীর মালিকানা নির্ধারিত হওয়ার পর জমির পরিচালনার উন্নতি, উহার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি, কৃষি ও অকৃষি উপজীবিকার মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ সাধন এবং সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণে যাহারা জমির মালিকানা পান নাই তাহাদেরও মঙ্গল বিধান ও জীবিকা নির্বাহ নিয়মে জমির মালিকদের অনুপ্রাণিত করা সম্পর্কে যত্নশীল হইতে হইবে। ভূমি সংস্কার পরিকল্পনাকে সামাজিক বিবর্তন ও আর্থিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া রূপেই সর্বদা দেখা উচিত। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে সুরু হইলেও উহার অগ্রগতি পরবর্তী কয়েকটী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকাল পর্যন্ত চলিবে।

প্রায় ৯৮৮টি ব্লকে এই কাজ চলিয়াছে এবং ৭ কোটি ৭৪ লক্ষ দেশবাসী ইহার দ্বারা উপকৃত হইয়াছে। পরিকল্পনায় এই কাজের জন্য ৯০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ৪৮ কোটি টাকা। যে ৫৫টি সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ ১৯৫২ সালে আরম্ভ করা হইয়াছিল সেগুলির জন্যই এই অর্থের অর্ধেক ব্যয় করা হইয়াছে।

শিল্প দ্রব্যের উৎপাদন—প্রথম পরিকল্পনাকালে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে উৎপাদন শিল্পে মোট ২৯০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হইয়াছিল। উহার মধ্যে উৎপাদন শতকরা ৭৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আংশিক তৈরি দ্রব্য প্রধানতঃ শিল্পের কাঁচামালের উৎপাদন শতকরা ৩৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনও অনুরূপভাবে শতকরা ৩৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

প্রথম পরিকল্পনাকালে শিল্প দ্রব্যের উৎপাদনও ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৪০ ভগে। ১৯৫০-৫১ সালে কাপড়ের কলে ৩৭১ কোটি ৪০ লক্ষ গজ কাপড় উৎপন্ন হয়। ১৯৫৫-৫৫ সালে উৎপন্ন হইয়াছে ৫১০ কোটি লক্ষ গজ। উহা পরিকল্পনার লক্ষ্যের তুলনায় ৪০ কোটি গজ অধিক। চিনি, সেলাই কল, কাগজ, পেপার বোর্ড ও সাইকেলের উৎপাদন-প্রত্যাশিত লক্ষ্যই হইয়াছিল। বস্তুতঃ কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদন পরিকল্পনার লক্ষ্যকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। এদেশে সিমেন্টের উৎপাদন ১৯৫০-৫১ সালের ২৭ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৫-

সালে ৪৬ লক্ষ টন হয়। প্রথম পরিকল্পনাকালে সাধারণ ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প ও ভারী রাসায়নিক দ্রব্য এবং রসায়ন শিল্পজাত দ্রব্যের পরিমাণ ও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। প্রচুর পরিমাণে কাঁচা উপকরণ পাওয়া যায়, অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা কাজে লাগান হয় এবং শ্রমশিল্পে উল্লেখযোগ্যভাবে অর্থ বিনিয়োগ করায় শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন সাধারণভাবে বৃদ্ধি পায়। প্রথম পরিকল্পনাকালে এদেশে সর্বপ্রথম টাইপরাইটার, অন্টারনেটার, পেনিসিলিন প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত হয় এবং পেট্রোলিয়াম পরিশোধন, জাহাজ নির্মাণ, বিমান নির্মাণ, রেলওয়ে ওয়াগন নির্মাণ, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ও ডি. ডি. টি কারখানা স্থাপিত হয়। সরকারী উদ্যোগে সিন্ধ্রী সার কারখানা, চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা, ভারতীয় টেলিফোন শিল্প, পূর্ণাঙ্গ বগি কারখানার সন্তোষজনক অগ্রগতি সম্ভব হয়। পরিকল্পনাকালে পরিকল্পিত লৌহ ও ইস্পাত কারখানা ও ভারী বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম কারখানার কাজ আরম্ভ করার সম্ভব হয় নাই। মেশিনটুল কারখানা, নেপা নিউজপ্রিন্ট কারখানা ও বিহারের সুপারফসফেট কারখানা স্থাপনের কাজও নির্দিষ্ট সময়মত করা যায় নাই।

পরিকল্পনার প্রারম্ভে এদেশের যে শিল্পোৎপাদন ক্ষমতা ছিল শুধু তাহার সদ্ব্যবহারের দিক দিয়া নয়, নূতন ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নূতন উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টির দিক দিয়াও শিল্পক্ষেত্রে সন্তোষজনক উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল। কারখানা আধুনিকীকরণ ও পুরাতন যন্ত্রপাতি বাতিল করিয়া নূতন যন্ত্রপাতি স্থাপনের দিকে কাজ আশানুরূপ হয় নাই। এদিকে পরিকল্পনায় ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু ব্যয় হইয়াছিল ১১০ কোটি টাকা।

বে-সরকারী উদ্যোগে—পরিকল্পনায় উৎপাদন ও উন্নয়নের যে লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছিল তাহা কার্যকরী করার দায়িত্ব সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের উপর ন্যস্ত হয়। সংগঠিত শিল্পোদ্যমে উন্নয়নের কর্মসূচীর সমন্বয় সাধনের জন্য পরিকল্পনায় চেষ্টা করা হইয়াছিল। পরিকল্পনায় এই উদ্যোগের জন্য একটা অগ্রাধিকারের ব্যবস্থা করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্মসূচীর রূপায়নের জন্য একটা নীতির কাঠামোও স্থির করিয়া দেওয়া হয়। বে-সরকারী প্রচেষ্টায় শিল্প সম্প্রসারণের জন্য আনুমানিক ২৩৩ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রয়োজন ছিল। ইহার বেশীর ভাগ বিনিয়োগ মূলধনী পণ্য ও উৎপাদনী পণ্য শিল্পের জন্য নির্দিষ্ট হয়। যে সব তথ্য পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, প্রথমে যেরূপ আশা করা গিয়াছিল বে-সরকারী উদ্যোগে অর্থ বিনিয়োগ সেইরূপই হইয়াছে।

গ্রামীন ও ক্ষুদ্র শিল্প—প্রথম পরিকল্পনাকালে গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্পের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়। পরিকল্পনায় গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য যে লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল তাহাতে পৌঁছান আদৌ সম্ভব হয় নাই কিন্তু উল্লেখযোগ্যরূপে কাজ সুরু হইয়াছে। ১৯৫৩ সালের পর হইতে বিভিন্ন ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়নের জন্য কতিপয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনাধীন গ্রামগুলিতে ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে। ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের জন্য মোট ৬৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ১২ কোটি টাকা বিভিন্ন রাজ্য এবং ৩৪ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার ব্যয় করেন। এই ৩৪ কোটি টাকার মধ্যে খাদি ও তাঁত শিল্পের জন্য ১২ কোটি টাকা করিয়া, ক্ষুদ্রাবয়ব শিল্পগুলির জন্য ৪ কোটির অধিক টাকা এবং গ্রামীন শিল্পের জন্য প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

রেলওয়ে—পরিকল্পনাকালে রেলওয়ের ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়। পরিকল্পনাকালে ১,০৩৮টি ইঞ্জিন, ৫,৬৭৪টি যাত্রীবাহী বগী এবং ৪৯,১৪৩টি মালবাহী বগী সংগ্রহের কথা ছিল কিন্তু পাঁচ বৎসরে ১,৫৮৬টি ইঞ্জিন, ৪,৭৫৮টি যাত্রীবাহী বগী এবং ৬১,২৫৪টি মালবাহী বগী সংগৃহীত হইয়াছে। ১৯৫১-৫২ সালে দেশে ২৭টি ইঞ্জিন, ৩,৭০৮টি মালবাহী বগী এবং ৬৭৩টি যাত্রীবাহী বগী নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৫৫-৫৬ সালে ১৭৯টি ইঞ্জিন, ১৪,৩১৪টি মালবাহী বগী এবং ১,২২১টি যাত্রীবাহী বগী নির্মিত হয়। যুদ্ধের সময় ৪৩০ মাইল রেল লাইন নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঐ লাইন পুনরায় ঠিক করা হয়। ইহা ছাড়া, ৩৮০ মাইল ন্যারো গেজের লাইন মীটার গেজে রূপান্তরিত করা হয়। সড়ক নির্মাণ ও যান চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়ন কাজও প্রায় শেষ হইয়া আসে

অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রধান প্রধান দিকে বিনিয়োগের পরিমাণ মূল লক্ষ্যের খুব কাছাকাছিই হইয়াছে এবং যে ফল লাভ করা গিয়াছে তাহা পরিকল্পিত হিসাবের শতকরা ৮৫ ভাগ হইতে ৯০ ভাগের মত হইবে। তবে একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বরাদ্দ ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে খুবই কম ছিল। রেলওয়ের কর্মসূচী ছিল মূলতঃ সংস্থাপনের কর্মসূচী। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ঠিক ঠিক চাহিদা মিটাইবার মত ছিল। তাহা ছাড়া প্রথম পরিকল্পনায় খনিজ সম্পদের উন্নয়নের দিকে তেমন মনোযোগ দেওয়া হয় নাই, আর বন্দর ও জাহাজ নির্মাণ সম্পর্কে প্রথমে যে পরিমাণ অর্থের বরাদ্দ করা হইয়াছিল অর্থাভাবে তাহার অনেক কম ব্যয় করা হইয়াছে।

সমাজ সেবা—পরিকল্পনাকালে সমাজ সেবার পরিধি বর্ধিত হইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৮৭ লক্ষ। ১৯৫৫-৫৬ সালে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হইয়াছে ২ কোটি ৪৮ লক্ষ। ১৯৫০-৫১ সালে ৬ ১১ বৎসরের স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল শতকরা ৪১, ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা বাড়িয়া হয় ৫১। ১১ হইতে ১৪ বৎসরের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ঐ সময়ে শতকরা ১৩৯ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯২ হয়। শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীর চাহিদা পূরণের জন্য পরিকল্পনাকালে অনেকগুলি কারিগরি শিক্ষালয় স্থাপন করা হয়। পরিকল্পনাকালে ইঞ্জিনীয়ারিং ও কারিগরি শিক্ষালয় হইতে উত্তীর্ণ গ্রাজুয়েটের সংখ্যা ২২০০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৭০০ এবং ডিপ্লোমাধারীদের সংখ্যা ২১০০ হইতে বাড়িয়া ৪,০০০ হয়।

প্রশাসন—প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে দক্ষতা ও সংহতির উন্নতি সাধন এবং জনগণের নিকট হইতে অধিকতর সহযোগিতা লাভ। সমগ্র পরিকল্পনাকালে এই সকল উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য অনেকগুলি ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। ঐগুলির মধ্যে মন্ত্রী সভা, মহাকরণে সংগঠন ও পদ্ধতি অধিকার স্থাপন, কেন্দ্রে খবরদারী সংস্থা গঠন, প্রত্যেক রাজ্যে দুর্নীতি দমন কমিটি নিয়োগ, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ কর্তৃক পরিকল্পনা অঞ্চল নির্বাচন কমিটি গঠন এবং শিল্প-পরিচালনা শিক্ষাক্রম উদ্ভাবন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হইতেছে জেলা-প্রশাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে কার্যাদি সম্পাদনের খুব অল্প ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল ; আলোচ্য জেলা প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনুযায়ী ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে।

দ্বিমুখী উদ্দেশ্য—প্রথম পরিকল্পনার দুইটী উদ্দেশ্য ছিল—(১) যুদ্ধ ও দেশ বিভাগের ফলে আর্থিক ব্যবস্থায় যে অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা দূর করা, (২) জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ে জীবন ধারণের মান উন্নত হইবে এমনভাবে সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের আয়োজন করা। আশু প্রয়োজন এবং সহজে প্রাপ্তব্য সম্পদের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট অর্থ বিনিয়োগ প্রস্তাব কার্যকরী করা হয়। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করিয়াই সম্পদ সংগ্রহের নীতি নির্ধারণ করা হয়। আমাদের লক্ষ্য হইল শুধু বর্তমানের সামাজিক-আর্থিক কাঠামোর মধ্যে উন্নয়নের পরিকল্পনা করা নয়, ধীরে ধীরে সংবিধানে নির্দিষ্ট গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই কাঠামোর পরিবর্তন সাধন করা। কাজেই দেখা যায়, প্রথম পরিকল্পনাটি হইল নূতন পথে প্রথম পদক্ষেপ। ইহাতে উন্নয়নের গুরুদায়িত্ব সরাসরি রাষ্ট্রের উপর আসিয়া পড়ে এবং সকল স্তরে সকল প্রকার উন্নয়ন কার্যের মধ্যে অধিকতর যোগাযোগ রক্ষা প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

প্রারম্ভিক অসুবিধা—পরিকল্পনার সূত্রপাতে নিম্নলিখিত অসুবিধাগুলি ছিল—শক্তির তুলনায় শিল্পোৎপাদনের স্বল্পতা, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবহন ব্যবস্থা, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সমস্যা, মুদ্রাস্ফীতির চাপ, আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিস্থিতি, কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারসমূহের উন্নয়ন কর্মসূচীর মধ্যে যোগাযোগের অভাব। নবগঠিত কোন কোন রাজ্যে শাসনযন্ত্র সাধারণ কাজকর্মের পক্ষেও উপযুক্ত ছিল না।

ব্যাপকতর উদ্দেশ্য—দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাইতে কি প্রয়োজন এবং উন্নয়নের জন্য কোথায় কতটা সম্পদ পাওয়া যাইবে সে বিষয়ে একটা সুসংহত ধারণা প্রথম পরিকল্পনায় পাওয়া

গিয়াছে। এই পরিকল্পনায় প্রারব্ধ উন্নয়ন কর্মসূচীগুলির সমন্বয় সাধন ও সংহতি বিধানের চেষ্টা করা হইয়াছে। পরিকল্পনার যে ব্যাপকতর উদ্দেশ্য আছে তাহা লঘু করিয়া দেখিলে ভুল হইবে। ইহা উন্নয়নের ব্যাপকতর আদর্শ নিরূপণে এবং উন্নয়নের সমস্যাবলীর প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের নূতন দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। প্রত্যেক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে ব্যাপক পরিকল্পনার আংশরূপে দেখা হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অগৌণে ফল লাভ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে ফল লাভের আশায় নূতন নূতন কাজ উহার সহিত সংযোগ করা হইয়াছে। অপর কথায় বলিতে গেলে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নীতি নির্ধারণ ও উহা কার্যে রূপান্তরণের একটি নূতন ও অর্থপূর্ণ পাদক্ষেপ এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশ ক্রমোন্নতির পথে যতদূর অগ্রসর হইয়াছে সরকারী কার্যাবলীতে তাহা ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে (পরিকল্পনার নীতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, প্রথম পরিকল্পনায় অর্থ বিনিয়োগের আশানুরূপ হার এবং কৃষি ও শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির ফলে আর্থিক অবস্থার উন্নতির ফলে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কড়াকড়ি হ্রাসের আবশ্যকতা দেখা দেয়। ১৯৫৩-৫৪ সনে দেশে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ফলে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ প্রথা রদ করা হয় এবং পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসর হইতে বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থা অনুকূল থাকায় সরকারী ও বেসরকারী অর্থ বিনিয়োগ পরিকল্পনায় বিশেষ কোনরূপ অসুবিধা দেখা দেয় নাই। এইরূপ উন্নতি সকলেরই অভিপ্রেত সন্দেহ নাই। তথাপি ইহা বলা বাহুল্য যে, এইরূপ অবস্থায় পরিকল্পিত উন্নয়ন সম্পর্কে নীতি ও প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা পরীক্ষা সম্ভব হয় নাই। পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পর্কে এই সকল নীতি ও প্রক্রিয়া অবাস্তব এইরূপ সিদ্ধান্ত সঠিক হইবে না। যখন প্রাপ্তব্য সম্পদের তুলনায় বিনিয়োগের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পায়, শুধু তখনই এই সকল সমস্যা দেখা দেয় এবং এইরূপ অবস্থায়ই সাময়িক অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে আর্থিক ক্ষেত্রে কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হয়।

অতীত দর্শন—পরিকল্পনার কার্যকারিতা সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে উপযুক্ত নীতি নির্ধারণ ও উহাদের পরিমাণ বিষয়ে পরিসংখ্যান ও বিশ্লেষণ ব্যবস্থার অধিকতর উন্নতির প্রয়োজন পূর্বের তুলনায় প্রকটভাবে দেখা দিয়াছে। অতীতের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, পাঁচ বৎসরের কোনও এক বিশেষ সময়ে অর্থ বিনিয়োগ প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করা খুবই সহজ হইত। চাকুরীর ব্যবস্থা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণ এবং যে সকল কারিগরী ব্যবস্থা দ্বারা উন্নয়নের পরিমাণ করা চলে, সেগুলি মোটেই যথেষ্ট নয়।

সর্বত্র আগ্রহের সঞ্চার—প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে দেশে কৃষি ও শিল্পোৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহা ছাড়া ইহার ফলে কাঠামো ও সংগঠনগত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। পরিকল্পনা সর্বত্র আগ্রহ ও উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছে। এক্ষণে সমগ্র দেশে দ্রুত উন্নয়নের জন্য নূতন ও বিরাট চাহিদা দেখা যাইতেছে। মোটের উপর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দেশের ক্রমোন্নতির প্রথম পাদক্ষেপ। এই পরিকল্পনাকালে সম্পদ আহরণ সমস্যা ও অন্যান্য অসুবিধাগুলি প্রকটভাবে দেখা দেয় নাই। অর্থ বিনিয়োগ যথেষ্ট হারে বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন কার্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানই হইতেছে মূল কর্তব্য। এই বিবিধ কর্তব্য এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।

শাসনকর্তৃপক্ষের সহিত দেশবাসীর সম্পর্কটি কেমন করে গড়ে উঠেছে শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে তা জানতে হলে পড়ুন, **শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ প্রণীত**

'রাজা-উজীরের কথা'

বইখানি কিশোর বালক হ'তে বয়স্কদের পাঠোপযোগী—মূল্য আট আনা

প্রকাশক :

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

ভারতে পেন্‌সিল শিল্প

পেন্‌সিল শিল্প ভারতের অন্যতম সমৃদ্ধ কুটীরায়তন শিল্প। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে এই শিল্পটির প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল এই দেশের শিল্পবিদদের মনে স্বদেশীযুগের চিন্তাধারা ও শিল্প স্বাধীনতার স্বপ্ন। তখনকার দিনে তদানীন্তন সরকারের কোনরূপ সাহায্য ও সহযোগিতা এই শিল্পটি লাভ করে নাই। বৎসরের পর বৎসর নানা প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূল পরিবেশে এই শিল্পটিকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল এমন কি কখন কখন বিদেশী প্রতিযোগিতার ফলে শিল্পটি অবলুপ্তির পথেও পরিচালিত হইয়াছিল। বহু সংগ্রামের পর এই শিল্পটি সংরক্ষণের সুবিধা লাভ করে।

অবশ্য এই সব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পেন্‌সিল শিল্পটি স্বাধীনোত্তরকালে ক্রমোন্নতির সুযোগ লাভ করে। সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান ইহার সুস্পষ্ট পরিচয়। ১৯৫১ সালে ভারতে পেন্‌সিল উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২·১৪ লক্ষ গ্রোস। ১৯৫৬ সালে উৎপাদন পরিমাণ ৫·৫২ লক্ষ গ্রোসে বৃদ্ধি পায়। ইহার মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ লেড্ পেন্‌সিল, অবশ্য ১৯৫২ সালে আমদানী নীতির শিথিলতার জন্য পেন্‌সিল উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইতে বাধ্য হয়। বর্তমান উৎপাদন অনেক সময় দেশের প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত বলিয়া মনে করা হয়; কিন্তু ইহাও সত্য যে দেশের শিক্ষা বিস্তার তথা শিল্প প্রসার ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পটিকে অধিকতর সম্প্রসারণের সুযোগ দিতে হইবে। স্বয়ং সম্পূর্ণতা শিল্পক্ষেত্রে ও অবনতি অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পন্ন দেশে আর্থিক নীতির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। স্বদেশী পেন্সিলে উচ্চ মূল্য অনেক সময় আর্থিক নীতির দিক দিয়া সমর্থনযোগ্য নহে বলিয়া বিচার করা হয়। কিন্তু যতদিন না কোন একটি শিল্প সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে এবং শিল্পের সর্বপ্রকার কাঁচামাল ও সংশ্লিষ্ট উপাদান আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র হইতে সংগ্রহ করা সম্ভব না হয় ততদিন শিল্পের সামর্থ্যের দিক দিয়া উচ্চ মূল্য নীতিতে অভিযুক্ত করা সঙ্গত নহে। আজও আমাদের দেশে পেন্‌সিল শিল্পকে উপযুক্ত কাঠ আমদানী করিতে হয়। ইহা শ্লাঘার বিষয় নহে। সুতরাং একদিকে বিদেশী পেন্‌সিলের প্রতিযোগিতা অন্য দিকে কাঁচা মালের আমদানীর উপর নির্ভরশীলতা আলোচ্য শিল্পটিকে যে সমস্যা সংকুল করিয়া তুলিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। আমদানী নিয়ন্ত্রণ ও শুল্ক-সংরক্ষণ সত্ত্বেও ভারতে এখন পর্যন্ত বেশ মোটা পরিমাণে পেন্‌সিল আমদানী করা হয়। নিম্নের তালিকা হইতে ভারতের আমদানী ও ভারতে উৎপাদিত পেন্‌সিলের একটি হিসাব পাওয়া যাইবে।

(হাজার গ্রোস হিসাবে)

বৎসর	আমদানী	আভ্যন্তরীন উৎপাদন		মোট
১৯৫১	২৮৯·৫৬	২১৪·৫৩	=	৫০৪·০৯
১৯৫২	৩৭২·৪৭	১৭২·৪৪	=	৫৪৪·৭১
১৯৫৩	২৭৮·৭২	১৯০·৮০	=	৪৬৯·৫২
১৯৫৪	১৩২·১৪	২৮৭·৮৮	=	৪২০·০২
১৯৫৫	১৭২·২০	৪০০·৬৭	=	৫৭২·৮৭
১৯৫৬	১২৬·৯২	৫৫২·৩৪	=	৬৭৯·২৬

পেন্‌সিল শিল্পটির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলেও ইহাদের পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা এখনও কাজে লাগানো সম্ভব হয় নাই। ভারতের পেন্‌সিল শিল্পটি যদি একটি শিফ্‌টে ৩০০ দিন কাজ করে তবে ১৫ লক্ষ গ্রোস পেন্‌সিল উৎপাদন করিতে পারে। ১৯৫৬ সালে এই শিল্পটি পূর্ব পূর্ব বৎসর অপেক্ষা সর্বাধিক উৎপাদন করিয়াও মাত্র ৪০ ভাগ উৎপাদন ক্ষমতাকে কাজে লাগাইতে পারিয়া-

ছিল। কোন শিল্পের ৬০ ভাগ নিষ্ক্রিয় ক্ষমতা বাঞ্ছনীয় কিনা তাহাই চিন্তার বিষয়। ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন শাখাকে এই সম্পর্কে অবহিত হইতে হইবে। এবং আলোচ্য শিল্পটির সর্বাঙ্গিন উন্নয়নের জন্য সুপরিকল্পিত কর্মসূচী প্রণয়ণ করিতে হইবে; অন্যথায় শিল্পটির ভবিষ্যৎ সংকটাপন্ন হইবে। প্রকাশ যে আরও কয়েকটি পেন্‌সিল শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে। যেখানে বর্তমান কারখানাগুলি তাহাদের সম্পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারিতেছে না সেখানে আরও কয়েকটা নূতন সৃষ্টির সার্থকতা নেই বলিয়া মনে হয়। সম্প্রসারিত অর্থনৈতিক কাঠামো কোন নূতন শিল্পে আবির্ভাব প্রতিরোধ করা বাঞ্ছনীয় নহে, কিন্তু তদুদ্দেশ্যে ১৯৫০ সালে শিল্প আইনে যে সমস্ত নীতি ও নিয়মের কথা বলা হইয়াছে সেইগুলি পুংখানুপুংখরূপে অনুসরণ করা উচিত।

কাঁচামালের অসুবিধার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। জাতীয় গবেষণাগার ইতিমধ্যেই ভারতের গ্রাফাইট্ হইতে পেন্‌সিলের সীসার তৈয়ারী জন্য একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র বসাইয়াছেন। এখানকার গবেষণা সার্থক হইলে পেন্‌সিল শিল্পের জন্য আবশ্যক মত গ্রাফাইট্ পাওয়া যাইবে, আশা করা যায়। দেরাদুনের বন গবেষণাগার পেন্‌সিলের কাঠের জন্য অনুরূপ গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। অন্যান্য কাঁচামাল সম্পর্কে যদি সুপরিচালিত গবেষণা নির্দিষ্ট হয়, তবে শিল্পটি সহজে স্বয়ং সম্পূর্ণ ও আত্ম-নির্ভর হইয়া উঠিতে পারিবে। পেন্‌সিল শিল্পের পক্ষে গুণ ও মানের গুরুত্ব কম নহে। আমরা নিম্নে Eagle পেন্‌সিল কোম্পানীর রিসার্চ ডিরেক্টার ডাঃ চেস্‌লারের উক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

One of the most baffling things, for my opinion, is that so old an industry as pencil making could continue in business without the establishment of world standards of writing grade, so that anybody who wanted a IH drawing pencil, for example, could choose one of many makes and be assured the writing grade is the same. "Each manufacturer of drawing pencils maintains his own set of drawing pencils within reasonable limits as to writing grade but his grading does not conform to grading of other manufacturers.".

পেন্‌সিল শিল্পের পক্ষে এই উক্তিটি সবিশেষ প্রনিধানযোগ্য। ভারতে পেন্‌সিল শিল্পের প্রয়োজনে বৈদেশিক বিশেষজ্ঞের সাহায্য ও পরামর্শ উন্নতির আর একটি সোপান। কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় ও উদ্যমে ইহা সম্ভব হইলে শিল্পটির অগ্রগতি ত্বরান্বিত হইবে। যতদূর জানা যায় ভারতে সরকার এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত আলাপ আলোচনা চালাইয়াছেন। জার্মানী, যুক্তরাজ্য ও জাপানের সহিত অনুরূপ আলোচনা চালাইতে আমরা ভারত সরকারকে অনুরোধ করি। ইহা ছাড়াও পেন্‌সিল শিল্পে বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটি সামগ্রিক সমীক্ষাকার্য পরিচালনা করা প্রয়োজন। পেন্‌সিল শিল্প সমিতির উদ্যমেও ইহা পরিচালিত হইতে পারে। ভারতীয় পেন্‌সিলে প্রধান ক্রেতা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার। কিন্তু ইহাদের ক্রয়-নীতি ও মূল্য প্রদান ব্যবস্থা বিশেষ বিলম্বিত হওয়ার ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ক্ষুদ্র শিল্পের টাকা অল্প কোথাও আটকাইয়া পড়িলে শিল্পের স্বচ্ছ গতি ব্যাহত হয়। সুতরাং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ক্রয় নীতি শিল্পের স্বার্থে সংশোধিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভারতের পেন্‌সিল শিল্প ব্যক্তিগত উদ্যমে পরিচালিত যে যুগে যে চিন্তাধারায় এই শিল্পটির পত্তন হইয়াছিল, যে সংগ্রাম, যে সংকট ও দুর্দিন অতিক্রম করিয়া এই শিল্পটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জাতীয় কল্যাণে ইহার সর্বাঙ্গীন সমৃদ্ধি যাহাতে হয় তাহার জন্য আমরা সমস্ত সংশ্লিষ্ট পক্ষকে অনুরোধ করি।

আর্থিক দিগ্‌দর্শন

তথ্যসেবী

আসামের তৈল শোধনাগার—আসামের তৈল শোধনাগার লইয়া কিছুদিন ধরিয়া বাক্‌বিতণ্ডা ও আন্দোলন চলিতেছিল। সম্প্রতি আসামের অর্থমন্ত্রী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে আসাম সরকারই নিজস্ব অর্থে একটি শোধনাগার স্থাপন করিবেন। কিন্তু এই শোধনাগার স্থাপন করিবার জন্য কি কেন্দ্রীয় সরকার আসাম সরকারকে লাইসেন্স প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন অথবা আসাম সরকার তাহা অমান্য করিয়াই করিবেন? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি গেওখালিতে দ্বিতীয় জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপনের জন্য অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন? ভারত সরকার, মনে হয়, গেওখালির দাবী উপেক্ষা করিয়া পরাদ্বীপ অথবা কোচীনে জাহাজ নির্মাণের কারখানা স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। গেওখালিতে জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপন করিলে (১) রাউলকেল্লা হইতে ইস্পাতের চাদর পাওয়া যাইবে। (২) খড়্গপুর কলিকাতা লাইন হইতে জলবিদ্যুৎ পাওয়া সহজ হইবে। (৩) পরাদ্বীপ হইতে (মহানদীর মোহানা) অন্ততঃ তিনশত মাইল রেলপথ নির্মাণ করিতে হইবে কিন্তু পাঁশকুড়া হইতে মাত্র ২৫ মাইল রেলপথ নির্মাণ করিলেই গেওখালি পাঁশকুড়ার মধ্যে সংযোগ সাধন সম্ভব হইবে। ইহা ছাড়া রাণীগঞ্জের কয়লা, রূপনারায়ণ, গঙ্গা ও দামোদরের জলপথের সহজলভ্যতা ও কলিকাতার মত বিস্তৃত এবং সুসংগঠিত আর্থিক বাজারে নৈকট্য ও পারস্পরিক সুবিধা গেওখালিকে আদর্শ জাহাজনির্মাণ ক্ষেত্রে পরিণত করিতে পারিবে। তথাপি ভারত সরকার গেওখালির অনুকূলে মত প্রকাশ না করিয়া বিকল্প স্থাপনের সন্ধান করিতেছেন। আমরা বুঝিতে পারিতেছি না যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আসামের পথানুসরণ করিবেন কি না!

দুর্গাপুর কোক চুল্লী পরিকল্পনা—সম্প্রতি ভারত সরকার বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্কটের সমাধান হিসাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে সরকার ক্ষেত্রে শিল্প উন্নয়নের প্রয়োজন যে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হইবে তাহা লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, পরিবহন ও যাতায়াত শিল্প সম্প্রসারণের প্রয়োজনে ব্যয় করা বন্ধ রাখিতে হইবে। কিন্তু অনেকেই অবগত আছেন যে হার্ড কোক প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত না হইলে ইস্পাত উৎপাদন আশানুযায়ী সম্ভব হইবে না। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে দেখা যাইতেছে যে কোক কয়লার অভাবই ইস্পাত শিল্পের অন্তরায়। ভারত সরকার কোক কয়লা প্রস্তুত ও কয়লার উপজাত দ্রব্য তৈয়ারী করিবার জন্য দুই জায়গায় দুইটি কারখানা স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। একটি মধ্যপ্রদেশে ভিলাই কয়লা খনির নিকটে এবং অন্যটি বোম্বাইএর সন্নিকটে কল্যাণ।

যদিও ভিলাই অপেক্ষা রাউল কেল্লা কোক প্রস্তুতের উপযুক্ত স্থান তথাপি কেন্দ্রীয় সরকার কোরবা খনির কয়লা হইতে কোক প্রস্তুতের জন্য ভিলাইকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। কল্যাণ সম্পর্কে মনে হয় স্থানটি কয়লার উপজাত দ্রব্য প্রস্তুতের পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত স্থান কারণ কয়লার উপজাত দ্রব্য হইতে যে সকল রং ও রসায়ণ কল্যাণে প্রস্তুত করিবার পরিকল্পনা হইয়াছে তাহার কাঁচা মাল যে কোন কোক চুল্লী কারখানা হইতে অন্ততঃ ৫০০ মাইল রেলপথে লইয়া যাইতে হইবে। ইহা ব্যয় সাপেক্ষ এবং অপচয়ের সামিল।

* * *

এই প্রসঙ্গে দামোদর উপত্যকার দুর্গাপুর অঞ্চল উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানে কোক কয়লার প্রাচুর্য দুর্গাপুর কোক চুল্লীর সান্নিধ্য, কেন্দ্রীয় সরকারের ইস্পাত কারখানার নৈকট্য সহজেই ১৬ লক্ষ টন কোক কয়লা প্রস্তুতের সম্ভাবনার সৃষ্টি করিবে। সুতরাং কয়লার উপজাত দ্রব্যের এত প্রাচুর্য সত্ত্বেও দুর্গাপুরে ভারী রসায়ণ রং ও নানাবিধ কয়লাজাত দ্রব্যের কারখানা কেন নির্মিত হইবে না তাহা আমাদের বুদ্ধির অজ্ঞাত। যে কোন অর্থনীতির ছাত্র ইহা বুঝিতে পারে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা বিশারদগণ তাহা বুঝিতে পারেন না কেন ইহা কে বলিবে? ইতিপূর্বেই দুর্গাপুর কোক চুল্লী কারখানা হইতে নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুতের পরিকল্পনা গৃহীত

হইয়াছে, তথাপি কয়লার উপজাত কাঁচা মাল যাহা রসায়ণ শিল্পের জন্য প্রয়োজন তাহা প্রচুর পরিমাণে উদ্বৃত্ত থাকিবে। National Industrial Development Corporation এই ধরনের শিল্পায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন সুতরাং দুর্গাপুরের অনুকূলে উক্ত কর্পোরেশন এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে সুবিবেচনার কাজ করিবেন। (স্থানাভাবে আর্থিক দিকদর্শন সম্পূর্ণ প্রকাশ করা সম্ভব হইল না বলিয়া দুঃখিত)।

গ্রন্থ-পরিচয়

ভারতীয় অর্থবিদ্যা—দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীঅরুণ কুমার সেন, অধ্যক্ষ, সিটি কলেজ, (বাণিজ্য বিভাগ। প্রকাশক—সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৪৷৷০ মাত্র।

আলোচ্য গ্রন্থখানি ভারতীয় অর্থবিদ্যার দ্বিতীয় খণ্ড। এই গ্রন্থে ভারতের শিল্প উন্নয়ন ও বিভিন্ন শিল্পের বর্ণনা, শিল্প-নীতি, সংরক্ষণ-নীতি সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য ও শিল্পক্ষেত্রে অবদান ও বিভিন্ন শিল্প সংস্থার পরিচয়, শিল্প, শ্রমিক, পরিবহন, ব্যবসা-বাণিজ্য,ভারতের আর্থিক অবস্থার গতিপ্রকৃতি এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিশদ আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বইখানির বৈশিষ্ট্য এই যে ১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেট ও কর-ব্যবস্থার বিস্তৃত আলোচনা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। ভারতীয় অর্থনীতি দ্রুত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীল পরিবেশে অর্থনীতির পুস্তকগুলি যদি সম্পূর্ণ আধুনিকতম তথ্যে সংকলিত না হয়, তাহা হইলে ছাত্রদের নিকট তাহা আদরণীয় হয় না। সেদিক দিয়া অরুণবাবুর গ্রন্থখানি বিশেষ উপযোগিতার সৃষ্টি করিবে এবং ছাত্রদের সমস্ত অনুসন্ধিৎসা দূর করিবে। আমরা সমস্ত বি. এ., বি. কম ছাত্রদের পড়িতে অনুরোধ করি।

The First Decade—August 15, 1957, August 15, 1957.
A symosium ccmmemorating Tenth Au niversay of Indian Independence. Edited by Clifford Maushhardt. Published by The United States Information Service, 1957.

আলোচ্য পুস্তকখানি ভারতের স্বাধীনতার দশটি বৎসরে বিভিন্নক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হইয়াছে তাহার সুষ্ঠু আলোচনা। এই সম্পর্কে United States Information Service অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সুষ্ঠু আলোচনা ও নিরপেক্ষ মতবাদ বিভিন্ন প্রবন্ধের মারফতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই সংকলিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। বইখানির ভূমিকা লিখিয়াছেন 'এলস্ ওয়ার্থ বাঙ্কার।' ইনি ভারতের যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতিনিধি। শ্রীকানাইয়া লাল মানিকলাল মুন্সী, পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীগুলজারী লাল নন্দ, কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী ডাঃ পাঞ্জাব রাও দেশমুখ, শ্রীমতী হংসে মেহতা, অধ্যাপক সি. এন. ভকিল ও বি. সি. দেশাই, লেঃ কর্ণেল সি. কে লক্ষণন্ ও শ্রীমতি হান্না কুমারী সেন ও শ্রীমতি তারাআলীবেগ এই গ্রন্থের লেখক। বইখানিতে ভারতের অগ্রগতি সম্পর্কে যে সুষ্ঠু আলোচনা হইয়াছে তাহা সকলেরই সমাদর লাভ করিবে। বইখানির উপযোগিতা আমরা স্বীকার করি। বইখানির ছাপা ও বাঁধায় সুরুচিপূর্ণ প্রকাশনার সুষ্ঠু পরিচয়। আমরা ইহার জন্য উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানাই।

'বর্তমান'
সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যামূলক শিক্ষণীয় পাক্ষিক পত্রিকা
প্রতি সংখ্যা—দুই আনা
কার্যালয় : ১৮।২বি, ডালিমতলা লেন, কলিকাতা-৬

আর্থিক সংবাদ

পণ্যদ্রব্যের সাপ্তাহিক পাইকারী মূল্যমান—ভারত সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে (১৯৩৯ সনের মার্চ মাসের শেষাবধি এক বৎসর = ১০০) পণ্যদ্রব্যের পাইকারী দরের যে সাপ্তাহিক সূচক সংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, গত ২০শে জুলাই (১৯৫৭) পর্যন্ত উহা শতকরা ০·৭ হারে বৃদ্ধি পাইয়া ১১২·১ হইয়াছে। পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহা ১১১·৩ ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ে মাছ, দুধ ও কলা, কলিকাতায় পিয়াজ, পাটনায় আলু, চা এবং জোয়ারের মূল্য হ্রাস পাইলেও মাদ্রাজে কমলালেবু, দিল্লীতে পিয়াজ, কানপুরে আলু, কলিকাতায় দুধ, লুধিয়ানায় মাংস, বোম্বাইয়ে লবণ ও রাগী, কোচিনে নারিকেল তৈল, ভুট্টা, অরহর, গম, চাউল, সরিষার তৈল, বজরা, ঘব, মুগ ডাইল, চীনাবাদামের তৈল, চিনি, কফি, লঙ্কা ও সুপারির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্যবস্তুর সূচক সংখ্যা শতকরা ০·৭ হারে বাড়িয়া ১১১·২ হয়।

উক্ত সপ্তাহে মদ ও তামাকের সূচক সংখ্যা পূর্ববর্তী সপ্তাহের মত ৯৪·৩ থাকে। ঐ সপ্তাহে কেরোসিন তেল ও রেড়ীর তেলের মূল্য বৃদ্ধির ফলে জ্বালানী, বিদ্যুৎ ও আলো দ্রব্যাদির সূচক সংখ্যা শতকরা ০·৩ হারে বাড়িয়া ১১৪·৮ হয়। আলোচ্য সপ্তাহে হায়দরাবাদে তুলা, তুলাবীজ এ কাঁচা রেশমের মূল্য হ্রাস পাইলেও ফোজিলকায় কাঁচা রেশম, চীনাবাদাম, আসামে, কাঁচা পাট, নারিকেলের শাঁস, তিষি, রেড়ী, তিল তৈল ও রাইয়ের মূল্য বৃদ্ধির ফলে শ্রমশিল্পের কাঁচা মালের সূচক সংখ্যা শতকরা ১·৬ হারে বাড়িয়া ১২২·৮ হয়। উক্ত সপ্তাহে নারিকেলের দড়ি ও সীসার মূল্য হ্রাস পায়। অপরদিকে, তিষির তৈল, সুতা, দস্তা, তামা ও টিনের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় আধা তৈয়ারী দ্রব্যাদির সূচক সংখ্যা শতকরা ০·৫ হারে বাড়িয়া ১০৯·২ হইয়াছে। ঐ সপ্তাহে কোজিকোডে নারিকেলের খইল, সাইকেল এবং তাঁত বস্ত্রের মূল্য হ্রাস পাইলেও কলিকাতায় চীনাবাদামের খইল, ইট, টালী, মিলজাত কাপড় এবং পাটজাত দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তৈয়ারী দ্রব্যাদির সূচক সংখ্যা শতকরা ০·৪ হারে বাড়িয়া ১০৯·০ হইয়াছে।

১৯৫৬-৫৭—গত বৎসর গমের উৎপাদন শতকরা ৫·৮ ভাগ বৃদ্ধি—কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক ও পরিসংখ্যান বিভাগ সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ১৯৫৬-৫৭ সালে গম উৎপাদনের যে চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে গমের উৎপাদন শতকরা ৫·৮ ভাগ বাড়িয়াছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে মোট ৩,২৮,৯১,০০০ একর জমিতে গমের আবাদ হয় এবং ৯০,৬৮,০০০ টন গম উৎপন্ন হয়। ইহার পূর্ববর্তী বৎসরে ৩,০৩,৮৬,০০০ একর জমিতে আবাদ হইয়াছিল এবং ৮৫,৬৯,০০০ টন উৎপন্ন হইয়াছিল। কাজেই আলোচ্য বৎসরে আবাদ ২৫,০৫,০০০ একর অর্থাৎ শতকরা ৮·১ ভাগ বাড়িয়াছে এবং উৎপাদন বাড়িয়াছে ৪,৯৯,০০০ টন বা শতকরা ৫·৮ ভাগ। আলোচ্য বৎসরে গম উৎপাদক সকল রাজ্যেই, প্রধানতঃ রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার ও বোম্বাইয়ে গমের আবাদ বৃদ্ধি পায়। বীজ বপনকালে আবহাওয়া অনুকূল থাকাতেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। তবে রাজস্থানে অনেক নূতন জমিতে গমের আবাদ করা হয়। প্রধানতঃ পাঞ্জাব ও রাজস্থানেই আলোচ্য বৎসরে গমের উৎপাদন লক্ষনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে ও উৎপাদন কিছুটা বাড়িয়াছে।

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া—১। ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া উহার "ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া" নামকরণ হয়। ২। এই ব্যাঙ্কের পরিচালনা

করে একটি কেন্দ্রীয় পর্ষৎ। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় পর্ষৎ কর্তৃক নিযুক্ত একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি, শেয়ার হোল্ডারদের দ্বারা নির্বাচিত ছয়জন ডিরেক্টর, আঞ্চলিক ও আর্থিক সংস্থাগুলির প্রতিনিধি স্বরূপ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত আটজন ডিরেক্টর এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মনোনীত একজন করিয়া ডিরেক্টর লইয়া উহা গঠিত হয়। ৩। বছর পাঁচেকের মধ্যে ইহার ৪০০টি শাখা খোলা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। ২৩৪টি কেন্দ্রের তালিকা ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত করিয়াছেন। ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬৬টি শাখা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ৪। এই ব্যাঙ্কের ২০ কোটি টাকার মজুরীকৃত মূলধন ও ৫ কোটি টাকার বিলিকৃত মূলধন। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ন্যায় ইহা শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে অর্থ ঋণ দিয়া থাকে। ৫। ১৯৫৪-৫৫ সালের ১০২ কোটি ৬ লক্ষ টাকা দাদনের তুলনায় ১৯৫৫-৫৬ সালে ১৮৩ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে। ৬। ১৯৫৬-৫৭ সালে এই ঋণের পরিমাণ আরও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তপশীলী ব্যাঙ্কগুলিকে ১৯৫৬ সালের ১৪ই নভেম্বর পর্যন্ত ৭৬১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা অগ্রিম দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৫৭ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারীতে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ৮৬২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা।

ভারতের বন্দর—১। ১৯৪৭ সনে দেশ-বিভাগের পর ভারতে পাঁচটি বড় বন্দর ছিল। যথা, কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কোচিন ও বিশাখাপত্তম। ২। ভারতের ষষ্ঠ বড় বন্দর কান্দালায় নির্মাণকার্য ১৯৫৩ সনে সুরু হয়। বর্তমান বৎসরের ৩রা মার্চ তারিখে উহার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হইয়াছে। ৩। ১৯৫৫-৫৬ সনে দেশের বড় বন্দরগুলির মারফতে মোট ২ কোটি ২৫ লক্ষাধিক টন মালপত্র আমদানী রপ্তানি হইয়াছে; ১৯৫০-৫১ সনে ১ কোটি ৮০ লক্ষ ২০ হাজার টন মালপত্র আমদানী-রপ্তানি হইয়াছিল। ৪। ঐ কয় বৎসর ভারতে বড় বড় বন্দরের মারফতে খনিজ তৈল, যন্ত্রপাতি এবং লোহা ও ইস্পাতের আমদানী এবং খনিজ ধাতুর রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৫। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বন্দর উন্নয়ন বাবদ ৩০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ হয় এবং পরে উহার পরিমাণ বাড়াইয়া ৪৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা করা হয়। কিন্তু কার্যতঃ প্রথম পরিকল্পনা সময়ে ঐ খাতে মোট মাত্র ২৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়। ৬। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নূতন কার্যাদি বাবদ প্রায় ৪৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে। ঐ পরিকল্পনাকালে বড় বড় বন্দরের উন্নয়ন বাবদ, প্রথম পরিকল্পনার বকেয়া অর্থসহ মোট ৭৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে। ৭। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ভারতের ৬টি বড় বন্দরের নানাবিধ উন্নতি সাধন করিয়া উহাদের মারফতে মালপত্র আমদানী রপ্তানির পরিমাণ প্রায় ৩০ শতাংশ হারে বাড়ান যাইবে।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়নার্থ অর্থ সাহায্য—কয়েকটি পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ত্রিপুরা সরকারকে ১৯ লক্ষ ৩ সহস্রাধিক টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী হুগলীর যান্ত্রিক পুতুল নির্মাণ শিক্ষা কেন্দ্র, শিশুদের উপযোগী জুতা ও জুতার লেসের কারখানা এবং কাঞ্চননগর ও ঘুমের ছুরি কাঁচি শিল্পের কাজ চালাইয়া যাইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে ৬ লক্ষ ৪০ সহস্রাধিক টাকা ঋণ ও প্রায় ২২ সহস্র টাকা সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছে। বিভিন্ন পরিকল্পনা অনুযায়ী জুতা, চামড়ার মনিব্যাগ ও হ্যাণ্ডব্যাগ, চীনামাটির বাসনপত্র, তুষ হইতে চারকোল, সাইকেলের যন্ত্রাংশ ও অ্যালুমিনিয়ামের দ্রব্যাদির উৎপাদন এবং শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সংরক্ষণ ও বিপণন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বিহারকে প্রায় ৯ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা ঋণ ও প্রায় ৭৪ হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছে। ত্রিপুরার অরুন্ধতী নগরে আদর্শ কাঠের কারখানা ও কামারশাল এবং ধর্মনগরে আদর্শ কাঠের কারখানা চালাইবার জন্য রাজ্য সরকারকে ২ লক্ষ ১৬ সহস্রাধিক টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

১৯৫৬-৫৭ সনে কৃষি উৎপাদন—ভারত সরকারের খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সঙ্কলিত হিসাব অনুযায়ী জানা যায় যে, পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ১৯৫৬-৫৭ সনে দেশে গম, যব, তামাক, যোয়ার ও বজরা, অরহর ডাইল ও চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি ও শুকনা লঙ্কার উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে।

আলোচ্য বৎসর সমগ্র ভারতে মোট ৩,২৮,৯১,০০০ একর জমিতে ৯০,৬৮,০০০ টন গম উৎপন্ন হয়; পূর্ববর্তী বৎসর ৩,০৩,৮৬,০০০ একর জমিতে ৮৫,৬৯,০০০ টন উৎপন্ন হইয়াছিল। উক্ত বৎসর দেশে ৮৫,৯৪,০০০ একর জমিতে ২৭,৪৪,০০০ টন যব উৎপন্ন হয়; পূর্ববর্তী বৎসর ৮৩,৮১,০০০ একর জমিতে ২৭,৪৯,০০০ টন উৎপন্ন হইয়াছিল।

ঐ বৎসর ভারতে ৯,০০,০০০ একর জমিতে তামাকের চাষ হইয়াছে; পূর্ববর্তী বৎসর ৮,৪৭,০০০ একর জমিতে উহার চাষ হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসর সমগ্র ভারতে মোট ৬,৮৮,৫৬,০০০ একর জমিতে ১,০০,৫৩,০০০ টন জোয়ার ও বজরা উৎপন্ন হয়! পূর্ববর্তী বৎসর ৭,০৯,২৮,০০০ একর জমিতে ৯৯,৮১,০০০ টন উৎপন্ন হইয়াছিল। উক্ত বৎসর দেশে মোট ৫৬,৯৬,০০০ একর জমিতে ২০,৪৭,০০০ টন অরহর ডাইল উৎপন্ন হয়; পূর্ববর্তী বৎসর ৫৬,৩৭,০০০ একর জমিতে ১৮,৩০,০০০ টন উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ বৎসর ভারতে মোট ২০ লক্ষ ৫০ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে; পূর্ববর্তী বৎসর ১৮ লক্ষ ৬০ হাজার টন উৎপন্ন হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসর দেশে ১৪,৫০,০০০ একর জমিতে ৩,৫৪,০০০ টন শুকনা লঙ্কা উৎপন্ন হয়; পূর্ববর্তী বৎসর ১৪,৯০,০০০ একর জমিতে ৩,৫৫,০০০ টন উৎপন্ন হইয়াছিল।

রেশম চাষ সম্বন্ধে গবেষণা ও শিক্ষা ব্যবস্থা—রেশম চাষ বিষয়ে গবেষণা ও শিক্ষণ ব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে দুই লক্ষাধিক টাকা সাহায্য দিবেন। মহীশূর সরকারের রেশম চাষ পরিকল্পনা অনুসারে ঐ রাজ্যে একটি রেশম চাষ শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। আসামের দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, অন্ধ্র প্রদেশের দুইটি বিদ্যালয় এবং মাদ্রাজে সালেম জেলায় বোর্ডের পরিচালনাধীন সমস্ত বিদ্যালয়ে রেশম চাষ শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে। কয়েকটি পরিকল্পনা অনুযায়ী আসামের বিজ্ঞান বিষয়ের স্নাতকগণ এবং মধ্যপ্রদেশের দশজন রেশম চাষীকে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হইবে। উত্তর প্রদেশের ছাত্র ও শিক্ষকগণ এবং আসাম রাজ্যের রেশম চাষ দপ্তরের অফিসারগণকে ও এই উদ্দেশ্যে রাজ্যের বাহিরে পাঠান হইবে। এই পরিকল্পনাগুলির জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগণকে ৮৬ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। ওঁটিপোকা পালন, সুতা কাটা ও রীলে সুতা জড়ান প্রভৃতি বিষয়ে উন্নত ধরণের পদ্ধতি প্রদর্শনের কয়েকটি পরিকল্পনার জন্যও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। বিহারে ২০টি এরি পোকা পালন কেন্দ্রকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইতে থাকিবে। আসামে রেশম সুতা রীলে জড়ান বিষয়ে শিক্ষা ও উৎপাদনের জন্য একটি কেন্দ্র স্থাপিত হইবে এবং এই বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য একটি ভ্রাম্যমাণ দল গঠন করা হইবে। তসর সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য উড়িষ্যাতে ও তিনটি ভ্রাম্যমাণ দল গঠিত হইতেছে। অন্ধ্র প্রদেশে বিকসুরের শিক্ষণ ও প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠানটির কাজ চলিতে থাকিবে। এই সমস্ত পরিকল্পনার জন্য ৮৫ হাজারের বেশী টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

মহীশূরের রেশম চাষ বিভাগের পরিসংখ্যান শাখাটির কাজ চলিতে থাকিবে এবং এই উদ্দেশ্যে ৩ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। রেশম চাষ সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য উড়িষ্যা, মহীশূর এবং উত্তর প্রদেশকে ৩০ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে। উড়িষ্যায় বহু আসান গাছ আছে। সেজন্য সেখানে তসর শিল্পের উন্নয়নের বিরাট সম্ভাবনা আছে। তসর উৎপাদনের নানা বিষয় লইয়া গবেষণা করা হইবে। একটি প্রাথমিক বীজ কেন্দ্র স্থাপিত হইতেছে। যে গবেষণা অফিসার এই কেন্দ্রের কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিবেন তাঁহাকে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য জাপানে পাঠান হইবে। রেশম কীটের পুষ্টি সম্পর্কে মহীশূরে গবেষণা করা হইবে এবং উত্তর প্রদেশের কেন্দ্রীয় জমি গবেষণা ও সার পরীক্ষা প্রতিষ্ঠানে জমি ও সার সম্বন্ধে গবেষণা করা হইবে।

চিনির উৎপাদন—কেন্দ্রীয় খাদ্য এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের চিনি ও বনস্পতি অধিকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, বর্তমান মরশুমের ১৫ই জুলাই পর্যন্ত ভারতে ২০ লক্ষ ১৮ হাজার টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছে। গত বৎসর এই সময়ে ১৮ লক্ষ ৫৩ হাজার টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছিল। রপ্তানিকৃত চিনির পরিমাণ সহ মোট ১৪ লক্ষ ৯৩ হাজার টন চিনি ১৫ই জুলাই পর্যন্ত ব্যবহৃত হইয়াছে এবং বিভিন্ন কারখানাতে ১০ লক্ষ ৪৯ হাজার টন চিনি মজুত রহিয়াছে।

রেশম শিল্পী সঙ্ঘ

বাংলার খাঁটী রেশমের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান

প্রধান কার্য্যালয় ঃ—১৪নং হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

আজ হতে শতবর্ষ আগে সিপাহী বিদ্রোহ দ্বারা যে স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা, সংগ্রামলব্ধ সেই স্বাধীনতার দশম বার্ষিকীতে বাংলার ঐতিহ্যবাহী শুদ্ধ রেশম বস্ত্রাদি আপনার প্রিয়জনের জন্য আশাতীত সুবিধাজনক মূল্যে ক্রয় করুন।

- টাকা প্রতি পাঁচ আনা রিবেট। (খাদি বোর্ডের নিয়মিত ১/০ আনা রিবেট ও অতিরিক্ত বিশেষ রিবেট ৵০ আনা ১৫ই আগষ্ট হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত
- নূতনতম ডিজাইনের মুর্শিদাবাদী ছাপা শাড়ী, গরদের সাটিং, কোটিং, ভেলর, মটকা, বাপ্‌তা প্রভৃতির সাড়ম্বর আয়োজন।
- পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিল্প বিভাগের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় উৎপাদিত।
- কেন্দ্রীয় খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত।

খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র ঃ—

১৫৯।১, রাসবিহারী এভেনিউ, (গরিয়াহাট মোড়ের নিকট, হিন্দুস্থান মার্টের সংলগ্ন) কলিকাতা।

৯৩নং মহাত্মা গান্ধী রোড, (কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের নিকট, গ্রেস সিনেমার পাশে) কলিকাতা।

ডায়াপেপ্‌সিন

হজমের ব্যতিক্রম হইলে পাকস্থলীকে বেশী কাজ করান উচিত নহে। যাহাতে পাকস্থলী কিছু বিশ্রাম পায় সেরূপ কার্য্যই করা উচিত ডায়াপেপ্‌সিন সেই কার্য্যই করিবে। পাকস্থলীর কার্য্য কতক পরিমাণে ডায়াপেপ্‌সিন বহন করিবে এবং খাদ্যের সারাংশ লইয়া শরীরে বল আনিবে। শরীরে বল আসিলেই পাকস্থলীও বল লাভ করিবে ও তখন খাদ্য হজম করা আর তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইবে না। ডায়াপেপ্‌সিন ঠিক ঔষধ নহে, দুর্ব্বল পাকস্থলীর একটি প্রধান সহায়ক মাত্র।

ইউনিয়ন ড্রাগ
কলিকাতা

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক নবগৌরাঙ্গ প্রেস, ১০৪, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিঃ, ৯ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Who's Who of Arthik Prasanga.

PATRONS

Dr. P. N. Banerjea, Late Minto Professor of Economics, Calcutta University and formerly, member Indian Legislative Council.

Sri Arun Kumar Sen, Principal, City College, Commerce Department. Member, Academic Council Calcutta University.

Sri Bimal Chandra Sinha.

Sri S. C. Dey, President, Federations of Small & Medium Industries.

Sri B. K. Bhattacharya, Director, Union Drug Co. Ltd.

Sri S. Maitra Managing Director, Sulekha works Ltd.

Prof. Kesabeshwar Basu, Member of the Senate Calcutta University.

Sri T. Ghose, Director, Bureau of Industrial Statistics.

Dr. Dasrathi Banerjee, General Manager, National Rubber Manufacturers.

Sri J. P. Podder, Jaipuria Brothers Ltd.

EDITORIAL COUNCIL

Principal Sri Khagendranath Sen, President. Prof. Himanshu Roy.

Prof. Sris Chandra Das, Vice President.
" Prabhat Sarbadhikary.
" Ushanath Banerjee.
" Nirmalkumar Roy.
" Anath Bandhu Dutta
Sri Suresh Prasad Neogy
" Hemaranjan Basu.
" P. Agarwala.

Prof. D. Mukherjea, Editor.

Associated Editors.

Sri Achil Bandopadhyay. Sri Sukendu Bikas Dey

ADVISORY BOARD

Prof. Phaindranath Bhattacharjee, Surendranath College, Com. Dept.
" Rabindranath Sengupta, City College & Calcutta University.
" Santilal Mukherjee, City College.
" Amiya Banerjee, City College.
" Jitendra Krishna Mitra, Calcutta University.
" Ajit Kumar Das, City College & U. P. A.
" Lalit Kumar Mitra City & Belur College.
" Shyamsundar Banerjee, Vidyasagar College.
" Sachhidananda Ghose, Scotish Church College.
" Sudhir Kumar Mukherjee, City College.
" Sudin Bhattacharya, Victoria & City College.
" Arun Banerjee, City & Scotish Church College.
" D. P. Choudhuri, City College.
" Benoy Sarker, City College.
" Kastur Chand Lalwani, Institute of Technology, Kharagpur.
" Swadesh Bhusan Bhuniya, City College.
Sri Soroj Roy, Agent, Hind Bank.
" Prakiti Ranjan Bhadhuri.
" Radindra Nath Bhattacharya Asst. Editor, Municipal Gazette.
" Abhas Dasgupta, Formerly of Commercial Section, Jugantar.
" B. N. Ghosal, Banerjea & Co.
" Gour Bhattacharya Advertising Organiser.

Hony Auditors : M/s. Ghose Nandy & Co.

REGISTERED No. C 3462

লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৪

পরিচয়

পৃথিবীর ধনী-দরিদ্রের মাথা পিছু আয়

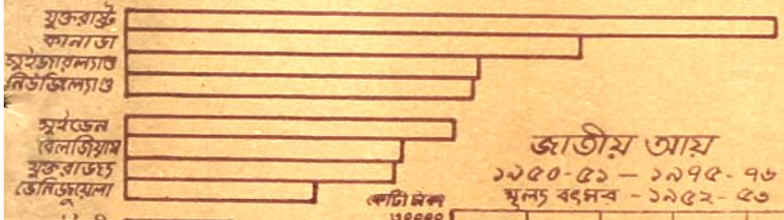

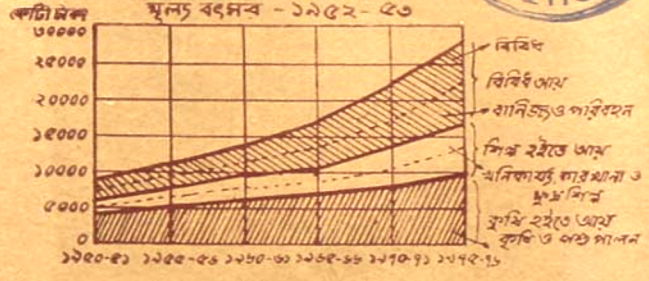

সুলেখা

ফাউন্টেনপেন কালি

ভারতে সর্বাধিক
বিক্রয়ের গৌরব অর্জন
করেছে

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বে • মাদ্রাজ

লক্ষ্মী ঘি'য়ে
লক্ষ্মীশ্রী

॥ লক্ষ্মীদাস প্রেমজী · কলিকাতা ॥

বলার মতো কাহিনী

আমাদের কথা পাঁচজনকে বলবার মতই। দেশের শিল্পোন্নতির ইতিহাসে আমরা একটা বিশেষ অধ্যায় জুড়ে আছি। ১৯৪৬ সালে আমাদের কারখানা থেকেই ভারতের রিং স্পিনিং ফ্রেম তৈরী হয়। তারপর আরও অনেক প্রথম তৈরীর কৃতিত্ব আমরা অর্জন করেছি—যেমন, ল্যাঙ্কাশায়ার বয়লার ও ওয়াটার টিউব বয়লার। রূপার বাঁধে ভারতের কয়েকটা বৃহত্তম আকারের স্লুইস গেট তৈরি করেছি আমরাই। হীরাকুদ বাঁধের বিরাট বিরাট পাইপগুলিও আমরাই জুগিয়েছি। ভারতের রেলপথের জন্য নানারকম পরিবহন সরঞ্জাম ও লোকোমোটিভ বয়লার আমরা তৈরী করে থাকি। সিমেন্টে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক যন্ত্রপাতি তাও তৈরি করেছি আমরা। চিনি ও পাট শিল্পের জন্য যাবতীয় যন্ত্রপাতি আমরা তৈরী করতে সুরু করেছি। দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের জন্য বিভিন্ন উপকরণাদি আমাদের কারখানায় তৈরী হচ্ছে। আন্তর্জাতিক নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী ও পৃথিবীর সেরা কলাকৌশলের সহযোগিতায় আমাদের প্রত্যেকটি যন্ত্রপাতি তৈরী হয়। এইভাবে ভারতের মৌলশিল্পের সহায়তায় টেক্সম্যাকো নিয়োজিত আছে।

টেক্সটাইল মেশিনারী কর্পোরেশন লিমিটেড

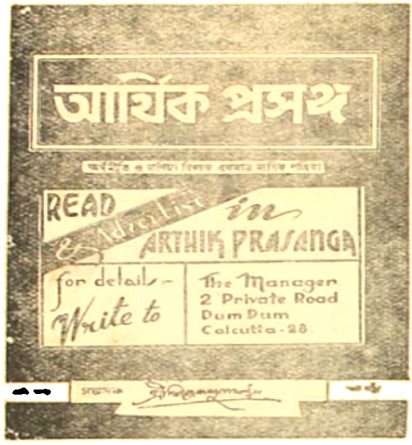

বার্ষিক চাঁদা—৭৷৷০ টাকা
ষাণ্মাসিক চাঁদা—৪৲ "
ছাত্রদের জন্য ঃ—
বার্ষিক—৬৲ ষাণ্মাসিক—৩৷৷০ টাকা
এই সংখ্যার মূল্য—দশ আনা।

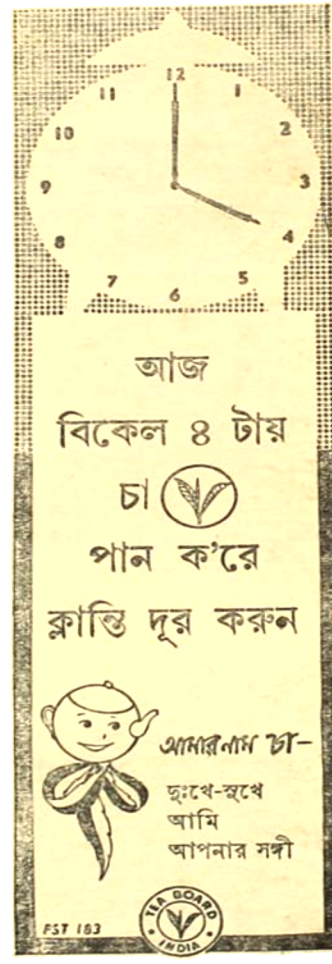

প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্ত পরিষ্কার করবে!

যে পদার্থ রোগের সংস্পর্শে শরীর ও মস্তিষ্ক গঠিত হয়, রক্ত প্রবাহের মাধ্যমেই তাদের পুষ্টিলাভ করে; তাই রক্তকে প্রাণরক্ষার প্রধান উপাদান বলা হয়। সেই রক্তই যখন দূষিত হয়ে পড়ে, তখন স্বভাবতঃই বিবিধ জটিল ব্যাধির আক্রমণে জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে।

সারিবাদি সালসা প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে আমাদের সর্বত্র সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ত শোধক মাইক্সচারূপে প্রসিদ্ধ। সারিবাদি সালসা সেবনে নিশ্চিত রোগ পরিষ্কার হয়, বেগ, পাঁচড়া, দুষ্ট ক্ষত, একজিমা প্রভৃতি সর্ববিধ চর্মরোগ, বাত ও রক্তে জীবাণু সংক্রমণের সমস্ত বিষ রোগ সম্পূর্ণ নির্মূল হয়, শরীরে ক্রিয়া স্বাভাবিক হয়, পুরাতন ও নষ্ট রক্ত এবং শরীরের পুরাতন বিষও নূতন রক্ত সঞ্চালিত হয়।

সারিবাদি ফার্মেসী

সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ত পরিষ্কারক ঔষধালয়

স্বনামধন্য ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এম-বি-এস (লণ্ডন), এফ-বি-এস (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের ভেষজবিদ্যার ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম-বি (কলিঃ), আয়ুর্বেদ-আচার্য। ৩৬নং পোস্তালপাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭

আয়ুর্বেদ ঔষধালয়

ভাগলপুর

স্থাপিত ও প্রতিষ্ঠাতা: ডাঃ

ভবিষ্যৎ কল্যাণকর একটি উপহার

জাতীয় সঞ্চয় উপহার পত্রে দু'রকম লাভ হয়ঃ

টাকা, গহনা, পোষাক ইত্যাদির তুলনায় এই উপহার পত্র গ্রহীতার মনে উপহার-দাতার স্মৃতি অনেকদিন জাগরূক রাখে।

এই উপহার কিনতে যে টাকা খরচা হয় তা দেশ ও জাতির আর্থিক নিরাপত্তার বুনিয়াদ গড়তে সাহায্য করে।

জন্মদিবস, বিবাহ, বার্ষিকী বা যেকোন আনন্দোৎসবে যখনই কোন উপহার দেওয়ার উপলক্ষ আসে তখনই জাতীয় সঞ্চয় উপহার পত্র দিন।

যে সব পোষ্ট অফিসে সেভিংস ব্যাঙ্কের কাজ হয় সেগুলির যে কোনটিতে ৫ টাকা থেকে ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত উপহার পত্র কিনতে পাওয়া যায়। এই পত্রের বিনিময়ে সম-মূল্যের ১২ বছরের জাতীয় পরিকল্পনা সঞ্চয় সার্টিফিকেট পাওয়া যায়।

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা
উপহার পত্র

DA-32/604

মাসিক সমাজ

ষষ্ঠ বর্ষ : দ্বাদশ সংখ্যা

সম্পাদক

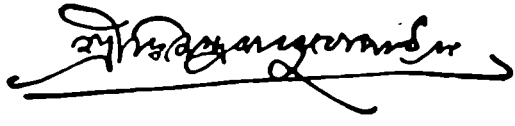

মাঘ : ১৩৬৪
জানুয়ারী—ফেব্রুয়ারী : ১৯৫৮

কার্য্যালয় :
৭/প্রাইভেট রোড, দমদম, কলিকাতা-২৮
সিটি অফিস
১০৪, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলি-৯

এই সংখ্যার মূল্য দশ আনা

প্রগতির বাণী

জাতির আশা আকাঙ্খার প্রতীক, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য হোল দেশে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। মূল ও ভারী শিল্পগুলির দ্রুত উন্নয়ন করা, খাদ্যশস্য ও কৃষি সামগ্রীর উৎপাদনে যথেষ্ট অগ্রগতি করা, জাতীয় আয় আরও বৃদ্ধি করা, কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত করা, আর্থিক শক্তি, শ্রম ও উদ্যমের সুফল আরও সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করা এইগুলিই হোল পরিকল্পনার লক্ষ্য। এই অগ্রগতির পথে বাধাগুলি প্রগতির ব্যথা ছাড়া আর কিছু নয়। জাতি এই বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম। এইসব বাধার সম্মুখীন হয়ে, পরিকল্পনাকে সফল করে তোলার জন্য সমগ্র জাতিকে সেবা, সমর্পন ও উৎসর্গের মনোভাব নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে।

প্রগতির ও সমৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনাকে সফল করে তুলুন

"আমাদের দেশকে পুনর্গঠিত করা একটা প্রধান কর্ত্তব্য এবং আমরা এই বিরাট কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করেছি। এর জন্য শুধু ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয়, আত্মোৎসর্গের মনোভাব নিয়ে বিপুল উদ্যমে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে হবে।"

— জওহরলাল নেহেরু —

শিল্প প্রসঙ্গ

ষষ্ঠ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা]

সূচীপত্র

[মাঘ ১৩৬৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
আমাদের বর্ষশেষ	৭২৩
গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার অন্তরায় ও অন্তরিয়া—অধ্যাপক অলক ঘোষের বক্তৃতা	৭২৪
১৯৫৭ সালে জীবন বীমার অগ্রগতি	৭২৫
বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকের উপর জলবায়ুর প্রভাব—শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়	৭২৬
খাদ্য পরিসংখ্যান কতটা নির্ভরযোগ্য	৭২৯
ভারতে ভূমি সংস্কার ও ভূদান আন্দোলন—শ্রীআশীষ বসু	৭৩১
তৈল শোধনাগার সম্পর্কীয় চুক্তির অর্থনৈতিক গুরুত্ব—শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত	৭৩৩
সোনারপুর আরাপাঁচ জলনিকাশ পরিকল্পনা	৭৩৫
বাংলা পরিভাষা—অধ্যাপক শ্রীমনীন্দ্রকুমার মজুমদার	৭৩৭
আন্দামানের সবুজ সম্পদ	৭৩৮
সরবতী উপত্যকায় বিদ্যুৎ উৎপাদন—শ্রী ডি, কে, শ্রীনিবাসাচার	৭৩৯
উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অভিযান	৭৪১
ভারতের হস্তচালিত তাঁত শিল্প	৭৪২
বিভিন্ন রাজ্যের তাঁতের কাপড়	৭৪৪
রেশম শিল্পী সংঘ—শ্রীমানস সেন	৭৪৬
ভারতের শিল্পায়নের সূত্রপাত—শ্রীমনুভাই শাহ	৭৪৮
কৃষি-শিল্প বাণিজ্য প্রসঙ্গ	৭৫০
আর্থিক দিক দর্শন—তথ্যসেবী	৭৫৪
আর্থিক সংবাদ	৭৫৮

সৌন্দর্য্যে ও সংরক্ষণে

ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেণ্ট য়্যাণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা : আসানসোল : শিলিগুড়ি : মাদ্রাজ

শিক্ষার তাৎপর্য

শিক্ষার তাৎপর্য হচ্ছে প্রধানতঃ চরিত্র গঠন, দ্বিতীয়তঃ জ্ঞান অর্জন, তৃতীয়তঃ চিন্তার উৎকর্ষতা সাধন যার দ্বারা জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়। আপনি যদি এই তিনটা সম্মানের অধিকারী হ'ন, তাহলে আর কিছু থাক বা না থাক বাকি যা কিছু সহজেই আপনি গড়ে নিতে পারবেন। সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করবার সময় কেবলমাত্র যে বড় বড় পরিকল্পনাই আমাকে আকৃষ্ট করে তা নয়, তার চেয়েও বেশী আমায় আকর্ষণ করে মানুষ বিশেষতঃ তরুণ সম্প্রদায়।

আমি জানি না ভবিষ্যৎ বংশধরেরা কি ভাবে চলবে। কিন্তু যদি আমার উপদেশ চাওয়া হয় তবে আমি তাদের স্মরণ করতে বলবো যে চারিত্রিক উৎকর্ষ ছাড়া কোন দেশেরই মানুষ উন্নতি করতে পারে না।

জহরলাল নেহেরু

(কলিকাতা ছাত্র সমাজের নিকট বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত)

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা উন্নয়ন

	১৯৪৭	১৯৫৬
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১৩৭০২	২২,৫৮৪
নিম্ন বুনিয়াদি শিক্ষালয়ের সংখ্যা	—	৪৯২
নিম্ন উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা	৯৮৫	১,৬১৪
উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা	৭৬১	১,৫৫৬
কলেজের সংখ্যা	৫১	৯৫
শিল্প বিষয়ক বিদ্যালয় ও কলেজের সংখ্যা	৯০	১৬৫
প্রাপ্ত বয়স্কের শিক্ষা-কেন্দ্রের সংখ্যা	৪১২	৩,৩৬৮

সরকারি শিক্ষা খরচ খাতে ১৯৪৭ সালে ২'৯৭ কোটী টাকা বরাদ্দ থেকে ১৯৫৭-৫৮ সালে ১১,১১৩৭০০০৲ টাকা শিক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে যাতে অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। এই ভাবে দুষ্ঠ শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা ও শিক্ষা বিস্তারের

মধ্য দিয়েই গড়ে উঠবে

সোনার বাংলা

জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

৫৮-২৯-৪৫

আর্থিক প্রসঙ্গ

ষষ্ঠ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা] [মাঘ, ১৩৬৪

আমাদের বর্ষশেষ

আর্থিক প্রসঙ্গ ছয়টি বৎসরের প্রদক্ষিণ শেষ করিল। দীর্ঘ ছয়টি বৎসর পৃথিবীর প্রদক্ষিণের পথে অতি সংক্ষিপ্ত হইলেও মানুষের জীবনে তাহা নিতান্ত তুচ্ছ নহে। ছয়টি বৎসরের অভিজ্ঞতা নিতান্ত সামান্য নহে, নগণ্যও নহে। গতানুগতিক ও তথাকথিত সভ্য জীবনের সহিত শিষ্টাচার সম্পন্ন বাস্তব জীবনের কতখানি প্রভেদ, কতটুকু পার্থক্য, বাস্তবতার কষ্টিপাথরে বহুমূল্য অভিজ্ঞতা দিয়া তাহা যাচাই করিতে হয়। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা অমূল্য সম্পদ। সেই সম্পদের বিনিময়ে মানুষের শুভ্র আবরণের অন্তরালে সভ্যতা ও কৃষ্টির আভরণের নেপথ্যে যে মানুষটির প্রত্যক্ষ দর্শন পাওয়া যায়, মানুষ হিসাবে তাহার প্রকৃত মূল্য কতটুকু তাহা জানিতে পারা যায়! বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মানব সভ্যতার এক চরম মুহূর্তে সভ্যতার পরম সংকট সময়ে মানুষের প্রত্যক্ষ পরিচয় ও নেপথ্য কার্যকলাপের যে অসাম্য, অভিজ্ঞতা দিয়া লাভ করিয়াছি, তাহাতে সভ্যতার সার্থকতা সম্পর্কে মন সংশয়াকুল হইয়া উঠে।

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা মানুষেরই সৃষ্টি। সেই গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন দেশে সভ্য মানুষের বিকৃত চিন্তার যে পরিণতি আজ সভ্যতাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহার অবসান ঘটিবে কি না জানি না! সভ্যতার এই সংকট মানুষ অতিক্রম করিতে পারিবে কি না জানি না!

আমাদের কর্মপ্রচেষ্টার পরিধির মধ্যে যে মানুষকে দেখিয়াছি তাহাকে সর্বদাই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছি —ইহাও যেমন সত্য নহে, তেমনি তাহাকে সর্বক্ষণই ঘৃণার পাত্র বলিয়া মনে হইয়াছে, হেয় মনে করিয়া উপেক্ষা করিতে পারিয়াছি, ইহাও তেমনি সত্য নহে। আর্থিক প্রসঙ্গ একখানি ক্ষুদ্র বাংলা পত্রিকা। বাঙ্গালীর ধীশক্তির খ্যাতি আছে, প্রতিভার পরিচয় সুবিদিত, কর্মদক্ষতার তীক্ষ্ণতা সম্পর্কে কেহ সন্দেহ করে না, কিন্তু এতগুণ সত্ত্বেও সঞ্জীবচন্দ্র নিজে বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীর পরিচয় দিতে গিয়া লিখিয়াছেন, "বঙ্গবাসীমাত্রেই সজ্জন; তাহাদের প্রতিবাসীরা কলহপ্রিয়, ঈর্ষাপরায়ণ, সজ্জন-বিদ্বেষী" ইত্যাদি। আর্থিক প্রসঙ্গ বাংলা পত্রিকা হইয়া প্রতিবেশী বাঙ্গালী শিল্পবিদ, ব্যবসায়ী, ধনী ও বণিক সমাজে যতটুকু সমাদর লাভ করিতে পারিত, তাহার একটু ভগ্নাংশ পাইলেও ইহার সমৃদ্ধির কোন অন্তরায় ঘটিত না। তবে ইহা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে, শ্রদ্ধা-করুণা, স্নেহ-ভালবাসা ও অনুগ্রহ একেবারেই লাভ করে নাই, তাহা বলিলে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হইবে। যে সব ক্ষেত্রে ইহার সমাদর লাভ করিয়াছে, সেখানে ইহা নিতান্তই আপন জনের মত একাত্মতা লাভ করিয়া অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সেই সব ক্ষেত্র-পরিধি যেমন উদার, তেমনি আয়তনে ক্ষুদ্র। বাঙ্গালী সমাজের যে স্বতঃস্ফূর্ত উদারতা ইহাকে একখানি প্রথম শ্রেণীর অর্থনৈতিক পত্রিকায় রূপায়িত করিতে পারিত, অথচ তাহা সম্ভব হয় নাই বলিয়াই অত্যন্ত দুঃখে আজ এই কথা বলিতে হইতেছে। কোন উদ্দেশ্য লইয়া আমরা এই উক্তি করিতেছি না; কোন অভিসন্ধিও ইহার পশ্চাতে

নাই। শুধু নিজেদের অভিজ্ঞতার ও সংগ্রাম-ক্লিষ্টমনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র। প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করিলে আমরা কৃতজ্ঞ বোধ করিব।

প্রসঙ্গ ক্রমে বাঙ্গালী পরিবেশের বাহিরে আর্থিক প্রসঙ্গ যে ভাবে সমাদৃত হইতেছে তাহার উল্লেখ করিতে গিয়া এই কথাই মনে হয় বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী বিরোধ নিতান্তই পারিবারিক কলহের মত। তাহা যদি না হইত তাহা হইলে আর্থিক প্রসঙ্গ তাহাদের নিকট যোগ্য স্থান পাইত না। এইজন্য বর্ষ শেষে আজ তাহাদের নিকট আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতা অকুণ্ঠ ভাবে জানাইতেছি।

আজ বর্ষশেষে যে সকল শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আমরা সহযোগিতা, সাহায্য, উপদেশ ও অকুণ্ঠ স্নেহ-শ্রদ্ধা পাইয়াছি তাঁহাদের নিকট আমাদের একান্ত কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। আমরা আশাকরি তাঁহারা পূর্বাপর আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রাখিবেন।

গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার অন্তরায় ও অসুবিধা

অধ্যাপক অলক ঘোষের বক্তৃতা

আর্থিক প্রসঙ্গের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সাম্প্রতিক সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক শ্রীঅলক ঘোষ ভারতের মত অনুন্নত দেশে গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার অন্তরায় ও অসুবিধা সম্পর্কে একটি সুন্দর বিশ্লেষণ মূলক আলোচনা করেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতা সম্পর্কে বলেন যে ভারতের দ্বিতীয় পরিকল্পনা অতিরিক্ত উচ্চাশাসম্পন্ন। ভারতে কৃষিকর্মের উপর নির্ভরশীল জনগণের দিনগত-পাপক্ষয় জীবন যাত্রার চিরাচরিত প্রথার অবসান না ঘটাইয়া দেশের শিল্পোন্নতির ব্যাপক প্রচেষ্টা ভুল হইয়াছে। অধ্যাপক ঘোষ অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর সহিত শিল্প সম্পন্ন দেশের তুলনা করেন এবং বলেন, অনুন্নত দেশে শিল্প প্রগতির প্রেরণা সরকারের নিকট হইতে আসা উচিত। গভর্ণমেণ্ট সেক্ষেত্রে দেশের সামর্থ্য অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন ও ক্ষেত্র বিশেষের অগ্রাধিকার নির্ণয় করেন। পরে তদনুযায়ী কলা-কৌশল প্রয়োগ করেন। দ্রুত শিল্পোন্নয়নের জন্য মুখ্যতঃ তিনটি পর্যায়ে ইহা সাধন করিতে হয়। প্রথমতঃ ভিত্তি রচনা; দ্বিতীয়তঃ ইহার পরিচালন এবং তজ্জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন এবং তৃতীয়তঃ ইহার সুষ্ঠু অগ্রগতি সম্পর্কে প্রগতিশীল নীতি অনুসরণ।

ভারতের দ্বিতীয় পরিকল্পনার সমালোচনা করিয়া অধ্যাপক ঘোষ বলেন যে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ প্রথম পরিকল্পনাকালেই কৃষি উন্নতি ও অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের ফলে ভিত্তি রচনার কাজ সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে তাঁহারা দ্রুত শিল্প প্রসারের কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের কথা, প্রথম পরিকল্পনায় যথারীতি কৃষিশস্য ও খাদ্য উৎপাদন স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করে নাই এবং এই অসম্পূর্ণতার মধ্যে প্রকৃতপক্ষেই এইরূপ আশাবাদী দ্বিতীয় পরিকল্পনা গ্রহণের কোন সুযোগ ছিল না। ইহাই আমাদের পরিকল্পনার গোড়ায় গলদ। তিনি আরও বলেন যে পরিকল্পনা রচনার সময় বৈদেশিক মুদ্রা পরিস্থিতি সম্পর্কে যথাযথ বিচার বিবেচনা করা হয় নাই।

পরিকল্পনায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সম্পর্কে অধ্যাপক ঘোষ বলেন যে তিনটি পদ্ধতি অবলম্বনের দ্বারা

পরিকল্পনা অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয় যথা—(১) রাষ্ট্রীয় ব্যয়-নীতি—অর্থাৎ সরকারকে ব্যয় বরাদ্দের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করিতে হইবে, (২) মূলধন সংগঠন ও (৩) সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যকারণগুলির পর্যালোচনা ; গণ সহযোগিতা ও জনগণের উদ্যমের প্রেরণা লাভ করা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য ডাঃ বিনোদ বিহারী দত্ত এই সভার সভাপতি ছিলেন, তিনি জোর দিয়া বলেন যে, পরিকল্পনার একটা মানবিক দিক আছে এবং যদি দেশের লোক পরিকল্পনার জন্য স্বেচ্ছায় কাজ করিতে উদ্যোগী না হয় তবে পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ সম্ভব নহে। শ্রীআশুতোষ দাসগুপ্ত, অধ্যাপক শান্তিরঞ্জন সেন, অধ্যাপক শ্যামসুন্দর ব্যানার্জি, অধ্যাপক নির্মল বোস, অধ্যাপক মুকুন্দ বিহারী মিত্র, শ্রীসুধীর বোস, এ্যাডভোকেট্, ডাঃ এন্, সি, ভট্টাচার্য এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। আর্থিক প্রসঙ্গের সম্পাদক অধ্যাপক বিজেন মুখার্জী অতিথিদের জলযোগে আপ্যায়িত করেন।

১৯৫৭ সালে জীবন বীমার অগ্রগতি

১৯৫৭ সালে জীবন বীমা কর্পোরেশনের বীমা সম্পর্কিত হিসাব-নিকাশ লক্ষ্য করিয়া আমরা বলিতে পারি যে জীবন বীমা ব্যবসায়ে এই সংস্থাটি আশানুযায়ী অগ্রসর লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ১৯৫৬ সালে ভারত সরকার ভারতের সমস্ত বেসরকারী জীবন বীমা কোম্পানীকে রাষ্ট্রায়ত্ত আনিয়া জীবন বীমা কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সময় হইতে জীবন বীমা কর্পোরেশন দেশের বীমা ব্যবসায় সুষ্ঠু উন্নয়নের জন্য এবং বীমা ব্যবসায়ের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করেন। ১৯৫৭ সালে ভারতে জীবন বীমা ব্যবসায়ের পরিমাণ ২৫৬ কোটি টাকার মত হইয়াছে। জীবন বীমা ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্ত হইবার পূর্বে ১৯৫৪ সালে সর্বাধিক বীমা ব্যবসায়ের পরিমাণ ছিল ২৩৬ কোটি টাকা। সুতরাং বেসরকারী হাত হইতে বীমা ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্তে আনিয়া কোনরূপ ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য ১৯৫৬ সাল হইতে আজ পর্যন্ত জীবন বীমা ব্যবসায়কে নানারূপ অনিশ্চয়তা ও বাধা-বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে! ধীরে ধীরে এই সকল অন্তরায় অতিক্রম করিয়া একটা স্থায়িত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে, ইহাই আনন্দের কথা। ইহা হইতে আশা করিতে পারা যায় যে জীবন বীমা কর্পোরেশন এই ভাবে ক্রমোন্নতি লাভ করিবে এবং দেশবাসীর পরম আস্থাভাজন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে।

জীবন বীমা কর্পোরেশনের উপর অত্যন্ত দুরূহ দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে। এই দায়িত্ব শুধু সরকারী কর্তব্যপালন ও নির্দিষ্ট নীতি-পদ্ধতি অনুসরণ নহে, বিরাট দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সফল রূপায়নের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ মেয়াদী সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে লগ্নীর উৎস সৃষ্টি করা। যাহাতে ভারতে শিল্প ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ মূলধন সরবরাহ করিয়া ভারতের শিল্প বাণিজ্য তথা অর্থনৈতিক কাঠামোকে সুদৃঢ় ভাবে গড়িয়া তোলা সম্ভব হয় তাহারই উদ্দেশ্যে জীবন বীমা কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সেই উদ্দেশ্য সার্থক করিয়া তোলাই জীবন বীমা কর্পোরেশনের প্রকৃত সার্থকতা।

ভারতে জীবন বীমা কর্পোরেশন ইতিপূর্বেই যেমন জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে, তেমনি লগ্নীর ত্রুটি-বিচ্যুতি লইয়া কঠোর সমালোচনারও সম্মুখীন হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় সংস্থার লগ্নীর ক্ষেত্রে এই গাফিলতি দেশবাসীর মনে অসন্তোষ উদ্রেক করিয়াছে এবং বীমা পত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগের সঞ্চার

করিয়াছে। ইহা বীমা ব্যবসায়ের সুষ্ঠু প্রসার ও ক্রম-প্রগতির পক্ষে অন্তরায়। আমরা আশা করি জীবন বীমা কর্পোরেশন ইহার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থাকিবেন এবং দেশবাসীর আস্থা ও বিশ্বাস যে রাষ্ট্রীয় সংস্থার পক্ষে পরম সম্পদ, ইহা ভুলিবেন না।

জীবন বীমা কর্পোরেশনের কার্যকলাপের উপর দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরোক্ষ প্রভাবের গুরুত্বও কম নয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা জনিত ঘাটতি ব্যয় দেশে যে মুদ্রা-স্ফীতির সৃষ্টি করিয়াছে, জীবন বীমা ব্যবসা দেশবাসীর জনপ্রিয়তা লাভ করিলে দেশের একটা উল্লেখযোগ্য উদ্বৃত্ত অর্থ জীবন বীমারূপে নিয়োজিত হইবে। বীমাপত্র ধনী-দরিদ্র সকলকেই ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে। জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বীমা পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি ও বীমার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে সরকার উদ্বৃত্ত অর্থ সহজেই টানিয়া লইতে সমর্থ হইবে।

ভারতবর্ষ সমাজতান্ত্রিক উপায়ে অর্থনৈতিক সংগঠন পদ্ধতি অনুসরণ করিতেছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশের সর্বশ্রেণীর মধ্যে নিরাপত্তা বিধান ও অর্থনৈতিক সাম্য সৃষ্টি করা সরকারের কর্তব্য জীবন বীমা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যদি সর্বশ্রেণীর লোককে বাধ্যতামূলক বীমাপত্র গ্রহণে উৎসাহিত করা যায়, তবে দেশবাসীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা যেমন হ্রাস পাইবে তেমনি তাহাদের আর্থিক সমৃদ্ধি দেশের অর্থ নৈতিক বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিবে। এই দুরূহ কর্তব্য সম্পন্ন করার দায়িত্ব ভারত সরকার ও জীবন-বীমা সংস্থা উভয়েরই। সুতরাং জীবন বীমার দ্রুত অগ্রগতি উল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

বস্ত্র শিল্পের শ্রমিকের উপর জলবায়ুর প্রভাব

শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়

ইহা সুবিদিত যে নাতিশীতোষ্ণ দেশের জলবায়ু শিল্পের সমৃদ্ধির উপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। ক্রান্তীয় দেশ সমূহে ইহাই আবার অন্তরায় সৃষ্টি করে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শ্রম ও ও স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয়ের যৌথ প্রচেষ্টায় ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতের বস্ত্র শিল্প সমূহের উপর তাপনিয়ন্ত্রণের প্রভাব কতখানি, তজ্জন্য একটি সমীক্ষা কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল। আমেদাবাদে কাপড়ের কলগুলিতে এই পরীক্ষা কার্য চালানো হইয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্র কারিগরী সহযোগিতা মিশন, আমেদাবাদ বস্ত্র শিল্প গবেষণা সমিতি, ভারতীয় ভেষজ-গবেষণা পর্ষদ এবং অন্যান্য কয়েকটি সংস্থার সহযোগিতায় এই পরীক্ষা কার্য চালানো হয়। যুক্তরাষ্ট্র কারিগরী সহযোগিতা মিশন দুইজন বিশেষজ্ঞ পাঠাইয়াছিলেন। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডক্টর উইলিয়ম এফ এ্যাসে এবং শিল্প স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এডওয়ার্ড জে. লারজেন্ট। ইহাদের দুইজনের সাহায্যে বিশদভাবে সমীক্ষা কার্য চালানো হয় এবং ইহাদের সুপারিশ ও সমীক্ষা কার্য পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়। "Report on Thermal Stress in the Textile Industry" এই পুস্তকখানির নাম।

কারখানার অভ্যন্তরে উত্তাপের তারতম্য অনুযায়ী শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতার কিরূপ তারতম্য ঘটে, আলোচ্য সমীক্ষা কার্যের সিদ্ধান্তে তাহাই বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক অনুশীলন দ্বারা বিভিন্ন দেশে যে সকল তথ্য পাওয়া গিয়াছে তাহাতে এই মূল নীতি প্রমাণিত হইয়াছে যে উচ্চ তাপের ফলে শ্রমিকদের রোগ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, আকস্মিক ঘটনার সংখ্যা বাড়ে

এবং উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়। যে সমস্ত কাজ হাতে সম্পন্ন হয় যেমন এণ্ড প্রস্তুত প্রভৃতি প্রথমতঃ সেই সব কাজের উপরই উত্তাপের প্রভাব পরীক্ষা করা হয়। তাহার ফলে উৎপাদন ক্ষমতা, কাজের গতি এবং কাজের সময়ে বিশ্রামের কতখানি প্রয়োজন তাহার নিরীক্ষা হয়। এইসব কাজের সমীক্ষায় কুশলী শ্রমিকের কাজের উপর উত্তাপ বা আর্দ্রতার প্রভাবের সম্পর্কের কোন বিচার হয় নাই। এই ধরণের কাজ পরীক্ষার দ্বারা ইহাদের উৎপাদন সময়ের প্রয়োজন এবং বিশ্রামেরও প্রয়োজন পরীক্ষা করা হয় এবং দেখা যায় অন্যান্য প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন শব্দ ও ধূলা-বালির প্রভাব এই সব কাজের ক্ষেত্রে দূর করা সম্ভব। সাইক্রোমেট্রিক চেম্বার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজের পর্যবেক্ষণের জন্য নির্মাণ করা হয়। এই ঘরের ভিতর দুইজন করিয়া লোক লইয়া কাজ করিবার ব্যবস্থা করা হয় এবং তাহাদের প্রত্যেকের কাজের উপর কি কি প্রভাব লক্ষিত হইয়াছে তাহা নিরীক্ষা করা হয়। ১লা আগষ্ট হইতে ২৭শে আগষ্ট পর্যন্ত এই পরীক্ষা কার্য চালানো হয়। এই সময়টি বর্ষাকাল এবং এই সময়টির আবহাওয়া উষ্ণ এবং অতিরিক্ত আর্দ্রতায় পরিপূর্ণ থাকে।

এই বৈজ্ঞানিক অনুশীলন কার্য পরিবর্তনশীল জলবায়ুর ছয়টি পৃথক অবস্থার মধ্যে বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখা হয়। সর্বাপেক্ষা উত্তাপসম্পন্ন অঞ্চল ছিল আমেদাবাদ। ড্রাই বাল্‌ব্‌ এবং ওয়েট বাল্‌ব্‌ টেম্পারেচারের সাহায্যে ছয়টি বিভিন্ন কেন্দ্রে সাইক্রোমেট্রিক চেম্বারের ভিতর এই ফলাফল গ্রহণ করা হয়। এই সময়ে চেম্বারের বাহিরের উত্তাপ কৃত্রিম উপায়ে বৃদ্ধি করা হয়; যাহাতে চেম্বারের অভ্যন্তরস্থ নিম্ন তাপের প্রভাব কাজের উপর অনুশীলন করা যায় সেই উদ্দেশ্যে পর্যবেক্ষক দল তিনটি রেখা-চিত্র অংকন করিয়াছেন এবং তাহাতে ড্রাই বাল্‌ব্‌, ওয়েট বাল্‌ব্‌ এবং সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছিত উত্তাপের ফলাফল দেখানো হইয়াছে। ওয়েট বাল্‌ব্‌ টেম্পারেচার গ্রহণ করার ফলে দেখা গিয়াছে যে অতিরিক্ত উত্তাপের মধ্যে ঠাণ্ডা বাতাস কেমন করিয়া মানুষকে শান্ত করে এবং কতখানি সহনশীল তাপের মধ্যে মানুষ সহজে কাজ করিতে পারে। এই অংকন চিত্রগুলির সাহায্যে উৎপাদন, উৎপাদনের পরিমাণ, হার, এবং বিশ্রামের গুরুত্বের উপর জলবায়ুর প্রভাব কতখানি তাহা দেখানো হইয়াছে। এই পরীক্ষা কার্যের জন্য ওয়েট বাল্‌ব্‌ টেম্পারেচার গৃহীত হইয়াছিল। পরিসংখ্যানের সাহায্যে নিম্নের তালিকায় পরীক্ষার ফলাফল দেখানো হইল :—

উৎপাদন ক্ষমতা, বিশ্রাম এবং কাজের গতি ও হারের উপর জলবায়ুর তারতম্যমূলক প্রভাব

এ হইতে এফ পর্যায়ে ছয়টি পরীক্ষার ফলাফল

জলবায়ু (গড় ফারেনহিট তাপ)	এ	বি	সি	ডি	ই	এফ
ড্রাই বাল্‌ব	৮৩·৩	৮৭·৪	৯৮·১	১০০·৫	৯২·২	১০·৫
ওয়েট বাল্‌ব্‌	৭৯·৬	৮২·১	৮২·১	৮৪·৩	৮৮·২	৮৭·৯
কার্যকর উত্তাপ	৭৮	৭২·১	৮৫·২	৮৭·৫	৮৭·৫	৯০·৯
উৎপাদন (৮ ঘণ্টা কার্য কালের মধ্যে)	১৭,৫৭০	১৭,৪৭০	১৭,১৮০	১৬,৮৪০	১৬,২৭০	১৫,২৭০
বিশ্রামের প্রয়োজন— শতাংশ হিসাবে (চেম্বারে ভিতরে ও বাহিরে)						
অভ্যাসজনিত	১২	১২	১২	১২	১২	১২
উত্তাপের ক্লান্তিজনিত	৩·২৮	৩·০৬	৯	৯·৯২	৮·০৯	১৪·৭

কার্যকাল—	প্রতি দশ মিনিট অন্তর এণ্ড প্রস্তুত পরীক্ষার ফল					
সকাল ৯—১০টা	৪১৭·৪	৪৭২·১	৪৭৪·১	৪৬৮·৪	৪৫৬·৯	৪৫২·৫
,, ১০—১১টা	৪৭৮·৮	৪৮৪·৮	৪৬৭·১	৪৫৩·৫	৪৩৬·০	৪৫৬·৮
,, ১১—১২টা	৪৬৩·৬	৪৬১·৫	৪৮০·১	৪৭৬·৬	৪৫৪·২	৪৩৯·৫
দুপুর ১২— ১টা	৪৫৪·৬	৪৭২·৪	৪৬১·২	৪১৪·৪	৪৫৩·১	৪৪৮·৫
বিকাঃ ১-৩০—২-৩০টা	৪৫০·৮	৪৩৯·৫	৪৬৬·৪	৪৫১·১	৪৪২·৯	৪৫৮·৫
২-৩০—৩-৩০টা	৪৭৪·৮	৪৩৭·১	৪৬৫·৫	৪৬৭·৫	৪৬৮·৪	৪৩৬·০
৩-৩০—৪-৩০টা	৪৩৯·৪	৪৪৯·৬	৪৬৬·০	৫৫৮·৫	৪২৩·৯	৪৫৪·৯
৪ ৩০—৫-৩০টা	৪২৪·৮	৪২২·৬	৪৮১·৯	৪৪১·৩	৪৩৪·৬	৪৪৬·০
গড়	৪৫৭·২	৪৫৫০	৪৭০·৩	৪৫৮·৭	৪৪৬·২	৪৪৯·১

এই সব বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের ফলে দেখা যায় যে ১০০·৫ ডিগ্রী (ড্রাই বাল্‌ব্‌) উত্তাপে উৎপাদন হ্রাস পায়, কিন্তু ড্রাই বাল্‌ব উত্তাপের সাহায্যে কোন সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব নয়। আলোচ্য তালিকায় 'ই' জলবায়ুতে দেখা যায় ৯২·২ ডিগ্রীর ড্রাই বাল্‌ব্‌ টেম্পারেচারে এবং প্রায় সমান উত্তাপ সম্পন্ন কার্যকরীর তাপে 'ডি' জলবায়ু অপেক্ষা 'ই' জলবায়ুতে ৫৮০ এণ্ড হ্রাস পাইয়াছে। 'এফ্‌' জলবায়ুতে দেখা যায় যে পর পর তিনটি জলবায়ুর প্রভাব কোনমতেই পৃথক করিয়া দেখা সম্ভব নয়; কারণ এক্ষেত্রে কার্যকর তাপ এবং ড্রাই বাল্‌ব্‌ টেম্পারেচার যখন উচ্চে তখন ওয়েট বাল্‌ব্‌ টেম্পারেচারও সর্বোচ্চে। 'ই' এবং 'ডি' এই দুইটি জলবায়ুতে দেখা যায়, যে 'ই' জলবায়ুতে উৎপাদন দ্রুতগতিতে হ্রাস পাইয়াছে যদিও 'ডি' জলবায়ুর তুলনায় 'ই' জলবায়ুতে কার্যকর উত্তাপের তারতম্য নিতান্তই সামান্য। ইহার ফলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে উত্তাপের তারতম্য যে উৎপাদনের হ্রাস বৃদ্ধি করিতে সক্ষম তাহার পরিসংখ্যানিক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

ওয়েট বাল্‌ব্‌ টেম্পারেচার সাহায্যে প্রকৃতপক্ষে উত্তাপের ক্লেশ এবং উৎপাদনের হ্রাস এই দুইটি তথ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক ধরা পড়ে। তালিকায় উল্লিখিত 'এ' 'বি' 'সি' 'ডি' চারিটী জলবায়ুতে উৎপাদনের তারতম্য নগণ্য। এই চারটি একদিকে এবং 'ই' ও 'এফ কে আর এক দিকে রাখিয়া ইহাদের উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধির বিচার-বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত নিরূপণ সম্ভব। বলা যাইতে পারে ওয়েট বাল্‌ব্‌ টেম্পারেচার শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা ঘটাইতে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী। 'ই' এবং 'এফ্‌' জলবায়ুতে উচ্চ ওয়েট বাল্‌ব্‌ টেম্পারেচার উৎপাদন হ্রাসের জন্য দায়ী। 'ই' জলবায়ুতে ৩·৮ ডিগ্রী উত্তাপ বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। এইভাবে যদি সি, ডি এবং ই জলবায়ুতে উৎপাদনের উপর তাপের প্রভাব বিচার করা হয়, তবে দেখা যাইবে যে ওয়েট বাল্‌ব্‌ টেম্পারেচার প্রকৃতপক্ষে প্রভাবশালী উত্তাপ সৃষ্টি করিতে সক্ষম। আলোচ্য পরিসংখ্যান তালিকায় উৎপাদনের তারতম্য প্রতি ১০ মিনিট এণ্ড অন্তর দেখানো হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য দুইটি। (১) কাজের গতি এবং উত্তাপের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় এবং (২) উৎপাদন হারের উপর উত্তাপজনিত ক্লান্তির প্রভাব। যদিও এই সকল পরিসংখ্যান হইতে প্রকৃত সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না তথাপি দেখা যায় যে সি জলবায়ুতে কাজের গতি সর্বাপেক্ষা বেশী। গড় উৎপাদন এই ক্ষেত্রে ৪৭০·৩ এণ্ড। বোধ হয় এক্ষেত্রে দীর্ঘকাল বিশ্রামের পর বেশী কাজ করার প্রবৃত্তি শ্রমিকদিগকে উৎসাহিত করিয়াছে। যদি সি জলবায়ুতে এই সিদ্ধান্ত সম্ভব হয় তবে ডি জলবায়ুতে—যেখানে অধিকতর বিশ্রামের সময় দেওয়া হইয়াছিল—এই নীতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহা হইলে এ জলবায়ুতে উৎপাদনের হার

সর্বাধিক হওয়া উচিত ছিল। জলবায়ুর প্রভাব জনিত শ্রমিকের শ্রান্তির দরুণ উৎপাদন হার কেন হ্রাস বৃদ্ধি পায়—দেখা যায় যে প্রতিদিনের প্রথম ঘণ্টায় যতখানি উৎপাদন হয়, দিনের শেষ ঘণ্টায় উৎপাদন তদনুপাতে হ্রাস পায়। শেষের ঘণ্টায় কাজের পরিমাণ সর্বনিম্ন। কাজের গতি বিভিন্ন সময়ে নানারকম ভুল ভ্রান্তির জন্য নানাবিধ গতি নির্দেশ করে। সাইক্লোমেটিক চেম্বারে শ্রমিকরা নির্দিষ্ট সময়ে কাজ আরম্ভ করিত এবং দেখা গিয়াছে শ্রমিকদের কোন বিক্ষোভ ও বিবাদ না থাকিলেকাজের গতি সম্পর্কে একটা স্থির নির্দেশ পাওয়া যায়। এই রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে বিভিন্নদল শ্রমিকের কার্যের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব এবং অতিরিক্ত উত্তাপ উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধির সৃষ্টি করে। ই এবং এফ্ জলবায়ুতে অন্যান্য জলবায়ু অপেক্ষা এই প্রভাব সুস্পষ্ট। সুতরাং দেখা যায় যে কাজের উপর ক্লান্তির প্রভাব ও জলবায়ুর তীব্রতার জন্য উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধি সৃষ্টি করে এবং তাহা পর্যবেক্ষণের দ্বারা বাঞ্ছিত সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব। বস্ত্র শিল্পের উপর এই ধরণের সমীক্ষা আরও ব্যাপক ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়াও ইস্পাত, কাঁচ, এ্যালুমিনিয়াম, কাগজ প্রস্তুত প্রভৃতি শিল্পে উত্তাপের প্রভাব অনেকখানি, যেখানে আইন করিয়া কারখানার কাজের অবস্থা নির্ণয়ের ব্যবস্থা আছে সেই সব ক্ষেত্রে জলবায়ুর প্রভাব অনুসারে এই সমীক্ষার সুফল গ্রহণ করা যাইতে পারে।

খাদ্য পরিসংখ্যান কতটা নির্ভরযোগ্য

ক্ষুধার্ত ব্যক্তির কাছে কতকগুলি সংখ্যার কি মূল্য আছে? কারণ তা দিয়ে ত তার পেট ভরবে না। কথাটি সত্যি। কিন্তু তাই বলে এই সংখ্যার গুরুত্ব কমে যায়নি। আজ যে খাদ্য পরিসংখ্যান সংগৃহীত হচ্ছে সেটা দিয়ে দেশের খাদ্যের চাহিদা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা করা আর সে অনুযায়ী খাদ্যোৎপাদন, সংগ্রহ, বণ্টন—এই সব নানা পরিকল্পনা রচনা করা সহজ ও সম্ভব হচ্ছে। এ না হলে দেশে খাদ্য ঘাটতি আছে না উদ্বৃত্ত যাচ্ছে এ জানা একেবারেই সম্ভব হত না। বস্তুতঃ, অজন্মা এ রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় প্রকৃত পরিস্থিতি জানতে হলে এই পরিসংখ্যান অপরিহার্য। আবার দেখুন, কৃষকরা কৃষিজাত দ্রব্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে, আপনি ক্রেতা হিসাবে ন্যায্য মূল্যে ঐ সব জিনিষ কিনছেন এটা নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান ছাড়া কি সম্ভব? কিসের উপর নির্ভর করে এই ন্যায্য মূল্য নির্ধারিত হবে।

উল্লেখযোগ্য যে, ষোড়শ শতাব্দীর ভারতে খাদ্য পরিসংখ্যান সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল। ভূমি রাজস্ব সংগ্রহের জন্য তোদরমল পাটওয়ারীদের নিযুক্ত করেন। তারাই কত জমিতে চাষ হচ্ছে আর তাতে কি পরিমাণ শস্য উৎপাদন হতে পারে তার আনুমানিক হিসাব নিয়মিতভাবে পাঠাতেন। আজ অবশ্য ভিন্ন পদ্ধতিতে এই পরিসংখ্যান সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়েছে। নানা স্থান থেকে কিছু কিছু শস্যের নমুনা ও আর ফলনের হিসাব নিয়ে মোট উৎপাদনের হিসাব করাই হলো এই পদ্ধতি। ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ আর ভারতীয় পরিসংখ্যা সংস্থা এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। আন্তর্জাতিক কৃষি সংস্থা আর কয়েকটি দেশ এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। এইভাবে যে খাদ্য পরিসংখ্যান সংগৃহীত হচ্ছে তা একেবারে নির্ভুল হয় না। শিল্পোৎপাদন, অর্থ সরবরাহ এবং ব্যাঙ্কের ঋণ দানের হিসাবের মত এটা নিভুল হয় না এ কথা ঠিক। তবে এ পদ্ধতির ক্রমশঃই উন্নতি হচ্ছে। ১০ বছর আগেকার অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে আশান্বিত হতে হয়।

গত বছর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়াতে জনসাধারণের মনে এই সন্দেহই জন্মেছিল যে, ১৯৫৬-৫৭ সালে উৎপাদন বেড়েছে বলে যে সরকারী পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছিল তা কি সত্যি। অশোক

মেহতার নেতৃত্বে যে খাদ্যশস্য তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল তারা বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার (মূল্যায়ন কার্যসূচী সংস্থা, কৃষি-অর্থনীতি গবেষণা কেন্দ্র এবং অন্যান্য বেসরকারী সংস্থাও তার মধ্যে রয়েছে) মারফত সরজমিনে তদন্ত করান। তা থেকে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, ১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় ১৯৫৬-৫৭ সালে সত্যিই উৎপাদন বেড়েছে। আরও উল্লেখযোগ্য যে, সরকারী পরিসংখ্যানের সাথে এই কমিটির সংগৃহীত পরিসংখ্যানের যথেষ্ট মিল রয়েছে।

শস্য কাটবার সময় হিসাব করা—ঠিক শস্য কাটবার সময় বেছে বেছে কিছু জমি থেকে একর প্রতি উৎপাদনের হিসাব নিয়ে তা থেকে একটা মোটামুটি হিসাব দাঁড় করান হয়। এইভাবে গড় উৎপাদনের যে হিসাব করা হয় তা প্রায় ঠিকই হয়। কোন রাজ্যের উৎপাদনের হিসাবে যদি শতকরা ২ ভাগ মাত্র ভুল পাওয়া যায় আর অধিক উৎপাদনের জায়গা থেকে যদি নমুনা সমীক্ষার তথ্য সংগৃহীত হয়ে থাকে তা'হলে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে যে খাদ্যোৎপাদনের হিসাব করা হবে তাতে ভুল নগণ্য মাত্র থাকবে।

স্বাধীনতার আগে তিনটি সূত্র ধরে উৎপাদনের পরিসংখ্যান স্থির করা হতো। এই তিনটি সূত্র হচ্ছে আবাদের পরিমাণ, সাধারণ উৎপাদনের পরিমান আর চাষের অবস্থা। কত জমিতে কোন্ শস্যের আবাদ করা হয়েছে তা ল্যাণ্ড রেকর্ড থেকে স্থির করা হতো। কোন কোন ক্ষেত্রের হিসাব সংগ্রহ করা সম্ভব হতো না। প্রত্যক্ষভাবে দেখে শস্যের উৎপাদনের পরিমাণ ধরা হতো। ১৯৪৯-৫০ সাল থেকে সরকারী প্রচেষ্টায় খাদ্যশস্যের চাষের হিসাব ক্রমে ক্রমে নির্ধারণ করা হয়েছে। আর বিভিন্ন স্থানে নমুনা তদন্তের সাহায্যে চাষ আর উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

যাতে কারো মনে কোন রকম সংস্কার না থাকে সেজন্য সর্বভারতীয় হিসাব নির্ধারণে কতগুলি প্রতিষ্ঠান জড়িত রয়েছে। চাষের পরিমাণ কত সে সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্যের রাজস্ব অফিসারেরা তত্ত্বাবধান করে থাকেন। কেবল পশ্চিমবঙ্গে নমুনা তদন্ত ব্যবস্থার সাহায্যে এই সব তথ্য সংগ্রহ করা হয়। রাজস্ব, কৃষি বা পরিসংখ্যান বিভাগে যে সব পরিসংখ্যানিক কাজ করেন তারা ফিল্ড ষ্টাফের সংগৃহীত পরিসংখ্যান পুনর্বিন্যাস করেন। তত্ত্বাবধানের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় নমুনা তদন্তের ভিত্তিতে একটা সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান পরিকল্পনা চালু করা হয়েছে। নমুনা তদন্তের অধিকর্তার অফিস বিভিন্ন রাজ্য সরকারের সংগৃহীত তথ্য তত্ত্বাবধান করেন। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে যে হিসাব তৈরি হয় তা বিভিন্ন রাজ্যের হিসাবের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই কোন একক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সর্বভারতীয় হিসাব পরিবর্তন করা বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে পরামর্শ না করে কিছু অদল বদল করা সম্ভব নয়।

সম্প্রতি কয়েক বৎসরে খাদ্য পরিসংখ্যানের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য আগের চেয়ে বেশী চেষ্টা করা হয়েছে। দু বছর আগে প্রাথমিক সংবাদদাতাদের শিক্ষণের জন্য যে কর্মসূচী তৈরি করা আরম্ভ হয়েছিল তা এখন সকল রাজ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে। পরিসংখ্যান সংগ্রহের কাজ ৩০,০০০ পাটোয়ারী, কাননগো ও অন্যান্য রাজস্ব বিভাগীয় অফিসারকে শেখানো হয়েছে। প্রধানতঃ আগের দেশীয় রাজ্যগুলিতে যে সব এলাকায় জরীপ করা হয়নি সেগুলির মানচিত্র আঁকা শেষ করা হয়েছে আর যে সব জায়গায় আগে কোন সংবাদদাতা ছিল না সেখানে সংবাদদাতা নিযুক্ত করা হয়েছে। যাতে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে কাজ হয় সেজন্য প্রাথমিক সংবাদদাতাদের কর্মপরিধি কমানো হয়েছে। আর তত্ত্বাবধানের জন্য একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

———

ভারতে ভূমি সংস্কার ও ভূদান আন্দোলন

শ্রীআশীষ বসু

বর্তমান ভারতের সর্বাধিক কঠিন ও জটিল সমস্যাগুলির মধ্যে ভূমি সমস্যা অন্যতম। তাহা ছাড়া, এই সমস্যার সহিত আরও কতকগুলি সমস্যা জড়িত থাকায় উহার সমাধান বিশেষ দুরূহ ব্যাপার। প্রথমতঃ পুরাতন ও অন্যায্য ভূমি স্বত্ব ব্যবস্থার ফলে বহু মধ্যস্বত্বভোগী এবং নিজেরা চাষ আবাদ করে না এইরূপ জমিদারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। তারপরে জমিতে অত্যধিক লোকের চাপ পড়ায় ক্রমেই জমির আকার ছোট হইতেছে। অতঃপর কৃষি সংস্কার, মাথাপিছু সর্বাধিক পরিমাণ জমি নির্ধারণ, জমি একীকরণ ও সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদ প্রভৃতি সমস্যাও রহিয়াছে। উক্ত সকল সমস্যার সমাধানের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন হইতেছে জমির সুষ্ঠু বণ্টন। ভূদান আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যও ইহাই। জোর জবরদস্তি ও রক্ত পাতের মারফতে অথবা আইন করিয়া ক্ষতিপূরণ দিয়া বা না দিয়া জমি দখল করা চলে। প্রথম ব্যবস্থাটি ঘৃণা ও বর্বর শক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত আর দ্বিতীয়টি আইন ও সরকারী অধিকারের দ্বারা সমর্থিত। কিন্তু আচার্য বিনোবা ভাবে উভয় ব্যবস্থাই পছন্দ করেন না। তাঁহার মতে, এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হইতেছে অনুকম্পা ও সৌহার্দ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া মালিকদের স্বেচ্ছায় জমির মালিকানা স্বত্ব বর্জন। তাঁহার ভূদান আন্দোলনের মূলমন্ত্র হইতেছে প্রেম, অহিংসা ও মানবীয় চেতনা।

ভূদান আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ১৯৫১ সনের এপ্রিল মাসে হায়দরাবাদের তেলেঙ্গানা পরগণার একটি গ্রামে। তখন ঐ অঞ্চলে ঘৃণা ও হিংসার প্রভাব খুবই বেশী, ভূমিহীন চাষীরা জমির জন্য আন্দোলন চালাইতেছিল, আর গরীবেরা অসহায় ও ধনীরা অনিশ্চিত অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছিল। এই সময়ে মহাত্মা গান্ধীর সুযোগ্য শিষ্য আচার্য বিনোবা ভাবে প্রেম ও অহিংসার বাণী শুনাইবার জন্য পদব্রজে ঐ গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হন। জনগণ নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করুন —ইহাই তিনি চাহিলেন। তখন একজন কাল্পনিক দৃষ্টি সম্পন্ন জমিদার তাঁহাকে এক হাজার একর জমি দান করেন। বিনোবাজী উহা গ্রামের ভূমিহীন হরিজনদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। এই সাধারণ সূচনাটীর বিরাট তাৎপর্য শীঘ্রই দেখা দেয় এবং সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি উহার উপর নিপতিত হয়। গত কয় বৎসরে বিনোবা ভাবে পদব্রজে দেশের ১৬ হাজার মাইলেরও অধিক স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং সাড়ে ৫ লক্ষ দাতার নিকট হইতে ৪২ লক্ষাধিক একর জমি সংগ্রহ করেন। ক্রমে ক্রমে শুধু একর হিসাবে নয়, গ্রামের পর গ্রাম দান স্বরূপ পাওয়া যাইতে থাকে। এইভাবে সাড়ে তিন হাজারেরও বেশী গ্রাম সংগৃহীত হয়।

'দানের' সাধারণ অর্থে স্বত্ব উৎসর্গ করা বুঝায়। কিন্তু বিনোবাজী শঙ্করাচার্যের ভাষ্য অনুযায়ী দান বলিতে 'সকলের মধ্যে বণ্টন' বুঝান। এজন্য ভূদান যজ্ঞ বলাই অধিকতর সঙ্গত। বিনোবাজী বলেন, 'দরিদ্র নারায়ণের সেবায় সকলে যথাসাধ্য দান করুন। ইহাই হইতেছে যথার্থ যজ্ঞ— আহুতি।' ভূদান ও উহার অনুরূপ অন্যান্য আন্দোলন যথা, গ্রামদান, সম্পত্তি দান, শ্রমদান, বুদ্ধি দান, জীবন দান প্রভৃতির মূল কথা হইতেছে স্বত্ব উৎসর্গ করা।

ভূদান আন্দোলন স্বেচ্ছাকৃত যত্রতত্র জমিদানের উপর গড়িয়া উঠে নাই এই আন্দোলনের দ্বারা জনগণের বিবেককে জাগাইয়া তুলিয়া বিরাট সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধ করে। বিনোবাজীর নিজের কথায় 'ভূদান আন্দোলনের আশু উদ্দেশ্য হইতেছে ভূমিহীন ব্যক্তিদের পর্যাপ্ত

পরিমাণ জমি দান। বর্তমানে ভারতে প্রায় ৩০ কোটি একর জমিতে চাষ করা হয়। উহার মধ্যে এক-ষষ্ঠমাংশ জমি পাওয়া গেলেই দেশের প্রায় ৫ কোটি ভূমিহীন ব্যক্তিদের জমির মালিক করা চলিবে। আমার বক্তব্য খুবই সহজ। সাধারণতঃ প্রতি পরিবারে পাঁচ জন লোক থাকে। তাই আমি বলিব—আমাকেও লও ও আমাকে আমার অংশ দাও—এজন্যই আমি অগৌণে এক-ষষ্ঠমাংশ জমি চাহিতেছি।'

সমালোচকেরা বলেন, ভূদান আন্দোলনের গতি খুবই মন্থর এবং এই কারণে উহাদ্বারা ভারতের ভূমি সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া, প্রায়ই দেখা যায় যে, প্রদত্ত জমি চাষোপযোগী নয় অথবা উহার সম্পর্কে বিরোধ চলিতেছে। অর্থাৎ প্রেম ও প্রীতির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া মালিক উহা দান করেন নাই; বস্তুতঃ আত্ম-সম্মান ও খ্যাতির মোটেই দান করা হইয়াছে। ইহাও বলা হয় যে, গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই সকল ভূদানকারী কাজে লাগে নাই; এই আন্দোলনে যোগ দিলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ সহজ হইবে—ইহাই তাহাদের যোগদানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

উপরোক্ত সকল সমালোচনাই অমূলক ইহা বলা চলে না। অচল মুদ্রা দানের প্রবৃত্তি কাহারও কাহারও থাকিবেই। মানুষের এই সকল হীন মনোবৃত্তি দমন করাই গান্ধীবাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। বর্তমান যুগে বিপ্লবের অনেক অপপ্রয়োগ করা হয়। সমালোচকেরা বলেন, সমাজের আমূল পরিবর্তন করার বৈপ্লবিক ক্ষমতা ভূদান আন্দোলনের নাই। কিন্তু আমার মতে, ভূমি সংস্কার ছাড়াও উহা অধিকতর বৈপ্লবিক আন্দোলন। কারণ এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হইতেছে মানব সমাজের সংস্কার; ভূমি সংস্কার নয়। ইহা মানুষের মন ও হৃদয়ের পরিবর্তন চায়। আর চায় তাহাদের মূল্য ও উদ্দেশ্য বোধের পরিবর্তন। বিনোবা ভাবে 'ভূদান আন্দোলনের উদ্দেশ্য হইতেছে ত্রিবিধ; যথা প্রথমতঃ মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন, দ্বিতীয়তঃ তাহাদের জীবন যাপনের পরিবর্তন ও তৃতীয়তঃ সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন' সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য মানুষের বাহ্যিক সমাজের পরিবর্তন আইন করিয়া করা চলে। কিন্তু মনোভাবের পরিবর্তন করিতে চাই একজন গান্ধী বা একজন বিনোবার সাহায্য।

কোন সরকারই হিংসার প্রশ্রয় দিতে পারেন না। সেইরূপ কোন সরকারই আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ছাড়িয়া একমাত্র কোনও আন্দোলনের মারফতে সুবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া গরীব ও নিপীড়িতদের সাহায্যার্থ ধনিকেরা যথাসর্বস্ব ত্যাগ করিবে—এইরূপ আশায় চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। ভারত সরকার ও পরিকল্পনা কমিশন ভূদান আন্দোলনকে সমর্থন করেন। কিন্তু তাঁহারা ইহাকে আইনের মারফতে ভূমি সংস্কার নীতির বিকল্পরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না।

বস্তুতঃ গত কয় বৎসরে ভারতে ভূমি সংস্কার সম্পর্কে এত অধিক আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে যে, অপর কোনও দেশের সহিত উহার তুলনা হয় না। কিন্তু যেমন একটি কলমের খোচায় সর্বদা আমূল পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়, সেরূপ ঐ সকল আইনের ফল পাইতেও সময় সময় দেরী হইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা চলে যে, উত্তর প্রদেশে ১৯৪৬ সনে জমিদারী উচ্ছেদ আইন পাশ হইলেও উহা কার্যকরী হয় প্রায় ৫ বৎসর পরে অর্থাৎ এক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতির অন্যতম প্রধান অন্তরায় হইতেছে সরকার ও পল্লীবাসীদের মধ্যে কার্যকরী যোগাযোগের অভাব। কোনও দলগত

সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং আইন প্রণয়ন করিয়া কোটি কোটি দেশবাসীর উৎসাহ ও উদ্দীপনা বাড়ান চলে না। কিন্তু ভূদান আন্দোলনের মত সামাজিক আন্দোলন চালাইয়া সহজেই সকলের সমর্থন পাওয়া যায় এবং এইরূপ আন্দোলনে কোটি কোটি নিপীড়িত ব্যক্তি আশার আলো দেখে। সকলের পক্ষেই এই আন্দোলনে যোগদানের সুযোগ রহিয়াছে।

কিন্তু একমাত্র ভূমিহীন ব্যক্তিদের জমি দিলেই পল্লীবাসীদের জীবন যাত্রার মান উন্নীত হইবে না। প্রাপ্ত জমির আকার লাভজনক চাষের তুলনায় কম হইতে পারে এবং চাষীদের মূলধন যন্ত্রপাতির অভাব থাকিতে পারে। এই সকল সমস্যার কথা দ্বিতীয় পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনায়ও বলা হইয়াছে। ঐ সকল সমস্যার সমাধানের জন্য উপযুক্ত আইন ও সরকারী ব্যবস্থার প্রয়োজন।

তৈল শোধনাগার সম্পর্কীয় চুক্তির অর্থনৈতিক গুরুত্ব

শ্রীআদিত্য প্রসাদ সেনগুপ্ত

সর্দার শরণ সিং হলেন কেন্দ্রীয় সরকারের ইস্পাত, খনি ও জ্বালানী দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তিনি ১৯৫৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে লোক সভায় ঘোষণা করেছেন, ভারত সরকার, বর্মা অয়েল কোম্পানী এবং আসাম ওয়েল কোম্পানীর মধ্যে ভারতীয় মুদ্রায় কোম্পানী গঠন সম্বন্ধে মতৈক্য হয়েছে। এই কোম্পানীটির উদ্দেশ্য হল নাহারকাটিয়া, হুগরিজান এবং মোরানের সংরক্ষিত তৈলক্ষেত্র থেকে তৈল উত্তোলন করা। জায়গা তিনটি হল আসামের অন্তর্গত।

৭ই ডিসেম্বর তারিখের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ষ্টেটসম্যান পত্রিকা মন্তব্য করেছেন" It is good news that tue negotiations this year between the Government of India and the Burmah Oil Company and Assam Cil Company have ended successfully. The agreement announced by Sardar Swaran Singh on Friday (i e December 6, 1957) represents a vital stage in the development of the new oilfields in Assam."

এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, ভারত সরকার এবং বর্মা অয়েল কোম্পানী কর্তৃক অনুমোদিত একটা মাঝামাঝি স্থান পর্যন্ত কাজের প্রথম পর্যায়ে পাইপ লাইন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি স্থাপন করা হবে। তারপর যখন দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ সুরু হবে তখন এই মাঝামাঝি স্থান থেকে পাইপ লাইনটি বারাউনি পর্যন্ত নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করা হবে। তবে কোন সময়ে প্রথম এবং দ্বিতীয় এই দুটো পর্যায়ের মধ্যে কোন পর্যায়ের কাজ আরম্ভ হবে সেটা ভারত সরকারই নির্ধারণ করে দিবেন।

যেদিন নাহারকাটিয়া, হুগরিজান এবং মোরান অঞ্চলে তৈলের সন্ধান পাওয়া গেছে সেদিন থেকে কোথায় শোধনাগার প্রতিষ্ঠিত হবে সে সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের তর্কবিতর্ক সুরু হয়েছে। অথচ তখনও পর্যন্ত কিভাবে তৈল উৎপাদন করা হবে সে সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি। কিন্তু শোধনাগারের স্থান নির্বাচন নিয়ে একসাথে আসাম, বিহার এবং কলকাতায় প্রবল চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। বিশেষ করে আসামে চাঞ্চল্যের মাত্রা সব চাইতে বেশী বেড়ে গিয়েছিল।

সেখানে শোধনাগার স্থাপনের জন্য দিনের পর দিন সভা এবং শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। অবশ্যি বিহারও তাঁর দাবী কিছুতেই ছেড়ে দিতে রাজী হননি যদিও সেখানে আসামের মত বিক্ষোভপূর্ণ আন্দোলন দেখা যায়নি। কলকাতায় শোধনাগার স্থাপনের অনুকূলে প্রকৃতপক্ষে কোন আন্দোলনই হয়নি। কেবলমাত্র সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে কলকাতার দাবীর সমর্থনে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। অথচ সবদিক থেকে কলকাতায় শোধনাগার স্থাপন করা খুব যুক্তিসঙ্গত এবং প্রয়োজনীয় ছিল। যেহেতু কলকাতার দাবীর সমর্থনে কোন প্রবল আন্দোলন হয়নি সেহেতু ভারত সরকার সহজেই কলকাতার দাবী অগ্রাহ্য করে দিলেন এবং বিহার ও আসামকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে দুটো রাজ্যে দুটো শোধনাগার স্থাপনের পরিকল্পনা করেছেন।

নয়াদিল্লী থেকে প্রচারিত খবরে প্রকাশ, ভারতীয় মুদ্রায় যে কোম্পানী গঠনের কথা বলা হয়েছে সে কোম্পানীর সম্মুখে দুটো প্রধান কর্তব্য রয়েছে। প্রথম কর্তব্য সম্বন্ধে আমরা আগেই আভাষ দিয়েছি অর্থাৎ দুটো পর্যায়ে একটা পাইপ লাইন প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয়তঃ এই পাইপ লাইনটিকে চালু করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী এতৎ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যবস্থা করার দায়িত্ব কোম্পানীটির হাতে ন্যস্ত থাকবে। আবার পাইপ লাইনটি স্থাপন করার উদ্দেশ্য হল দুটো। প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে তৈল উৎপাদন করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল যে, এই পাইপ লাইনটির সাহায্যে বারাউনিতে অপরিস্রুত তৈল চালান দেওয়া হবে।

প্রেস ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রচারিত খবরে প্রকাশ, প্রায় এক বছর আগে প্রাকৃতিক সম্পদের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ কে, ডি, মালব্য "gave details of the understanding, which was subject to final ratification, on which a rupee company would be formed by both parties for production of crude oil in the Naharkatiya area. In March he said that a suggested "substantial deviation" from the original proposals required further discussion. মোট কথা হল, নাহারকাটিয়া, হুগরিজান এবং মোরান অঞ্চলে তৈল উৎপাদন এবং এই তৈল পরিস্রুত করার জন্য শোধনাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে বহুদিন আগে থেকে ভারত সরকার বর্মা ওয়েল কোম্পানী এবং আসাম অয়েল কোম্পানীর সাথে আলোচনা চালাচ্ছেন। কিন্তু ১৯৫৭ সালের মে মাসে এই আলোচনা বন্ধ রাখা হল। এর কয়েক মাস পরে অর্থাৎ ১৯৫৭ সালের ১৮ই নভেম্বর তারিখে আলোচনার মাধ্যমে তৈল উৎপাদন এবং শোধনাগার সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভবপর হয়েছে। ফলে ভারত সরকার বর্মা অয়েল কোম্পানী এবং আসাম অয়েল কোম্পানীর সাথে একটা চুক্তি সম্পাদন করতে সমর্থ হয়েছেন।

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকা লিখেছেন" Some still think Calcutta would have been the best site but there should be no disposition to press this point of view unduly now that a long-delayed decision has been taken. The chief need is to get moving quickly so that early use can be made of an important addition to the country's resources in oil, an essential support of a modern economic structure."

নাহারকাটিয়া, হুগরিজান এবং মোরানের সংরক্ষিত তৈল ক্ষেত্রে তৈল উৎপাদন এবং শোধনাগার সম্বন্ধে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে সে চুক্তির অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছে। প্রথম প্রশ্ন উঠেছে শোধনাগারের সংখ্যা সম্বন্ধে। অর্থাৎ একটা শোধনাগারের স্থলে

দুটো শোধনাগার স্থাপনের ব্যবস্থা করা সমীচীন কিনা সেটা ভালভাবে বিবেচনা করে দেখা দরকার। মনে হচ্ছে, দূরবর্তী দুটো স্থানে শোধনাগার তৈরী এবং পরিচালনা করলে যথেষ্ট খরচ পড়বে। ফলে তৈলের মূল্যও কিছুটা চড়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিবে। যে তৈল আসাম অয়েল কোম্পানীতে উৎপন্ন হয়ে থাকে সে তৈল দ্বারা আসামের প্রয়োজন হয়ত মেটান যেতে পারে! বিহারেও অবাধ্যি তৈলের প্রয়োজন আছে। তবে সে প্রয়োজন আসামের প্রয়োজনের তুলনায় তেমন বেশী যায়। অথচ অন্যদিকে কলকাতায় এবং কলকাতা থেকে যে সব অঞ্চলে তৈল সরবরাহ করা হয়ে থাকে সে সব অঞ্চলে তৈলের চাহিদা খুব বেশী। এই চাহিদা মেটাবার জন্য বারাউনি কিম্বা আসাম থেকে তৈল আনাতে হলে খরচ বেশী হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। প্রচারিত খবরে প্রকাশ, যে তৈল ভারতীয় মুদ্রায় গঠিত কোম্পানী উৎপাদন করবেন সে তৈল কি ভাবে বিক্রী করা হবে সে সম্পর্কেও একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়েছে। অর্থাৎ ভারত সরকারের উদ্যোগে সরকারী খাতে স্থাপিত দুটো পরিশোধনাগারকে তৈল বিক্রী করতে হবে। শুধু তাই না। পরিশোধনাগার দুটো কলকাতায় ডেলিভারী খরচ সমেত সর্ব্বনিম্ন যে দামে তৈল পেতে পারেন কিম্বা কোম্পানীর উৎপাদন খরচ সমেত যুক্তিসঙ্গত লাভ নিয়ে যে দাম দাঁড়ায়, এর মধ্যে যেটা কম পরিশোধনাগারকে সে দামে তৈল দিতে হবে।

ভারত সরকারের ইস্পাত, খনি এবং জ্বালানী দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সর্দার শরন সিং বলেছেন, বর্মা অয়েল কোম্পানী ভারতীয় মুদ্রায় গঠিত কোম্পানীকে এক কোটি ষ্টার্লিং ঋণ দিতে চেয়েছেন। পাইপ লাইন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা সম্পর্কীয় প্রথম পর্য্যায়ের কাজ বাবদ যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দরকার হবে সেটা যাতে পাওয়া যায় সেজন্য এই ঋণ দেওয়া হচ্ছে তবে কি সর্তে এই ঋণ দেওয়া হবে সেটা কোম্পানী এবং ভারত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

সোনারপুর আরাপ্যাচ জলনিকাশ পরিকল্পনা

বাঙলা নদীনালার দেশ। বঙ্গবিভাগের পর যদিও বাঙলার অধিকাংশ নদী পাকিস্তানের মধ্যে পড়েছে, পশ্চিম বাঙলার নদীসংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। এইসব নদী জলনিকাশের এক একটি প্রশস্ত পথ। পশ্চিম বাঙলার দক্ষিণাংশের নদীগুলিতে জোয়ার ভাঁটা খেলে। এইসব নদীর জল জোয়ারের সময় দুকুল ছাপিয়ে আশেপাশে পলি ফেলে দিত কিন্তু নানাবিধ বাঁধ বাঁধায় এবং অন্য নানা কারণে কয়েকটি নদী তীরস্থ জমিতে আর পলি ফেলতে পারত না ফলে নদীবক্ষে পলি পড়ে পড়ে নদীর তলদেশ এত উঁচু হয়ে পড়েছে যে জায়গায় বড় বড় চাষের জমির আর জলনিকাশ হয়না সেগুলি ক্রমে পঙ্কভূমি বা পাঁকের ডাঙ্গা হয়ে পড়ে। সেখানে কোনরকম চাষও চলে না বা মাছের ভেড়ী করাও যায় না।

কলিকাতা থেকে ১২।১৩ মাইল দূরে, ২৪ পরগণা জেলার সোনারপুর ও বারুইপুর থানার মধ্যে এই রকমের একটি প্রকাণ্ড জলাভূমি বা পঙ্কভূমি গড়ে উঠেছিল। তিন চারফুট পাঁকের উপর এক দেড় ফুট জল। এই ভূখণ্ডের উত্তরে বিদ্যাধরী নদী ও আদিগঙ্গা; পূর্বে মাতলানদী; দক্ষিণে পোর্টক্যানিং, উত্তরভাগও বারুইপুর এবং পশ্চিমে বারুইপুর-গড়ে রোড। এই জলাটির

বিস্তৃতি ১০৫ বর্গমাইল জুড়ে। এই স্থানটি বরাবর এরকম পঙ্কভূমি বা জলাভূমি ছিল না—পঁচিশ বছর আগেও এখানে নানাবিধ শস্যের সুন্দর সুন্দর ক্ষেত ছিল এবং প্রচুর শস্য জন্মাত। কলিকাতার বৃষ্টি ধোয়ানিজল ময়লাজল ফেলে ফেলে বিদ্যাধরী, মাতলা, পিয়ালি প্রভৃতি নদীর তলদেশ এত উঁচু হয়ে গেল যে এই নদীগুলি আর আশপাশের জলনিকাশ করতে পারল না এবং এই বৃহৎ জলাভূমিটি তৈরি হ'ল! এই জলাভূমির কল্যাণে ম্যালেরিয়া ও নানাবিধ ব্যাধি ভীষণরূপে চারপাশে দেখা দিল। এইসব নদীতে কলিকাতার জলনিকাশ ব্যবস্থা করাও অসম্ভব হয়ে পড়ল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ১০৫ বর্গমাইল ব্যাপী জমিটির জলনিকাশের ব্যবস্থা করে এইটিকে পুনরায় চাষের উপযোগী করার মনস্থ করেন এবং সোনারপুর আরাপ্যাচ পরিকল্পনার পত্তন হয়। বঙ্গবিভাগের পূর্বে বৃহত্তর কলিকাতার জলনিকাশ সমস্যা সমাধান করার জন্য নিয়োজিত একটি বিশেষজ্ঞ সমিতি যে নির্দেশ দিয়াছিলেন, সোনারপুর আরাপ্যাচ পরিকল্পনা তারই একটি অংশ। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশের খাদ্যবৃদ্ধি করাটাই সর্বোচ্চ লক্ষ্য বলে স্থির হ'লে, সোনারপুর আরাপ্যাচ পরিকল্পনাটি প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্গত করা হয়। পরিকল্পনাটির ব্যয় বাবদ ৫৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। কাজ আরম্ভ করার পর স্থির হয় যে উপস্থিত ৫৭ বর্গমাইল জমির জলনিকাশের ব্যবস্থা করা হবে। এই জমিটির উত্তরে বিদ্যাধরী নদী ও আদিগঙ্গা, পূর্বে পিয়ালী নদী, দক্ষিণে উত্তরভাগ বারুইপুর রোড এবং পশ্চিমে বারুইপুর গড়িয়া রাস্তা।

পিয়ালী নদীতে ঢালু খাল দিয়ে এই জমির জলনিকাশ করে ফেলা সম্ভব না হওয়ায় বৈদ্যুতিক পাম্প সাহায্যে জলনিকাশের ব্যবস্থা করা হয়। পিয়ালির দক্ষিণ তীরে, উত্তরভাগে চারটি বৈদ্যুতিক পাম্প বসিয়ে জমিটি থেকে মিনিটে ৩৭৫,০০০ গ্যালন জল পাম্প করা হয়। এই সকল পাম্পের জন্য মাঝেরহাট থেকে ১৯ মাইল লম্বা হাইভোল্টেজ ট্রান্সমিশন লাইন (৩৩ কিলোভোল্ট) তার টেনে আনা হয়। এতদ্বারা পাম্পগুলির জন্য ৩০০০ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিকশক্তি আহরণ করা হয়। এই ইলেকট্রিক লাইনটি গড়িয়া, সোনারপুর ও বারুইপুরের মধ্য দিয়ে আনা হয়েছে এবং এই সকল স্থান বৈদ্যুতিকশক্তি ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছে।

এই জলাভূমিটিতে জলনিকাশের খালকাটা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। যা হোক অতিকষ্টে শাখাসমেত ২৫ মাইল খাল কেটে উত্তরভাগের পাম্প ষ্টেশনটি লাউলিন খালের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছিল এবং তদ্বারা পাম্পের কাজ ভালভাবে চলছে। এইভাবে জমিটি জলমুক্ত করে চাষ করা সুরু হয়। ১৯৫৩ সালে জুন মাসে ২৬ বর্গমাইল জমি জলমুক্ত করে চাষোপযোগী করা হয়। এইসব জলমুক্ত জমির মালিকদের এই জমিতে পুনরায় চাষ করবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যথেষ্ট সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গরু কেনবার জন্য এই অঞ্চলের চাষীদের ১,২৫০০০ টাকা ধার দেন। চাষীদের ধার দেওয়ার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ভাল ধানের বীজ ওখানে মজুত করেন। স্থানীয় চাষীরা যদি সমবায় সমিতি গঠন করে চাষের খরচের জন্য ঋণ চায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাও দিতে প্রতিশ্রুত হন। এই অঞ্চলে একটি সমাজ উন্নয়ন ব্লকও করা হয়।

১৯৫৩ সালের জুনমাসে ২৬ বর্গমাইল জমিতে চাষ সুরু হয়। বাঙ্গালী চাষী সহজে নতুন পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে চায় না বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিবিভাগ ১৪০০ একর জমিতে ট্রাক্টার সাহায্যে খরিফ শস্যের চাষ করান এবং পরে এই জমিতে পাটনাই ধানের চাষ করান। বাকী

জমিতে স্থানীয় চাষীরা চাষ করে। এ বছর প্রায় ৪৮৫,০৫০ মণ ধান ও রবিশস্য এবং ৪৯৮,৪০০ মণ খড় উৎপন্ন হয়। ইহার মূল্য প্রায় ৪৪ লক্ষ টাকা।

১৯৫৫ সালে জমিগুলি মালিকদের ফেরত দেওয়া হয় এবং তারা বেশ ভালভাবে চাষ ক'রছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে সমস্ত জমিগুলি জলমুক্ত করে চাষোপযোগী করা হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় এইরকম একটি বিস্তৃত চাষোপযোগী উর্বরা জমি আবার বাহির হওয়ায় চাষী উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির একটি সুযোগ হয়েছে। একটি এতবড় জলাভূমির জলনিকাশ করে পশ্চিমবাংলার এই অন্নকষ্টের দিনে এতটা বাড়তি খাদ্যশস্য পাওয়া বাঙ্গালীর পরম সৌভাগ্য। পাশ্চাত্যদেশে, বিশেষ করে হল্যাণ্ড, ইংলণ্ড এবং ইতালীতে পাম্পের সাহায্যে জলবদ্ধ ভূমি উদ্ধার করা হয়ে থাকে; কিন্তু ভারতের একটি বিরাট জলাভূমির জলনিকাশের প্রথম পরীক্ষা হ'ল এই সোনারপুরে। বর্তমানে এটি বোধ হয় এশিয়ার বৃহত্তম জলনিকাশী বন্দোবস্ত। এই কাজে এভাবে কৃতকার্য হয়ে ভারতীয় এঞ্জিনীয়ারগণ অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

———

বাংলা পরিভাষা

অধ্যাপক শ্রীমনীন্দ্রকুমার মজুমদার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

Section 5—অনুবিভাগ ৫

Railway Transport—রেল পরিবহন

Act of God—দৈবী ঘটনা
Booking—টিকেট ক্রয়
„ Office—টিকেট ঘর
„ Through—সরাসরি চালান
Breakables'—ভঙ্গুর
Carriage of goods—মাল বহন
Carrier—বাহক
Claims—দাবী
Class of merchandise—মালের শ্রেণী
Clean Receipt—নির্দোষ রসিদ
Consignment—চালান
„ Note—চালান পত্র
Consignee—প্রাপক
Consignor—প্রেরক, প্রেষক
Damage—ক্ষতি
Defective Packing—ত্রুটিপূর্ণ মোড়াই
Delay—বিলম্ব
Delivery—প্রদান, অর্পণ
Demurrage—বিলম্ব শুল্ক
Destination—গন্তব্য স্থান
Forwarding—প্রেরণ
Freight—মাসুল, মাল পাঠাইবার ভাড়া
„ to pay—মাসুল দেয়
Identification—সনাক্তকরণ, অভিজ্ঞান, পরিচিতি
Inherent vice—অন্তর্নিহিত দোষ
In transit—যাত্রাপথে
King's Enemies—রাষ্ট্র শত্রু
Label—লেবেল, নামপত্র
Marking—চিহ্নিত করা
Nature of traffic—যাতায়াতের রকম (অর্থাৎ মালগাড়ী কি যাত্রীগাড়ী)
Open delivery—খোলা সরবরাহ
Package—মোড়ক
Packing—মোড়াই
Perishable goods—পচনশীল মাল
Pilferage—লঘুচৌর্য
Railway Receipt (R. R.)—রেলের রসিদ
Risk Note—দায়িত্ব পত্র
„ „ Company's—প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে
„ „ Owner's—মালিকের দায়িত্বে
Shortage—কমতি, হ্রাস
"This Side Up"—এই দিক উপরে
Wagon—মালগাড়ী

Wilfull misconduct—ইচ্ছাকৃত অবহেলা
'With care"—সতর্কতার সহিত, সাবধান
Section 6—অনুবিভাগ ৬

Insurance—বীমা

Actuary—জীবনাঙ্কিক, বীমা-গণিতজ্ঞ
Against All Risks (A. A. R.)—সর্ববিধ দায়িত্ব সহ
Agent Insurance—বীমার দালাল
Annuity—বার্ষিকী, বার্ষিক বৃত্তি
Assignment - স্বত্ব নিয়োগ
Assurance—জীবন বীমা
Bonus—বোনাস, অধিবৃত্তি
Causa Proxima—আপাতঃ কারণ
Cover—আবরণ, ঝুঁকি গ্রহণ
Claim—দাবী
Free of Average (F. A.)—আংশিক ক্ষতি নিরপেক্ষ
" " All Average (F. A. A.)—সর্ববিধ আংশিক ক্ষতি নিরপেক্ষ
" " Particular Average (F. P. A.)—বিশেষ আংশিক ক্ষতি নিরপেক্ষ
In force—বলবৎ
Indemnity—ক্ষতি পূরণ
Insurable Interest—বীমাযোগ্য হিত, বীমাহিত
Insurance—বীমা
" Accident—দুর্ঘটনা বীমা
" Burglary—অপহরণ বীমা
" Cargo—নৌপণ্য বীমা
" Disability—অসামর্থ্য বীমা
" Fire—অগ্নি বীমা
" Hull—নৌগর্ভ বীমা
" Life—জীবন বীমা
" Marine—নৌবীমা
" Workmen's compensation—কামগার ক্ষতিপূর্তি বীমা
Insured—বীমা গ্রহীতা
Insurer—বীমাকর্তা বীমাকারী
Instalment—কিস্তি
Jettison—বিপদকালে জাহাজ হালকা করিবার জন্য তাহা হইতে মাল নিক্ষেপ

আন্দামানের সবুজ সম্পদ

সম্প্রতি শিলংয়ে কেন্দ্রীয় বন পর্ষতের চতুর্থ বৈঠকে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের বন মন্ত্রিগণ দেশের বনসম্পদ বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। নিম্নে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের বনসম্পদ উন্নয়নের পরিচয় প্রদত্ত হইল।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের দিগন্তবিস্তৃত গহন বনে পূর্বে একমাত্র বন্য উপজাতিয়েরা বাস করিত। আজ সেখানে প্রায় ৫ হাজার শ্রমিক বসবাস করিতেছে। তাহারা গাছ কাটিয়া, চেরাই করিয়া এবং সুদূর অঞ্চলে তাহা চালান দিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে বিভিন্ন রকমের কাঠ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। মোট ২৫০৮ বর্গ মাইল আয়তনের ২১০টি দ্বীপ লইয়া এই দ্বীপপুঞ্জটি গঠিত। উহার মধ্যে বাগিচা ছাড়াই প্রায় ১৫০০ বর্গ মাইল স্থান অরণ্য সমাচ্ছন্ন। গড়ে প্রতি একর জমিতে ৫ হইতে ৩০ টন অর্থাৎ সমগ্র দ্বীপপুঞ্জে মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ হইতে দেড় কোটি টন সুপক্ক শাল গাছ আছে। গাছ কাটার পর হাতীর সাহায্যে সেগুলি অন্যত্র লওয়া হয়। এই জন্য ভারত হইতে এখানে হাতী আমদানী করিতে হইয়াছে। কারণ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে হাতী ত' দূরের কথা, কোন প্রকার বন্য জন্তুই নাই।

মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বেও এখানে আদিম প্রথায় কাঠ সংগ্রহ করা হইত। কিন্তু এক্ষণে এই দ্বীপপুঞ্জের সর্বত্র কাঠ সংগ্রহের জন্য বনবিভাগ নানা প্রকার আধুনিক যন্ত্রপাতি ও যানবাহনের

ব্যবহার করিতেছেন। সরল বর্গীয় গাছের চাষ বৃদ্ধির জন্যও চেষ্টা করা হইতেছে। কারণ পল্লী অঞ্চলে টেলিগ্রাফ ও বৈদ্যুতিক যোগাযোগ সাধন কার্যে এই জাতীয় কাঠ আদর্শ থামরূপে ব্যবহার করা চলে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ৪০ লক্ষ ঘন ফুট শাল কাঠ কাটা হয়। উহার প্রায় অর্ধাংশ ভারতে প্লাইউড, দেয়াশলাইয়ের কাঠি, প্যাকিং বাক্স ও রেলগাড়ীর বগী নির্মাণ করিতে ব্যবহৃত হয়। সেজন্য উহা চেরাই না করিয়া বড় বড় গুড়ির আকারেই ভারতে প্রেরিত হয়। অবশিষ্ট কাঠ চাথাম, জারতা, রেতাপুর ও মায়বাস্পারের চেরাইকলগুলিতে বিভিন্ন আকারে কাটা হয়।

এশিয়ার বৃহত্তম কাঠ চেরাইকল—আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের চাথামে এশিয়ার বৃহত্তম কাঠ চেরাই কল আছে। এখানে দৈনিক গড়ে প্রায় ১০০ টন কাঠ কাটা হয়। এখান হইতে ভারতীয় রেলওয়েসমূহের স্লীপার এবং নৌকা ও গৃহ নির্মাণোপযোগী কাঠ চালান যায়। চাথামের চেরাই কল হইতেই টকটকে লাল সুদৃশ্য ও মূল্যবান "আন্দামান পাদৌক্য" এবং 'জেব্রা কাঠ' চালান যায়। পাশ্চাত্য জগতে উহাদের যথেষ্ট চাহিদা আছে। চেরাই কলটিতে দৈনিক দুই শিফ্টে প্রায় দেড় হাজার কর্মী মোট ১৬ ঘণ্টা কাজ করেন। এই কারখানা চেরাইয়ের জন্য বিভিন্ন স্থান হইতে দেশীয় জলযানের সাহায্যে কাঠের বড় বড় গুঁড়ি জলপথে পোর্ট ব্লেয়ার বন্দরে আনা হয়। সেখান হইতে ঐগুলি সমুদ্রের স্রোতের সাহায্যে পরিচালিত কেন্দ্রের দ্বারা শূন্যে উত্থিত হয় এবং শূন্যপথে অগণিত শিকলের সাহায্যে করাত কারখায় নীত হয়। কারখানাতে বিদ্যুৎ চালিত করাতে ঐগুলিকে মসৃণ করিয়া কাটা হয় এবং অন্যত্র চালান দেওয়ার পূর্বে উহাদের ক্ষয় ক্ষতি নিবারণের উদ্দেশ্যে নানারূপ আঁটা লাগান হয়।

সরবতী উপত্যকায় বিদ্যুৎ উৎপাদন

শ্রী ভি, কে, শ্রীনিবাসাচার

(মহীশূর রাজ্যের পূর্ত বিভাগের কর্মসচিব)

মহীশূর রাজ্যে ছোট বড় অনেকগুলি নদী আছে। এর কোন-কোনটিতে বৎসরের সব সময় জল থাকে, কোন-কোনটিতে থাকে না। এইসব নদীর জলের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব ; কারণ অধিকাংশ নদীই পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত, আর এই অঞ্চলে বারিপাতও হয় প্রচুর। উপকূল অঞ্চলের বিস্তৃত ভূমি ভাগের উপর দিয়া এই সকল নদী প্রবাহিত হয় বলিয়া এগুলির জল সেচকার্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে না। নদীগুলি উচ্চভূমি হইতে প্রবাহিত বলিয়া, সেগুলিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। এইসব নদীতে মোট ৩০ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতে পারে, এই নদীগুলির মধ্যে কালী, সরবতী, বরাহী ও বারাপোল উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য নদীর ন্যায় সরবতী নদী পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অম্বতীর্থ নামক স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই নদীটি প্রায় ৪০ ৬৪ মাইল প্রবাহিত হওয়ার পর জোগ নামক স্থানে ৯৮০ ফুট গভীর এক খাতে নামিয়া জল-প্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বিশ্বের সর্বাপেক্ষা মনোরম দৃশ্যগুলির অন্যতম। আজ প্রায় দশ বৎসর হইল এই নদীর জল বিদ্যুৎ উৎপাদনে আংশিকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, মহাত্মা

গান্ধী বারি-বিদ্যুৎ কারখানা নামক কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপন্ন (১,১০,০০০ কিলোওয়াট) হইতেছে। বর্তমানে সরবতী উপত্যকা পরিকল্পনা নামে যে পরিকল্পনাটি কার্যকরী করা হইতেছে তাহার লক্ষ্য হইল এই উপত্যকার সমগ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করা।

প্রধান প্রধান বিষয়—এই পরিকল্পনার সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং কাজের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য। লিঙ্গনামাক্কি নামক স্থানে ৭০৯০ ফুট দীর্ঘ ও প্রায় ২০৫ ফুট উচ্চ একটি জলাধার নির্মাণ করা হইয়াছে। এখানে ১৭,৮০০ কোটি ঘনফুট জল ধরিবে। তালা কালানি নদীর জল সদ্ব্যবহারের জন্য তালা কালানি নামক স্থানে আর একটি ছোট জলাধার নির্মাণ করা হইয়াছে। জল চলাচলের জন্য ১৪,১৯০ ফুট দীর্ঘখাল এবং ২০০০ ও ৩,১১০ ফুট দীর্ঘ দুইটি সুড়ঙ্গ খনন করা হইয়াছে। বর্তমান হিসাব অনুসারে পরিকল্পনা রূপায়নে প্রায় ৩১ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

প্রশাসনিক ও মানবিক সমস্যা—এই ধরণের বৃহৎ পরিকল্পনা রূপায়ণে কতকগুলি প্রশাসনিক ও মানবিক সমস্যা দেখা দেয়। প্রশাসনিক সমস্যা বলিতে বুঝায়—যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ কর্মী ও শ্রমিক সমস্যা, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সংগ্রহ সমস্যা ইত্যাদি। পূর্তকার্য সম্পাদনের জন্য একটি সিভিল সার্কেল ও বৈদ্যুতিক কার্য সম্পাদনের জন্য একটি ইলেট্রিক্যাল সার্কেল গঠন করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি সার্কেল এক একজন চীফ ইঞ্জিনীয়ারের অধীনে রাখা হইয়াছে। সুখের বিষয় এই যে, এ পর্যন্ত মহীশূরে টেকনিক্যাল কর্মীর তেমন অভাব ঘটে নাই। মহাত্মা গান্ধী বারি-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মত সরবতী বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটিও মহীশূরের ইঞ্জিনীয়ারগণই নির্মাণ করিবেন তবে বিদেশী সরঞ্জামের সহায়তায়। প্রয়োজন মত শ্রমিকও পাওয়া গিয়াছে। ভাকরা নাঙ্গল, হীরাকুঁদ প্রভৃতি বড় বড় পরিকল্পনায় যেরূপ অধিক পরিমাণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হইয়াছে এখানে সেরূপ করা হয় নাই। পরিকল্পনার কাজ দ্রুত সম্পাদনের জন্য এবং মধ্যে মধ্যে কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য একটি উচ্চ শক্তি সম্পন্ন বোর্ড গঠন করা হইয়াছে। এই বোর্ডের সভাপতি হইলেন বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী এবং সদস্য হইলেন রাজ্যের ও রাজ্যের বাহিরের কয়েকজন বিচক্ষণ ইঞ্জিনীয়ার এবং সংশ্লিষ্ট অফিসারগণ, একটি হিসাব পরীক্ষা সংস্থা গঠন করা হইতেছে। কর্মী কলোনীর পরিচালনা সম্পর্কে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষকে স্বাস্থ্য বিভাগ ও অন্যান্য বিভাগের কর্মচারিগণ সাহায্য করিতেছেন।

প্রাথমিক কাজকর্ম—গত বৎসরাধিক কালের মধ্যে অনেকটা প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হইয়াছে। কর্মচারীদের বাসস্থান নির্মিত হইয়াছে, শ্রমিকদের জন্য কলোনি স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে আলোক, পানীয় জল ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, বৈদ্যুতিক কাজের নক্সা রচনা করা হইয়াছে, সরঞ্জামের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। ৮৯১০০ কিলোওয়াটের দুই ইউনিট যুক্ত প্রথম পর্যায়ের কাজ ১৯৬১-৬২ সালের মধ্যে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কর্মচারী ও শ্রমিকদের সাচ্ছন্দ্য বিধান—এইরূপ পরিকল্পনা রূপায়নের সময় কর্মচারী ও শ্রমিকদের সাচ্ছন্দ্য বিধান একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। জলাধার নির্মাণের ফলে যে সকল ব্যক্তির জমিজমা ও ঘরবাড়ী নষ্ট হয় তাহাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিতে হয়। লিঙ্গনামাক্কি বাঁধ নির্মাণের জন্য যে ৯০ একর পরিমিত স্থান প্রয়োজন হইয়াছে তাহার বেশীর ভাগ অরণ্য। ১৫ হাজার একর জলা জমি। ২৫০০ একর মীরস জমি এবং ২,০০০ একর প্রধানত সুপারি বাগান।

১২৪টি গ্রামের বার তের হাজার লোকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। গ্রামবাসীরা কয়েক পুরুষ যাবৎ একস্থানে বাস করায় তাহাদের চাষাবাদ ও জীবন ধরণের পদ্ধতি নিশ্চিতই স্বতন্ত্র, কাজেই তাহাদিগকে অন্যত্র লইয়া বসবাসের ব্যবস্থা করা অসুবিধাজনক। রাজ্য সরকার এই সকল গ্রামবাসীর পুনর্বাসনের জন্য তৎপরতার সহিত ব্যবস্থা করিতেছেন।

সর্বোত্তম পরিকল্পনা—দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে মহীশূর রাজ্যে যে সকল পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে এই পরিকল্পনাটি শ্রেষ্ঠ। এই পরিকল্পনাটি শুধু যে দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য রূপায়িত করা হইতেছে তাহা নয়, দারুণ প্রয়োজনের জন্যই করা হইতেছে। মহীশূর রাজ্যে ও ভারতে বিদ্যুৎ-এর এত বেশী অভাব যে, এইরূপ পরিকল্পনা রূপায়িত না করিলে, অভাব কখনই পূরণ হইবে না। বর্তমান যুগে বিদ্যুৎ অগ্রগতির প্রতীক। ক্ষেত-খামারে বিদ্যুতের সহায়তায় কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, কারখানায় ইহার সহায়তায় জীবন ধারণের মূল প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধি পায়, ঘর সংসারে বিদ্যুতের সহায়তায় বিকল্প কাজের অনেক সুযোগ পাওয়া যায়। আণবিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকিলেও, বারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহে বহুদিন যাবৎ উৎপাদন চলিতে থাকিবে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে আমরা আমাদের পরিকল্পনার লক্ষ্য কিছুটা পূরণ করিতে পারিব।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অভিযান

জাতীয় উৎপাদনশীলতা অভিযানের কার্যসূচী প্রণয়ণের উদ্দেশ্যে গত ১লা ও ২রা নভেম্বর নয়াদিল্লীতে শ্রমিক, মালিক, সরকারী দপ্তরসমূহ এবং কারিগরী সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের দুই দিবসব্যাপী এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন দেশে এই অভিযানের অগ্রগতি সম্পর্কে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যুদ্ধোত্তরকালে বহু দেশে শিল্পোন্নয়নের ব্যাপারে উৎপাদনশীলতা এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। কোন দেশের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি এবং জীবনধারণের মান উন্নয়নে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃত হইয়াছে।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি সংস্থাসমূহ তাহাদের উদ্দেশ্য এবং কর্তব্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন নামে উল্লিখিত হয়। কোন কোন দেশে উহাকে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কেন্দ্র বলা হয়। আবার কোন কোন ইহাকে শিল্প সংস্থা বা সার্ভিসেস বলা হইয়া থাকে। জাপান, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং অষ্ট্রিয়াতে এই সকল সংস্থা কেবলমাত্র উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। ফিলিপাইনের মত দেশে, যেখানে শিল্পোন্নয়নের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে এই সংস্থাগুলিকে শিল্পোন্নয়ন কেন্দ্র বা শিল্প সংস্থা বলা হয়। শিল্পসমূহকে উপদেশ এবং গবেষণালব্ধ তথ্যাদি দ্বারা সাহায্যদান করা ব্যতীত ও শিল্পোন্নয়নে কর্মোদ্যম এবং উৎসাহের সঞ্চার করাই এই সংস্থার অন্যতম প্রধান কর্তব্য। সেখানে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির গুরুত্ব ইহার পরে স্থান পায়।

ইউরোপের উৎপাদনশীলতা অভিযান—ইউরোপে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সংস্থাসমূহের

যথেষ্ট অগ্রগতি পরিলক্ষিত হইতেছে। ইউরোপের অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থার ইউরোপীয় উৎপাদনশীলতা এজেন্সীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি শাখা রহিয়াছে। উহা জাতীয় সরকার, শিল্প, কৃষি এবং গবেষণা সংস্থা, বে-সরকারী, যুক্তপ্রচেষ্টা এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ প্রদান করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির দায়িত্ব পালন করিয়া থাকে। যুক্তরাজ্যে বৃটিশ উৎপাদন পরিষদ শিল্প সংক্রান্ত সকল বিষয়ে শ্রমিক ও মালিকের প্রতিনিধিত্ব করেন। জাতীয় মালিক ও ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাসমূহ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলি হইতে এই পরিষদের সদস্য গ্রহণ করা হয়। বক্তৃতা দেওয়া, রিপোর্ট ও ইস্তাহার রচনা এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য বিভিন্ন ফার্মে কর্মী বিনিময় ব্যবস্থা করাই পরিষদের প্রধান কর্তব্য। পরিষদ গঠনের পরে প্রথম দুই বৎসরে পরিষদ উৎপাদনশীলতা পর্যালোচনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে ৬৩টি কর্মীদল প্রেরণ করিয়াছেন।

ফ্রান্সে শিল্প হিসাবে শ্রেণী বিন্যাস করিয়া ৪০টি স্থানীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। অর্থনৈতিক মন্ত্রণালয়ের পরিচালনাধীন একটি জাতীয় উৎপাদনশীলতা কমিটি রহিয়াছে। এসোসিয়েশন ফ্রান্সা পুর লা-এক্রসেমেন্তের মারফৎ ইহার কাজ হয়।

জাপানে জাপান উৎপাদন কেন্দ্র নামে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা রহিয়াছে। জাপান উৎপাদনশীলতা লিয়াজোঁ পরিষদই সাধারণতঃ উৎপাদনশীলতা অভিযান পরিচালনা করিয়া থাকে। উৎপাদন কেন্দ্র পর্যবেক্ষকদল এবং শিক্ষার্থীদের বিদেশী বিশেষজ্ঞদলকে নিজ দেশে আমন্ত্রণ করা, উৎপাদন পরিষদ পরিচালনা, প্রশাসনিক শিক্ষাদান এবং উৎপাদন সম্পর্কে গবেষণা কার্য চালাইয়া থাকেন।

উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কয়েকটি সংস্থা একত্র করিয়া ১৯৫০ সালে অষ্ট্রিয়ান উৎপাদন কেন্দ্র গঠিত হইয়াছিল। শিল্পসমূহকে কারিগরী সাহায্যদান প্রভৃতি নানা কাজ এই কেন্দ্র মারফৎ পরিচালিত হয়। শিল্পসমূহের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যেই ১৯৫০ সালে ফিলিপাইনে শিল্প উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। নূতন শিল্পসমূহকে অর্থ সাহায্য করা এই কেন্দ্রের প্রধান কর্তব্য। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বৈঠকের আয়োজন করাও এই কেন্দ্রের দায়িত্ব। যুগোস্লাভিয়াতে ১৯৫৪ সালে ফ্রেডারেল উৎপাদনশীলতা সংস্থা গঠিত হইয়াছে। তাহার পরে অনেকগুলি বিশেষজ্ঞ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল কেন্দ্র ছাড়াও স্থানীয় উৎপাদনশীলতা কমিশন গঠিত হইয়াছে। নিজ নিজ এলাকায় উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করা এবং বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এই কমিশনগুলির প্রধান কর্তব্য।

ভারতের হস্তচালিত তাঁত শিল্প

শ্রীবিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষ তাঁত শিল্পে খ্যাতি ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়া আসিয়াছে। তাঁত বস্ত্রের সমৃদ্ধি ভারতে তন্তুবায়দিগকে বিভিন্ন প্রকার তাঁত বস্ত্র বয়নে উৎসাহিত করিয়াছিল। যেমন সৌখীন সূতি বস্ত্রে উৎপাদন প্রসার লাভ করিয়াছিল, তেমনি বিভিন্ন প্রকারে রেশম, পশম ও অন্যান্য প্রকার সূতা হইতে প্রস্তুত বস্ত্র উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আসন লাভ করিয়াছিল। বিংশ শতাব্দীতে ম্যানচেষ্টারের বস্ত্র যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন উপকূলে সহজ প্রবেশ লাভ করিয়াছিল

তেমনি পঞ্চদশ-ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে—এমন কি তাহারও পূর্বে—খ্রীষ্টজন্মের পূর্বেও ভারতের সূক্ষ্মবস্ত্র রেশম ও পশম বস্ত্র স্থলপথে দুর্লঙ্ঘ্য-পর্বত, মরুকান্তার অতিক্রম করিয়া ইতিহাসের মধ্য যুগে রোম, গ্রীস, ইতালী, ফ্রান্স ও রুশদেশেও শিল্প প্রতিভার সৌকর্যে সমাদৃত হইয়াছিল। ভারতের বঙ্গদেশ, বারানসী, মহীশূর, মণিপুর, মাদুরা, উড়িষ্যা ও কাশ্মীরের তাঁত বস্ত্রের খ্যাতি প্রাচীন ঐতিহ্য লইয়া সর্বযুগে সমাদৃত হইয়া আসিয়াছে। সে খ্যাতি ম্লান হইলেও এখনও লুপ্ত হয় নাই। পুনরুদ্ধার ও সংস্কারের প্রচুর সুযোগ বর্তমান। অধ্যবসায়, উদ্দীপনা, রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা পাইলে ভারতের এই অতি প্রাচীন শিল্পটি বহুমুখী ধারায় আবার সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে।

এই শিল্পটির পতনের ঐতিহাসিক কারণ মুখ্যতঃ রাজনৈতিক স্বার্থ পরিচালিত। বর্তমান প্রবন্ধে ইহার পুনরালোচনার প্রয়োজন নাই; তথাপি ম্যানচেষ্টারের বস্ত্রের প্রতিযোগিতা ভারতের বাজারে নির্বিঘ্ন করিবার জন্য ইংরাজের স্বার্থ প্রণোদিত রাষ্ট্রীয় নীতি যে ইহার জন্য দায়ী, ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই! সুতরাং স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পটির পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হইয়াছিল। দীর্ঘ একশত বৎসরের স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত এই শিল্পটির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামও জড়িত ছিল। বিদেশী বস্ত্র বর্জন এই শিল্পকে খানিকটা প্রেরণা যোগাইলেও প্রকৃত মর্যাদা দান করিতে পারে নাই। বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে ভারতের বস্ত্র শিল্পের অভ্যুত্থানের একটা উদ্যম দেখা গেলেও তাহা মিল বস্ত্রশিল্প ও বৃহৎ বস্ত্রশিল্পের মধ্যে মুখ্যতঃ সীমাবদ্ধ ছিল। ম্যানচেষ্টারের অনুকরণে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই শিল্পের রূপায়ণ হইয়াছিল। হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র খাদি প্রস্তুত রাজনৈতিক সংগ্রামকারীদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিল। ইহাদের অভ্যুত্থানের পালা আরম্ভ হয় প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার উত্তরকালে। ১৯৪৭ সালের পর এই শিল্পের প্রকৃত উন্নতির সূচনা হয়। ভারত সরকার 'অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম বোর্ডের' প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই পর্ষদের মারফৎ তাঁত শিল্পকে সর্বাঙ্গীন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁত শিল্পের উন্নতির জন্য এবং ভারতের আভ্যন্তরীন বাজারে ইহার প্রতিযোগিতা সহজ করিবার জন্য মিলবস্ত্রের উপর সেস্ ধার্যের সিদ্ধান্ত করা হয়। সমবায় সমিতির মাধ্যমে যাহাতে তাঁত শিল্পীরা সুযোগ লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পায় এবং বাজারে সহজে প্রবেশ লাভ করিতে পারে তজ্জন্য তন্তুবায় সমিতি, বিপণন সমিতি এবং রাজ্য সরকারের শিল্প বিভাগের অধীনে কুটির শিল্প ও তাঁত শিল্প বিভাগের প্রতিষ্ঠা হয়। রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে তাঁত শিল্প বিপণন সমিতিরও প্রতিষ্ঠা হয়; ইহা ছাড়া রাজ্যসরকারের অনুসৃত নীতি অনুযায়ী তাঁত শিল্পীদের পুরস্কার দানের ব্যবস্থা হয়। সুরুচি সম্পন্ন ডিজাইন ও নক্সার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা হয়। এই সকল প্রচেষ্টার ফলে হস্তচালিত বস্ত্র শিল্পের অগ্রগতি সম্ভব হয়। আজ ১৯৫৭ সালে ১১ লক্ষ ২২ হাজার ৫৩৫টি তাঁত সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত হইতেছে। ১৯৫৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সকল সমবায় সমিতি ৯৩ লক্ষ ৯ হাজার ৬৫ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য লাভ করিয়াছে।

তাঁত শিল্পের উন্নতির জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে সেগুলিকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। (১) তাঁতীদিগকে সমবায় সমিতি গঠনে উৎসাহিত করা। (২) ঐ সকল সমিতিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া। (৩) উৎপাদনের উৎকর্ষ ও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখা। (৪) তাঁত বস্ত্র বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করা। (৫) তাঁতীদিগকে সমাজ কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে উৎসাহিত করা। এই সকল পরিকল্পিত কর্মসূচীর ফলে তাঁত শিল্প আশাতীত অগ্রগতি লাভ করিয়াছে। কয়েকটি রাজ্যে তাঁতীরা সংঘবদ্ধভাবে শিল্প সমবায় সমিতি গঠনে উদ্যোগী হইয়াছে।

শিল্প সমবায় সমিতিগুলি এক একটি কারখানা বিশেষ। এই রকম দশটি কারখানা ভারতবর্ষে গড়িয়া উঠিয়াছে। তিনটি কেরালায়, ৪টি মাদ্রাজে, ১টি বোম্বাইয়ে ও ২টি বিহারে। সমবায় তন্তুশিল্প সমিতি কর্তৃক প্রস্তুত বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য প্রতি ৩০০টি তাঁত লইয়া একটি সমিতি গঠনের পরিকল্পনা রাজ্য সরকার করেন। এই সকল সমিতিকে সাহায্যের জন্য বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে ৬ কোটি ৮৮ লক্ষ ৭৪ হাজার ৯ শত ৭৫ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া তাঁত বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য মার্কেটিং সোসাইটির জন্য বিক্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, সুতা সরবরাহের ব্যবস্থা, বিভিন্ন কেন্দ্রে বস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা, আন্তরাজ্য বিক্রয় ব্যবস্থা প্রভৃতি নানাবিধ উপায় ও পদ্ধতি গ্রহণ করা হইয়াছে। দেশে ও বিদেশে প্রদর্শনীর সাহায্যে ভারতের তাঁতবস্ত্রের বিক্রয়ের চেষ্টা করা হইতেছে। বিদেশে বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের তাঁত বস্ত্রের প্রভূত চাহিদা অনুভূত হইতেছে। একদিকে যেমন উৎপাদনের উৎকর্ষ, সৌন্দর্যের শ্রীবৃদ্ধি, শিল্পকলার অভিজাত রূপায়ণ; অন্যদিকে তেমনি যান্ত্রিক পদ্ধতিতে অভিনব উদ্ভাবনা ভারতের তাঁতশিল্পকে দ্রুত অগ্রগতির পথে লইয়া যাইতেছে। বিশ্বের দরবারে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে নিউইয়র্ক, দামাস্কাস, লিপজিগ, মার্সাই, ষ্টকহল্‌ম, ভেনিস, প্রাগ, জাগ্রেব, ফ্র্যাঙ্কফার্ট, নাইরোবি, ব্যাঙ্কক, তেহারান, পিকিং প্রভৃতি স্থানে ভারতের তাঁতশিল্প ক্রেতা সাধারণের সমাদর লাভ করিয়া ভারতের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

—•—

বিভিন্ন রাজ্যের তাঁতের কাপড়

ভারতের তাঁত শিল্পের খ্যাতি বহুকালের। তাঁতের কাপড়ের বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষ বিশ্ববাসীর প্রশংসা অর্জন করেছে। তাঁতের কাপড় থেকে কত সুন্দর সুন্দর পোষাক তৈরী হয়। দামী পোষাক করতে হলে তার জন্য রয়েছে বেনারসী কাপড়। বেনারসী কাপড় যে এত দামী তার কারণ আছে। তাঁতে সুতা বসাতেই বেশ কয়েক মাস লাগে। সময়ের দৈর্ঘ্য নক্সার উপরই নির্ভর করে। কাপড় বোন হয় দিনে কয়েক ইঞ্চ করে। ফলে কাপড়ের দাম হয়েছে গজ প্রতি ২৫ টাকা বা তার বেশী। কিংখার আগে সুরাটে তৈরী হত কিন্তু এখন বেনারসেও তৈরি হচ্ছে। বেনারসের তাঁতী ভারতের নানা অঞ্চল থেকে নক্সা যোগাড় করেছে আর প্রাচীন নক্সাগুলি সময়ের রুচি অনুযায়ী বদলে নিয়েছে। বেনারসী কাপড়ে রেশম বা কার্পাস সুতার সংগে খাঁটি সোনা বা রূপার তার ব্যবহার করা হয় বলে বেনারসী কাপড়ের দাম তার ওজনের সোনার দামের মতই। বেনারসে তৈরী কিংখার আর সুরাটের কিংখারের দাম গজ প্রতি ষাট টাকা বা তার বেশী।

বেনারসের কোরা রেশমের কাপড়ও কম কাজে লাগে না। নেকটাই, শার্ট আর সান্ধ্য পোষাক তৈরী করার পক্ষে এই কাপড় খুবই ভাল। এই কাপড় বাদামী, গাঢ় মেরুন এবং এর স্বাভাবিক ক্রীম রংএর পাওয়া যায়। আজকাল বহুল ব্যবহৃত বেনারসী সুতী শাড়ী সাদা রংএর হয় এবং এগুলির দাম ২০ টাকা থেকে ৫০ টাকার মধ্যে।

বাংলা দেশের বিয়ের কনের পোষাক হিসেবে সাধারণ রেশমী শাড়ী ছাড়া চাকচিক্যময় ধুতিশাড়ীও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। খাঁটি ঢাকাই শাড়ী আজকাল সহজে পাওয়া যায় না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সুন্দর সুন্দর নকল শাড়ী পাওয়া যায়। এই শাড়ীর দাম ৫০ টাকা বা তারও বেশী।

টাঙ্গাইল শাড়ীগুলি আরও বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এগুলি শান্তিপুরে তৈরী হয়—দাম

২৫ টাকা থেকে ৩৫ টাকার মধ্যে। শান্তিনিকেতনে বেশ সুন্দর শাড়ী তৈরী হচ্ছে। সম্প্রতি এই শাড়ীগুলির দাম কমে যাওয়ার ফলে এগুলি বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। তাঁতের শাড়ীগুলিরই বাজারে কদর বেশী। মুর্শিদাবাদ ও শান্তিনিকেতনের রেশমের শাড়ীগুলির দাম ৩৫ টাকা বা তার বেশী। এই শাড়ীগুলি অন্যান্য রেশমের শাড়ীর চেয়ে শক্ত। ভাঁজ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও কম।

উড়িষ্যা থেকে যে সব নক্সা এসেছে তার মধ্যে প্রধান হল হাতী, ঘোড়া ও মাছ! এসব কাপড়ের পোষাক নক্সা ও রংএর জন্য বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। কিন্তু শাড়ীগুলির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কম বলে ঠিক শাড়ী হিসেবে পরা যায় না। পোষাক তৈরির জন্য আরও চওড়া ও মিহি কাপড় ২৫ টাকা থেকে ৪০ টাকার মধ্যে পাওয়া যায়।

ঘর সাজাবার কাপড় উড়িষ্যা ছাড়াও বিহার, মণিপুর, কালিম্পং ও পানিপথ থেকে পাওয়া যায়। পাণিপথে প্রাচীন ফুলকারি নক্সা থেকে কাপড় তৈরী হচ্ছে। মণিপুরের একক মূর্ত্তি বিশিষ্ট নক্সাগুলি উল্লেখযোগ্য।

ঘর সাজাবার জন্য কত ধরণের কাপড় ভারতে পাওয়া যায়। কেউ যদি জাঁকজমকপূর্ণ ঘর চান তাহলে উড়িষ্যার চাঁদোয়া ব্যবহার করতে পারেন। দাম তিন টাকা থেকে পাঁচ টাকা। দেখতে খুবই সুন্দর। আর সেই সংগে কাশ্মীরের বেড কভার আর টেবিল ঢাকনা ব্যবহার করতে পারেন।

এগুলির দাম একটু বেশী হলেও দাম দিয়ে আনন্দ আছে। রেশমের কাপড়ের উপর চমৎকার সুঁচের কাজ করা। আর এ জাঁকজমকপূর্ণ সাজসজ্জার জন্য সৌরাষ্ট্র, দিল্লী ও বোম্বাইয়ের আয়নার কাজ করা কাপড় ব্যবহার করা যেতে পারে। এগুলি ন্যায্য মূল্যে পছন্দ মত তৈরী করান যায়। দিল্লী ও ভূপানের জরি ও পুঁথির কাজ করা কাপড়ের দাম খুবই বেশী কিন্তু ভাল জিনিষের জন্য ভাল দাম দিলে ক্ষতি নেই।

উত্তরপ্রদেশের ফরাক্কাবাদ, মাদ্রাজ ও হায়দ্রাবাদের ছাপা সুতী কাপড় সাজসজ্জার পক্ষে খুবই উপযোগী। দাম গজ প্রতি এক টাকা থেকে দু'টাকা।

পোষাক সম্বন্ধে বলতে গেলে হায়দ্রাবাদের পশুপক্ষী মার্কা চকচকে রংএর কাপড়গুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। এই নক্সার শাড়ীগুলির দাম খুব কম হলে আট টাকা আর খুব বেশী হলে ৫০ টাকা। আওরঙ্গাবাদের রেশমের শাড়ীগুলি আরকাল কাঞ্চীপুরম আর কলিগলম নক্সায় তৈরী হচ্ছে। এগুলির দাম ৬০ টাকা বা তার বেশী। বোম্বাইতে নানা ধরণের কাপড় তৈরী হয়। সর্বাধুনিক আর সস্তা হল ছাপা শাড়ী, দাম ১৫।১৫ টাকা থেকে ২৫ টাকার মধ্যে।

চান্দেরী শাড়ী সব রংয়েই পাওয়া যায়। মহেশ্বরী শাড়ী এখনও বহু নারীর পৈতৃক সম্পদ হয়ে আছে। ইনকালি শাড়ীর রং বেশ উজ্জ্বল কিন্তু চোখে লাগে। শাহপুর আর বাগানকোটের শাড়ীগুলি আবার প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। নানা রংএর সুতা বুনে কিমখাব শাড়ী তৈরী হয়। দাম কম হওয়ার জন্য এই শাড়ীগুলিও বেশ জনপ্রিয় হয়েছে।

মাদ্রাজ হল পোষাক সচেতন নারীর কাছে স্বর্গ বিশেষ। কাঞ্চীপুরমের রেশমের শাড়ীগুলি আজ সারা বিশ্বে বিক্রী হচ্ছে। এগুলির দাম ৭০ টাকা বা তার বেশী। কলাক্ষেত্রেতে রং সম্বন্ধে গবেষণাগার খোলার ফলে পুরাণ রংগুলির পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছে। আর অজন্তা ও ইলোরা থেকে

নক্সা নেওয়ার ফলে কলাক্ষেত্রের শাড়ীগুলি খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছে। কলাক্ষেত্রের সুতী শাড়ীগুলিও রেশমী শাড়ীর সংগে পাল্লা দিচ্ছে। রেশম শাড়ীগুলির দাম ১৫ টাকা বা তার বেশী সুতী শাড়ীগুলির দাম ৩৫ টাকা থেকে ৪০ টাকার মধ্যে।

সরু পাড় বিশিষ্ট গাঢ় রংএর উরাইয়াউর শাড়ীগুলি মাত্র ছ'টাকাতেও পাওয়া যায়। কোয়েম্বাটুরের তাঁতীরা ভারতের বিভিন্ন স্থানের নক্সা অনুযায়ী শাড়ী তৈরি করছে। এই শাড়ীগুলি ১২ হাত লম্বা, উত্তরপ্রদেশ ও বাংলার শাড়ীগুলি সাধারণতঃ ১১ হাত লম্বা হয়।

সুতার সঙ্গে সোনার তার মিশিয়ে অন্ধ্রের ভেঙ্কটগিরি শাড়ীগুলি তৈরী হয়। এগুলি গাঢ় সবুজ, নীল ও সাদা রংএর হয়। চান্দেরী শাড়ীর মত এগুলির দামও ৩০ টাকা থেকে ৭০ টাকার মধ্যে।

প্রায় দু'শ বছর আছে সৌরাষ্ট্রের তাঁতীরা মাদুরাইতে বসবাস শুরু করেছিল। কিছুকাল আগেও তাহা পূর্ব পুরুষদের নক্সা অনুযায়ী শাড়ী তৈরী করছিল। নিখিল ভারত তাঁত পর্ষৎ তাদের দক্ষিণ ভারতের নক্সা অনুযায়ী শাড়ী তৈরী করতে উৎসাহ দেয়। ফলে নানা রংএর শাড়ী এখন তৈরী হচ্ছে। দাম ১৫ টাকা বা তার বেশী।

রেশম শিল্পী সংঘ

শ্রীমানস সেন

সমবায় মনোভাব মানুষের আদিম প্রবৃত্তিরই বিকাশ। এক সময় মানুষ দলবদ্ধ হইয়া বাস করিত ও পারস্পরিক সহযোগিতায় সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিল। সেই সমাজ ব্যবস্থাকে ভিত্তি করিয়াই সভ্যতার ধারা দেশে দেশে বিভিন্ন যুগে বহুমুখী ধারায় আত্মবিকাশ লাভ করিয়াছিল। ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তের সৃষ্টির মূলে ছিল মানব সমাজের মনোবৃত্তি।

সেই সমবায় মনোবৃত্তিই বর্তমান কালে কৃষি, শিল্প সংগঠনের কাজে নিয়োজিত করার প্রচেষ্টা আধুনিক রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাতেও অগ্রাধিকার লাভ করিয়াছে। রেশমশিল্পী সংঘের কর্মসূচীর আলোচনায় ও অগ্রগতির সার্থকতায় এমনি সমবায় কর্মপ্রচেষ্টার রূপায়ন আমাদিগকে ইহার আলোচনায় আকৃষ্ট করিয়াছে।

স্বদেশী আন্দোলনের অগ্নিযুগের কর্মীরা তাহাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধতার মনোভাবকে শিল্পক্ষেত্রে নিয়োগের পথ পাইয়াছে স্বাধীনোত্তর কালে। অভয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই খাদি শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় রেশম শিল্পের উন্নয়নের দিকে ইহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। একাদশ কর্মী ক্ষুদ্র একটি সমবায় সংঘ গঠন করিয়া বাংলার প্রাচীন রেশম শিল্পের পুনরুজ্জীবনে জন্য আর একটি নূতন অর্থনৈতিক সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার কাটুনীদের সহযোগিতায় সংঘের কর্মসূচী বিস্তৃতি লাভ-করিতে থাকে এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকারের কুটির শিল্পবিভাগের উদ্যোগে রেশম শিল্পের উন্নয়নে একটি ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। তাহারই ফলে আজ মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি অঞ্চলের রেশমবস্ত্র যেমন জনপ্রীতি লাভ করিয়াছে তেমনি উৎপাদনের উৎকর্ষ, কারুকলার সৌকার্য, বর্ণাঢ্যের বৈচিত্র্যে সমাদৃত হইয়াছে। বাংলার ঐতিহ্য ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইয়াছে।

পশ্চিম বঙ্গে রেশম শিল্পের অবদান নিম্নোক্ত পরিসংখ্যানের সাহায্যে বর্ণনা করা চেষ্টা করা হইল। পশ্চিম বঙ্গে ১৫০০০ একর জমিতে তুঁত গাছের চাষ হয় এবং ৫০,০০০ হাজার লোক সম্পূর্ণভাবে এবং ১ লক্ষ লোক আংশিকভাবে এই শিল্পে নিযুক্ত আছে। ইহা কম গৌরবের নয়।

ইহা ছাড়াও রেশম উৎপাদনে প্রত্যক্ষভাবে ৮০,০০০ হাজার এবং আংশিকভাবে ৪০,০০০ হাজার লোকের জীবিকার সংস্থান হইতেছে। বৎসরে ৬০ লক্ষ পাউণ্ড রেশম গুটি উৎপাদিত হয়। ইহার মূল্য ৯০ কোটি টাকার মত।

৬,১০০টি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মতভাবে উন্নত ও প্রাচীন চরকায় রেশম সূতা প্রস্তুত হয় এবং এই কার্যেও ৮,৬০০ লোক সম্পূর্ণভাবে এবং ৮,০০০ হাজার লোক সাময়িকভাবে নিযুক্ত আছে। এই রাজ্যে বৎসরে গড়ে ৩,৩০,০০০ পাউণ্ড কাঁচা রেশম উৎপন্ন হয়; আর ইহার বাৎসরিক মূল্য ৯৯ কোটি টাকা।

রেশম শিল্পী সংঘের উদ্যোগেই রাজ্যসরকারের তত্ত্বাবধানে এই রাজ্যে জালালপুর ও বিরামপুরে উন্নত রেশম বয়ন তাঁতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। একমাত্র এই সংঘের অধীনে ৫০০ কারিগর কাজ করিতেছে।

উৎকৃষ্ট রেশমসূতা হইতে যেসব উৎকৃষ্ট রেশমবস্ত্র প্রস্তুত হয়, তেমনি আবার বাতিল রেশম (waste silk) হইতেও নানাপ্রকার রেশমবস্ত্রজাত দ্রব্য সামগ্রীও প্রস্তুত হয়। এই রাজ্যে বাতিল রেশমের পরিমাণও কম নয়। প্রায় ২,৫০,০০০ পাউণ্ড। আর এই কাজেও অবসর সময়ে প্রায় ২০০০ লোক কাজ করিয়া জীবিকার্জন করিতেছে।

মুর্শিদাবাদী ও মালদহী বর্ণোজ্জ্বল মসৃণ রেশম ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে মটকা, এরী, কেট প্রভৃতি রেশমও উৎপন্ন হয়। আর এই শাখাশিল্পে সাময়িকভাবে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যাও ১০,০০০ হাজার।

সুতরাং সামগ্রিকভাবে দেখা যায় রেশমশিল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীন শিল্পীর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ কর্মসংস্থান লাভ করিয়া জীবনযাত্রার মান তথা আর্থিক সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই রাজ্যে প্রায় ৪০০০ লোক বিশুদ্ধ রেশম বস্ত্র প্রস্তুত করে, প্রায় ৫০০ লোক রেশম ও কার্পাস সূতার মিশ্রিত বস্ত্র প্রস্তুত করে এবং প্রায় ১০০ লোক কার্পাস সূতা, রেশম ও কৃত্রিম সূতা মিশ্রণ করিয়া বস্ত্র প্রস্তুত করে। এই রাজ্যের বাৎসরিক রেশমজাত বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ ৩৫,০০,০০০ গজ এবং মিশ্রিত সূতায় প্রস্তুত বস্ত্রের পরিমাণ প্রায় ৬৫,০০০ হাজার গজ।

আজ বাংলার রেশম কেবলমাত্র শাড়ী, ব্লাউজ পিস্ বা চাদর প্রস্তুতেই সীমাবদ্ধ নহে। ঘরের পর্দা, আসবাবের আচ্ছাদন ও আবরণ, শার্টিং, কোটিং, এমন কি রুচি, প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী নানাবিধ বস্ত্রের ও বস্ত্রজাত দ্রব্য উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

রেশমশিল্পী সংঘ এই শিল্পের অগ্রগতিতে আত্মনিয়োগ করিয়া ইহার সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছে। কয়েকটি বিক্রয় কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া যেমন জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করিয়াছে তেমনি সাধারণের গোচরে আনিয়া বাংলার রেশমকে আদরের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্দীপনায় এই সংঘের প্রচেষ্টা সার্থক হইলে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক সমৃদ্ধি গড়িয়া উঠিবে।

ভারতে শিল্পায়ণের সূত্রপাত

শ্রীমনুভাই শাহ

দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা মূল শিল্প, বৃহৎ শিল্প এবং মাঝারী ও হালকা ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের উন্নয়নের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এই শিল্পগুলির উন্নতি হইলে বৈদেশিক আমদানীর উপর আমাদের নির্ভরশীলতার অবসান ঘটিবে। এই শিল্পগুলি দেশের সামগ্রিক শিল্পোন্নয়নের মূল শক্তি। এই দিকে আমরা যে অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছি তাহা সত্যই আনন্দের কথা। ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পোৎপাদনের সূচক সংখ্যা উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমাদের দেশে যে শিল্পায়নের সূত্রপাত সঠিকপথে হইয়াছে ইহা তাহারই পরিচায়ক। আমাদের অর্থনীতির এই মূল ক্ষেত্রের প্রসার অন্যান্য ক্ষেত্রের কথা, ভোগ্যপণ্য, কৃষি উৎপাদন, খনিজ উৎপাদন—তুলনায় প্রায় তিন গুণ হইয়াছে। ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পকে মোটামুটিভাবে ছয় ভাগে ভাগ করা যায় :—(ক) হালকা বৈদ্যুতিক দ্রব্য শিল্প, (খ) হালকা যন্ত্র শিল্প, (গ) ভারী বৈদ্যুতিক দ্রব্য শিল্প, (ঘ) ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য শিল্প, (ঙ) ভারী যন্ত্রপাতি তৈয়ার শিল্প ও (চ) লৌহেতর কাঁচা ধাতু।

হালকা বৈদ্যুতিক দ্রব্য শিল্প—গত ১৯৫৭ সালে বৈদেশিক দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছে। ১৯৫৬ সালের তুলনায় এদেশে ষ্টোরেজ ব্যাটারীর উৎপাদন শতকরা ৪৬ ভাগ বাসগৃহে ব্যবহার্য মিটারের উৎপাদন শতকরা ৪৩ ভাগ, তামার বিদ্যুৎ পরিবহন শতকরা ১৬ ভাগ, জড়াইবার তার শতকরা ৪৫ ভাগ, রেডিও গ্রাহক যন্ত্র শতকরা ২০ ভাগ এবং বৈদ্যুতিক পাখার উৎপাদন শতকরা ৫১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৮ সালে ৫ কোটি টাকার এই সকল দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৫৭ সালে হইয়াছে ২৫ কোটি টাকার। ১৯৬০-৬১ সালে ৪০ কোটি টাকার এই সকল দ্রব্য উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে। বর্তমানে দেশে হালকা বৈদ্যুতিক দ্রব্যের চাহিদা যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে আমাদের লক্ষ্য দ্বিগুণ করা প্রয়োজন।

হালকা যন্ত্র শিল্প—গত এক বৎসরে সেলাই কলের উৎপাদন শতকরা ২৭, সাইকেলের উৎপাদন শতকরা ২০, সাইকেলের টুকরা অংশের উৎপাদন শতকরা ৫০, ব্লেডের উৎপাদন শতকরা ৩৭, রেফ্রিজারেটারের উৎপাদন শতকরা ২০, বল বেয়ারিংয়ের উৎপাদন ১৯৫৬ সালের তুলনায় ১৯৫৭ সালে শতকরা ৬০ এবং ওয়াটার মিটারের উৎপাদন শতকরা ৯০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৮ সালে দুই কোটি টাকার হালকা যন্ত্র এদেশে উৎপাদিত হইয়াছিল। ১৯৫৭ সালে উৎপাদিত হইয়াছে ৩৫ কোটি টাকার যন্ত্র।

ভারী বৈদ্যুতিক দ্রব্য—১৯৪৮ সালে এইদেশে ৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার বৈদ্যুতিক মোটর, বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, সুইচ গিয়ার ও কণ্ট্রোল গিয়ার, তাপ পরিবাহক, কেবল ও তার প্রভৃতি দ্রব্য উৎপন্ন হয়। ১৯৫৭ সালে ২৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার এই সকল দ্রব্য তৈয়ারী হইয়াছে। গত এক বৎসরেও ভারী বৈদ্যুতিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে গড় উৎপাদন শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখনও এই সকল দ্রব্য অধিক উৎপাদনের সুযোগ রহিয়াছে। আমাদিগকে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ৬০ কোটি টাকার এই সকল দ্রব্য নির্মাণ করিতে হইবে।

ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য শিল্প—ভারতে ১৯৪৮ সালে ৬ কোটি টাকার মোটরগাড়ী তৈয়ারী হইয়াছিল। ১৯৫৭ সালে তৈয়ারী হইয়াছে ৫০ কোটি টাকার মোটরগাড়ী। ট্রাক, জীপ, মোটরগাড়ীর বিভিন্ন অংশ বর্তমানে শতকরা ৫০ ভাগ তৈয়ারী হইতেছে। আমার মনে হয়,

আগামী ২।৩ বৎসরের মধ্যে এই সকল দ্রব্য শতকরা ৭৫ হইতে ৮০ ভাগ উৎপাদিত হইবে। ১৯৫৭ সালে এদেশে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার লেদ, ড্রিল, মিলিং মেসিন, বোরিং মেসিন, সেপিং মেসিন, কাটিং মেসিন প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল। ১৯৫৭ সালে হইয়াছে ৩ কোটী ৫০ লক্ষ টাকার। এখনও এদেশে বৎসরে ১০ হইতে ১৫ কোটী টাকার যন্ত্রপাতি আমদানী হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্যে এদেশে এই সকল দ্রব্যের চাহিদা ১৮।২০ কোটী টাকার হইতে পারে। আগামী তিন বৎসরে প্রত্যেক বৎসর ১০ কোটী টাকা করিয়া এই সকল দ্রব্য উৎপাদিত হইলে সুখের বিষয় হইবে।

যন্ত্রপাতি তৈয়ার শিল্প—১৯৫৭ সায়ল আমাদের দেশে প্রায় ১৫০ কোটী টাকার ভারী যন্ত্রপাতি ও মূলধনী মাল আমদানী হইয়াছে। ১৯৪৮ সালে ভারতে কার্যতঃ কোন মূলধনী দ্রব্য ও যন্ত্রপাতিই উৎপন্ন হয় নাই। বর্তমানে ভারতে কাপড়ের কল, চটকল, চিনি কল ও অন্যান্য কল-কারখানার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইতেছে। বর্তমান বৎসরে ঐরূপ ৩৫ কোটী টাকার যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হয়। তথাপি এখনও ১৫০ কোটী টাকার ভারী যন্ত্রপাতি বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইতেছে।

বিশেষ আশার কথা এই যে, ভারত সরকার সোভিয়েট রাশিয়ার সহযোগিতায় রাঁচীতে একটী ভারী যন্ত্রপাতি কারখানা স্থাপন করিতেছেন। সম্পূর্ণভাবে স্থাপিত হওয়ার পর ঐ কারখানার প্রতি দুই বৎসরে একটী ইস্পাত কারখানার সমুদয় যন্ত্রপাতি তৈয়ার করা সম্ভব হইবে। ঐ কারখানাটী স্থাপন করিতে প্রায় ৯০ হইতে ১০০ কোটী টাকা ব্যয় হইবে। সোভিয়েট রাশিয়ার সহযোগিতায় দুর্গাপুরে খনিতে ব্যবহার্য ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণের একটী কারখানা স্থাপন করা হইবে। উহার জন্য ব্যয় হইবে ৩০ কোটী টাকা। ঐ কারখানার প্রতি বৎসর ৩০ হাজার টন যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা চলিবে।

ভূপালে একটী ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ কারখানার কাজ ইতিমধ্যেই সুরু হইয়াছে। কারখানাটী নির্মাণ করিতে মোট ৩০ কোটী টাকা ব্যয় হইবে এবং সেখানে দুই ক্ষেপে কাজ করিয়া বাৎসরিক প্রায় ২৫ কোটী টাকার ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা চলিবে। কাঁচা লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন বিষয়ে ভারত ইতিমধ্যেই সুদৃঢ় বুনিয়াদ গড়িয়া তুলিয়াছে। ১৯৬০-৬১ সনের মধ্যে ভারতের ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ ৫৫ লক্ষ টনেরও অধিক হইবে। পরবর্তী পাঁচ বৎসরে উৎপাদনের পরিমাণ আরও ১ কোটী টন বৃদ্ধি পাইবে।

ভারতে অফুরন্ত বক্সাইট আছে; কিন্তু তত অধিক তামা, সীসা ও দস্তা নাই। অথচ যে কোনও ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের জন্য উহাদের সব কয়টিরই যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। বর্তমানে আমাদের বাৎসরিক প্রায় ৩০ কোটী টাকার লৌহেতর ধাতুর প্রয়োজন; ১৯৬০-৬১ সনে উহাদের চাহিদা আরও বাড়িয়া প্রায় ৪৫ কোটী টাকা হইবে। আমাদের আগামী ১৯৬০-৬১ সন হইতে বাৎসরিক প্রায় ৪০ হাজার টন এ্যালুমিনিয়াম, ৩০ হাজার টন তামা, ৫০ হাজার টন দস্তা ও ২০ হাজার টন সীসার প্রয়োজন হইবে।

হীরাকুদ কারখানায় বাৎসরিক প্রায় ১০ হাজার টন এ্যালুমিনিয়াম উৎপন্ন হইবে। ঐ কারখানায় উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। রিহান্দেও অনুরূপ পরিমাণ এ্যালুমিনিয়াম

উৎপাদন সম্ভব হইবে। মেত্তুর কারখানায় বাৎসরিক ১০ হাজার হইতে ২০ হাজার টন এ্যালুমিনিয়াম উৎপন্ন হইবে। আর জয়ন্তানগরে উৎপন্ন হইবে বাৎসরিক প্রায় ৭,৫০০ টন। ফলে বর্তমানে বাৎসরিক আনুমানিক ৭,৫০০ টনের স্থলে চারি বৎসর পরে বাৎসরিক ৪৩ হাজার টন এবং আরও কয়েক বৎসর পরে প্রায় ৬০ হাজার টন এ্যালুমিনিয়ামের উৎপাদন সম্ভব হইবে। বৈদেশিক মুদ্রা সম্পর্কে বর্তমানে যে অসুবিধা দেখা দিয়াছে, ইহা সামাজিক এই সাময়িক অসুবিধা দূর করা সম্ভব হইবে।

কৃষি-শিল্প বাণিজ্য প্রসঙ্গ

১৯৫৭-৫৮ সালে ভারতে মোট ১,৭৫৪,০০০ একর জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে এবং ৪০ লক্ষ ৮৮ হাজার গাঁইট পাট (প্রতিটি গাঁইটের ওজন ৪০০ পাউণ্ড) উৎপন্ন হইয়াছে। কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান দপ্তর সর্বভারতীয় ভিত্তিতে পাট চাষের যে চূড়ান্ত হিসাব নির্ধারণ করিয়াছেন তদনুযায়ী বৎসরে উপরোক্ত পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সর্বভারতীয় হিসাব অনুযায়ী একর প্রতি পাটের গড় উৎপাদন ১৯৫৬-৫৭ সালের ৮৯৯ পাউণ্ড হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৭-৫৮ সালে ৯৩২ পাউণ্ড হইয়াছে। আসামে পাটের একর প্রতি গড় উৎপাদনের পরিমাণ ১২৫৪ পাউণ্ড হইয়াছে। পূর্ব বৎসরে একর প্রতি গড় উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১১৮২ পাউণ্ড। ১৯৫৭-৫৮ সালে কেন্দ্রশাসিত ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যাতে পূর্ব বৎসরের তুলনায় একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ১১৫৮ পাউণ্ড, ৯৬৪ পাউণ্ড এবং ৮৮৫ পাউণ্ড হইয়াছে। পূর্ব বৎসরে উহা ছিল যথাক্রমে ১০৮৬ পাউণ্ড ৮১২ পাউণ্ড এবং ৮০৫ পাউণ্ড। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নির্ধারিত হিসাব অনুসারে ১৯৫৭-৫৮ এবং ১৯৫৬ ৫৭ সালে একর প্রতি যথাক্রমে ২·৩৩ গাঁইট এবং ২·২৫ গাঁইট পাট উৎপাদিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। প্রতি গাঁইটের ওজন ৪০০ পাউণ্ড ধরিতে হইবে। আসাম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ এবং উড়িষ্যাতে উহা ছিল যথাক্রমে ৩·১৪ এবং ২·৯৬ গাঁইট, ২·৯০ এবং ২·৭২ গাঁইট, ২·৪১ এবং ২·০৩ গাঁইট ২·২১ এবং ২·০২ গাঁইট।

এই সকল অঞ্চলে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও ১৯৫৬-৫৭ সাল হইতে পাট চাষের জমি এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে ১৯০৮,০০০ একর জমিতে ৪২,৮৮,০০০ গাঁইট পাট উৎপাদিত হইয়াছিল। বীজ বপন এবং তৎপরে অনাবৃষ্টির দরুণ বিহার এবং উত্তর প্রদেশে পাট চাষের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। বিহারে একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৫৬-৫৭ সালের ৮৩ পাউণ্ড হইতে হ্রাস পাইয়া ১৯৫৭-৫৮ সালে ৬৫২ পাউণ্ড হইয়াছে। উত্তর প্রদেশে উহা ১১২১ পাউণ্ড হইতে হ্রাস পাইয়া পাউণ্ড হইয়াছে।

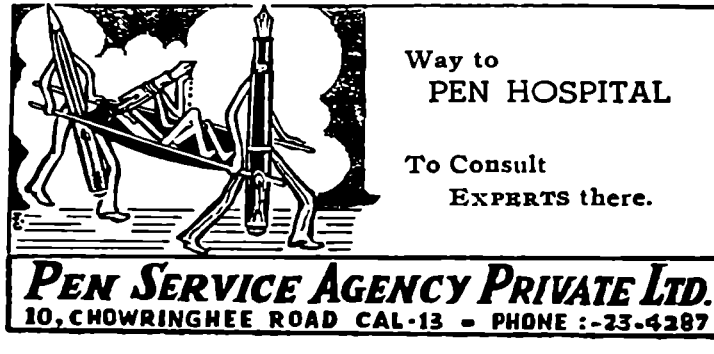

টাকা কোম্পানী গঠন

ভারত সরকার এবং বার্মা অয়েল ও আসাম অয়েল কোম্পানীর মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। আসামের নাহারকাটিয়া, হুগ্রীজান ও মোরাণ অঞ্চলে তৈল সম্পদ আবিষ্কার ও তাহার সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে টাকা কোম্পানী গঠনের পক্ষে ইহাকে প্রথম পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে। ঐ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন ভারত সরকারের পক্ষে ইস্পাত খনি ও জ্বালানী মন্ত্রণালয়ের জয়েন্ট সেক্রেটারী শ্রী কে, কে, সাহানী এবং বি. ও সি. এবং এ. ও. সি'র পক্ষে বার্মা অয়েল কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টার মিঃ আর. স্মিথ।

নূতন কোম্পানীটির নাম হইবে অয়েল ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড। উহা আসাম রাজ্যে সমিতি-ভুক্ত ও রেজিষ্ট্রীকৃত হইবে এবং উহার অনুমোদিত মূলধন হইবে ৫০ কোটি টাকা। এই মূলধন এক হাজার টাকা মূল্যের ৫ লক্ষ শেয়ারে বিভক্ত হইবে। মূলধনের দুই-তৃতীয়াংশ দিবেন বি. ও. সি. এবং এক-তৃতীয়াংশ দিবেন ভারত সরকার। নূতন কোম্পানীটি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নবাবিষ্কৃত তৈল অঞ্চলে আসাম অয়েল কোম্পানীর যাবতীয় সম্পদ গ্রহণ করিবেন। সেখানে ৩৬টি গভীর কূপ ইতিপূর্বে খনন করা হইয়াছে এবং এগুলির অধিকাংশ হইতে প্রচুর পরিমাণ তৈল পাওয়া যাইবে।

এই টাকা কোম্পানী খনিজ তৈল উৎপাদন করিবে এবং দুইটি পর্যায়ে বারাউনী পর্যন্ত অপরিশোধিত তৈল পরিবহনের জন্য পাইপ লাইন বসাইবার ব্যবস্থা করিবে। ইহা পরিচালনার দায়িত্বও কোম্পানীর হইবে। প্রথম পর্য্যায়ে ভারত সরকার ও বার্মা অয়েল কোম্পানী কর্তৃক নির্বাচিত মধ্যবর্তী কোন স্থান পর্য্যন্ত পাইপ লাইন বসান হইবে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে উহা বারাউনী পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হইবে। প্রত্যেকটি পর্যায়ের কার্যারম্ভের কাল ভারত সরকার নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন। ভারত সরকারের উদ্যোগে যে দুইটি তৈল পরিশোধনাগার স্থাপিত হইবে এই কোম্পানীর উৎপন্ন তৈল তাহাদের নিকট বিক্রয় করিতে হইবে। অন্য সূত্র হইতে কলিকাতা বন্দরে যে নিম্নতম মূল্যে খনিজ তৈল পাওয়া যাইতে পারে অথবা প্রকৃত উৎপাদন ব্যয়ের উপর ন্যায্য লাভ ধরিয়া যে মূল্য দাঁড়াইবে এই দুইটির মধ্যে যেটি কম হইবে কোম্পানী তাহার উৎপন্ন তৈলের জন্য সেই হারে মূল্য পাইবে। তবে ভারত সরকারের অনুমতি লইয়া কোম্পানীকে এইরূপ মূল্য ধার্য করিতে হইবে। প্রতি ছয় মাস অন্তর উহা পুনরায় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা হইবে।

বার্মা অয়েল কোম্পানী টাকা কোম্পানীকে ১ কোটি পাউণ্ড পর্যন্ত ঋণ দিবার প্রস্তাব করিয়াছে। ইহাতে প্রথম পর্যায়ে পাইপ লাইন বসাইবার খরচা অনেকটা মিটান যাইবে। তৈল খনি এবং বিহারের বারাউনীর মধ্যবর্তী স্থানে দ্বিতীয় একটি তৈল পরিশোধনাগার স্থাপন করা হইবে। অয়েল ইণ্ডিয়ার কর্মী নিয়োগ ভারতীয়দিগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। ভারতীয়দের শিক্ষাদানের জন্য ব্যাপকতর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইবে।

খার্তুমে ভারতের বাণিজ্য প্রদর্শনী

ভারতের বহু প্রকার রপ্তানীযোগ্য পণ্যদ্রব্য প্রদর্শনের জন্য মার্চ মাসের মধ্যভাগ হইতে পনর দিন সুদানের রাজধানী খার্তুমে একটি ভারতীয় বাণিজ্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবে।

সুদানে ভারত কর্তৃক এই ধরণের প্রদর্শনীর আয়োজন এই প্রথম। এই প্রদর্শনীর ফলে উভয়দেশের

মধ্যে বাণিজ্য চলাচল বৃদ্ধি পাইবে। তাহা ছাড়া, স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে কতদূর শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হইয়াছে তাহাও জানা যাইবে।

প্রদর্শনীর পাঁচটি প্রধান বিভাগ থাকিবে। এখানে রাখা হইবে যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য, বয়ন শিল্পের যন্ত্রপাতি, কৃষিকার্যের সরঞ্জাম, সেলাইকল, সাইকেল, বৈদ্যুতিক মোটর, ট্রান্সফরমার, ব্যাটারি, বৈদ্যুতিক, পাখা, হিটার, রেডিও সেট, টেলিফোন ও টেলিকমিউনিকেসানের যন্ত্রপাতি, ষ্যাম্প্লি-ফায়ার, কলে ও তাঁতে তৈয়ারী সুতার কাপড়, রেশমী কাপড়, পশমী কাপড়, রেশমজাত কাপড়। ভারত হইতে যথেষ্ট পরিমাণ কাপড় সুদানে চালান যায়। ব্রোকেড, জরির দ্রব্য, কাশ্মীরী শাল, পোষাক পরিচ্ছদ, খেলনা, ঝরণা-কলম, প্লাষ্টিকের তৈয়ারী নানাপ্রকার দ্রব্য, কফি, টিনে ভর্ত্তি ফল, আম, কাজুবাদাম, লাক্ষা প্রভৃতি দ্রব্য ঐ প্রদর্শনীতে দেখান হইবে।

যে সকল উৎপাদক ও ব্যবসায়ী তাঁহাদের দ্রব্য ঐ প্রদর্শনীতে রাখিতে চান তাঁহারা কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রদর্শনী শাখার সহিত যোগাযোগ সাধন করিতে পারেন।

ভারত-ফ্রান্স অর্থ নৈতিক সহযোগিতা চুক্তি

ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে একটী অর্থ নৈতিক ও কারিগরি সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। উহাতে ভারত সরকারের পক্ষে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থ নৈতিক বিভাগীয় কর্মসচিব শ্রীবি, কে, নেহেরু এবং ফরাসী সরকারের পক্ষে ভারতস্থ ফরাসী রাষ্ট্রদূত কাউণ্ট স্তাম্পিলা ওস্রোরোগ স্বাক্ষর করেন।

১৯৫৬-৫৭ সনে শ্রী বি, কে, নেহেরু প্যারিসে যাইয়া ফরাসী সরকারের সহিত আলাপ-আলোচনার ফলে এই চুক্তি সম্ভব হইয়াছে। পরে ১৯৫৭ সনের নভেম্বর মাস হইতে নয়াদিল্লীস্থ ফরাসী দূতাবাসের তিনজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীও এই আলোচনা চালাইয়া যান। আলোচ্য চুক্তি অনুযায়ী আগামী বার মাস কালে ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় আনুমানিক ২৮ কোটি টাকা মূল্যের মূলধনী মাল ভারতে রপ্তানির উদ্দেশ্যে প্রস্তুত ও সরবরাহের সুযোগ ফরাসী সরবরাহকারীদিগকে দিবেন। কি কি শ্রেণীর মূলধনী মাল ভারতে সরবরাহ করা হইবে অগ্রাধিকার অনুযায়ী তাহার একটি তালিকাও চুক্তি-পত্রের সংগে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মাল সরবরাহ সম্পর্কে যে সকল চুক্তিনামা সম্পাদিত হইবে তাহা উভয় সরকারের দ্বারা অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে। প্রতিটি চুক্তিনামা পৃথকভাবে ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে সম্পাদিত হইবে এবং উহাদের দেনাপাওনা সম্পর্কে কোন সরকারই সরাসরিভাবে দায়ী হইবেন না। ফরাসী সরকার ভারতকে কারিগরী বিশেষজ্ঞ সরবরাহ বিষয়েও সাহায্য করিবেন এবং ভারতীয়দের ফ্রান্সে যাইয়া উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বৃত্তি প্রদান করিবেন।

ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার পূরণে বৃটিশ সরকার

ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ নৈতিক বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ ভারতের বর্তমান বৈদেশিক মুদ্রার অভাব বিবেচনা করিয়া বৃটিশ সরকার বিগত ১৯৫৫ সনের ষ্টার্লিং পেন্সান ব্যবস্থা অনুযায়ী বর্তমান বৎসরের ১লা এপ্রিল তারিখে বার্ষিক কিস্তি অনুসার দেয় ৪০ লক্ষ পাউণ্ড ছাড়াও তিনটি বার্ষিক কিস্তির অর্থ প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন। ভারত সরকার বৃটিশ সরকারের এই প্রস্তাব ধন্যবাদ সহকারে গ্রহণ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রী ও ভারতে নিযুক্ত বৃটিশ হাই কমিশনারের মধ্যে পত্র বিনিময় হইতেছে।

১৯৫৫ সনের ষ্টার্লিং পেন্সান্ ব্যবস্থা অনুযায়ী বৃটিশ সরকার ১০টি বার্ষিক কিস্তিতে ভারতকে, পেন্সন বাবদ ১৯৭৮ সনে অগ্রিম গৃহীত মোট ৪ কোটি পাউণ্ড প্রদান করিবেন কথা আছে। উন্নত ব্যবস্থা অনুযায়ী ১৯৫৮ সনে উহার একটি কিস্তি বাবদ ৪০ লক্ষ পাউণ্ড দিতে পারেন। কিন্তু ভারতের বর্তমান অসুবিধা বিবেচনা করিয়া বৃটিশ সরকার ১৯৫৪ সনে মোট ৪ কিস্তির অর্থ অর্থাৎ অর্থাৎ মোট ১ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড একযোগে পরিশোধ করিবেন।

ভারত-হাঙ্গেরী বাণিজ্য চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি

কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, মন্ত্রণালয়ের জয়েণ্ট সেক্রেটারি শ্রী কে, বি, লাল ও হাঙ্গেরী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূত মিঃ আলাডার তামাসের মধ্যে পত্র বিনিময়ের ফলে ভারত ও হাঙ্গেরীর মধ্যে ১৯৫৪ সালে ১৭ই জুন সম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তি মেয়াদ আরও দুই বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তবে বর্তমানে চুক্তিটির কিছু সংশোধন করা হইয়াছে।

বর্তমান ব্যবস্থা অনুসারে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক ও অন্যান্য লেনদেন ভারতীয় টাকায় করা যাইবে। হাঙ্গেরীতে সূতী, পশম ও রেশম বস্ত্র, জুতা ও চামড়ার জিনিষ, মশলা, কফি, চা, বনস্পতি, লাক্ষা, পাটজাত দ্রব্য, তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য প্রভৃতি ভোগ্যদ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সকল প্রকার চেষ্টা করা হইবে। হাঙ্গেরী হইতে ভারতে যে সকল পণ্য আমদানি করা যাইতে পারে সেগুলি 'ক' তপশীলের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সেগুলি হইল ধাতু, লৌহ, ইস্পাত এবং তজ্জাত দ্রব্য, কাঁটা, চামচ ইত্যাদি, যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক যন্ত্র, রাসায়নিক দ্রব্য, ও ঔষধ প্রভৃতি।

'খ' তপশীলে ভারত হইতে হাঙ্গেরীতে রপ্তানিযোগ্য পণ্যগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে: সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল লৌহ আকর, লাক্ষা ছাগল ও ভেড়ার চামড়া, কফি, চা, তিসি তৈল তামাক, তামাকজাত দ্রব্য, দড়ি, রং, ট্যাপিওকা ও তজ্জাত দ্রব্য প্রভৃতি। ১৯৫৪ সালে বাণিজ্য চুক্তিটি সম্পাদিত হইবার পর ভারত ও হাঙ্গেরীর মধ্যে বাণিজ্য ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৩-৫৪ সালে মোট ১২ লক্ষ টাকার বাণিজ্য হইয়াছিল। ১৯৫৬-৫৭ সালে হয় ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার।

ভারতের আমদানির তুলনায় যন্ত্রপাতির পরিমাণ যথাক্রমে ৩৩ লক্ষ টাকা ও ১৭ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছিল। রপ্তানিকৃত পণ্যের পরিমাণের মধ্যে ৭৫ শতাংশ ছিল লৌহ আকর, কাঁচা চামড়া ও শণ প্রভৃতিরও রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারত রুমানিয়া বাণিজ্য চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ১৯৫৪ সালের ২৩শে মার্চ যে ভারত রুমানিয়া বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল এবং যাহা ১৯৫৭ সালের ১৭ই জানুয়ারী সংশোধিত হইয়াছিল তাহার তপশীলের মেয়াদ আগামী ৩০শে জুন (১৯৫৮) পর্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া আজ এখানে কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম কর্মসচিব শ্রী ডি, শাণ্ডিল্য এবং ভারতস্থিত রুমানিয়ার বাণিজ্য প্রতিনিধি ও উপদেষ্টা মিঃ ডি, নিকুলেস্কুর মধ্যে পত্র বিনিময় হইয়াছে।

১৯৫৩-৫৪ সালের পূর্বে উভয় দেশের মধ্যে যে পরিমাণ বাণিজ্য চলিত তাহা নিতান্তই সামান্য। ১৯৫৬-৫৭ সালে এই দুই দেশের মধ্যে ৪১ লক্ষ টাকার বাণিজ্য চলিয়াছিল। রুমানিয়া হইতে ছোট জাহাজ, রেল-ইঞ্জিন, বিদ্যুৎ-ট্রান্সফরমার, তৈল সন্ধানী সরঞ্জাম ও সিমেণ্ট আমদানী করা যাইতে পারে এবং সে দেশে সূতী কাপড়, কার্পাস সূতা, কার্পাস তৈল ও চামড়া রপ্তানি করা যাইতে পারে।

———

আর্থিক দিগ্‌দর্শন

তথ্যসেবী

জীবনবীমা ও লগ্নী

চাগ্‌লা কমিশনের সাক্ষ্য গ্রহণের কায সমাপ্ত হইয়াছে। রিপোর্টও প্রকাশিত হইয়াছে; যদিও তাহা সাধারণের গোচরে এখনও আসে নাই। বিচারপতি চাগ্‌লার সুপারিশ জনসাধারণ অনুমান করিতে পারিলেও সেই সম্পর্কে মন্তব্য করা সঙ্গত নহে। শ্রীকৃষ্ণমাচারী, শ্রীমুন্দ্রা প্রভৃতি কাহারও সম্পর্কে আমাদের কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ বা আনুকূল্য নাই। জীবনবীমা কমিশনের অর্থ এই ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গতভাবে লগ্নী করা হইয়াছে কিনা তাহাই আমাদের ও জনসাধারণের বক্তব্য! সংবিধানিক দায়িত্ব কাহার এবং লগ্নীর প্রত্যক্ষ দায়িত্ব কাহার এবং এক্ষেত্রে লগ্নী ন্যায়সঙ্গত না হইলে সকলেই যে একই দোষে অভিযুক্ত তাহা আমরা বুঝিতে পারি। সুতরাং নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে অবহেলাজনিত ত্রুটির জন্য পদত্যাগ করাই মর্যাদাসম্পন্ন কাজ। শ্রীকৃষ্ণমাচারী সংবিধানিক দায়িত্বের জন্যও একমাত্র দোষী নাও হইতে পারেন। কিন্তু বিষয়টি এমনই জটিল এবং দেশের গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির সহিত এমনইভাবে জড়িত যে এক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ড হইলে কি হইত তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। আমরা ইংল্যাণ্ডেরই পার্লামেণ্টারী পদ্ধতি অনুসরণ করিতেছি। এক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি।

প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে যে স্যার জন এণ্ডারসন্ যখন বাঙ্গলার গভর্ণর ছিলেন তখন মন্ত্রী সভা গঠন লইয়া বাঙ্গলার খ্যাতনামা লব্ধপ্রতিষ্ঠ জনৈক শিল্পবিদের নাম গ্রহণ সম্পর্কে তিনি বলিয়াছিলেন ইংল্যাণ্ডে কোন ব্যক্তি ফৌজদারী আদালতে অভিযুক্ত হইলে তাহাকে মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করা হয় না। মন্ত্রীসভায় রাখিবার প্রশ্ন তো উঠেই না। চাগ্‌লা কমিশনের সমীপে যাহারা অভিযুক্ত বলিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহারা ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত হইবার মত কোন অপরাধ করিয়াছিলেন কিনা এ প্রশ্ন এটর্ণি জেনারেল শ্রীশীতলবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই প্রশ্নে বিষয়ের সমস্ত গুরুত্ব এড়াইয়া যাওয়া অভিযুক্তদের পক্ষে পার্লামেণ্টারী মর্যাদা সম্পন্ন কিনা তাহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য।

অবশ্য শ্রীকৃষ্ণমাচারীর পদত্যাগে সমস্ত প্রশ্নের অবসান ঘটিয়াছে এবং শ্রীচাগ্‌লা উপস্থাপিত সাক্ষ্যের উপর যে রায় দিয়াছেন তাহাও সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শ্রীকৃষ্ণমাচারী পদত্যাগ করিয়া তাঁহার এবং মন্ত্রীসভার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন বলিয়া তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

ভারতের আমদানী-রপ্তানী

সম্প্রতি ভারতের আমদানী ও রপ্তানী পরিষদের বৈঠক হইয়া গিয়াছে। যথারীতি বৈদেশিক মুদ্রার অজুহাতে আমদানী নিয়ন্ত্রণ এবং রপ্তানী বৃদ্ধির কথা আলোচিত হইয়াছিল। ১৯৫৬-৫৭ সালে বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাবে দেখা যায় ভারত ১ হাজার ৭৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার মত বিদেশী মুদ্রা খরচ করিয়াছে এবং রপ্তানী করিয়া ৬৩৭ কোটি টাকার মত বিদেশী মুদ্রা অর্জন করিয়াছে। পরিষদের সভায় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী বলেন যে আগামী মার্চ পর্যন্ত যে আর্থিক বৎসর শেষ হইবে তাহাতে রপ্তানী পূর্ব বৎসর অপেক্ষা বৃদ্ধি না পাওয়াই সম্ভব। ভারতের রপ্তানী পণ্যের মধ্যে চা ও পাটের স্থান উল্লেখযোগ্য। এই দুইটি পণ্যেরই রপ্তানী আশাতীতভাবে হ্রাস পাইয়াছে।

রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য সরকারী মৌখিক প্রচেষ্টার অন্ত নাই ; কিন্তু যে নীতি অবলম্বন করিলে ভারতের পণ্য বিদেশের বাজারে সমাদর লাভ করিতে পারে তাহাতে যথেষ্ট গলদ রহিয়াছে। অতিরিক্ত শুল্ক, আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ব্যয়ের বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতিজনিত মজুরী বৃদ্ধি, নিকৃষ্ট দ্রব্য উৎপাদন, রপ্তানী দ্রব্যে ভেজাল প্রভৃতি কারণ ভারতীয় পণ্যকে বিদেশের বাজারেও দুর্মূল্য ও হেয় করিয়া তুলিয়াছে। এমন কি ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের কার্যকলাপও সন্তোষজনক হয় নাই।

আমদানী ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ বাহুল্য দেশের সাধারণ জীবনযাত্রাকে অচল করিয়া তুলিয়াছে। যে সকল পণ্য স্বদেশে উৎপাদিত হইয়া যথোচিত সমাদর লাভ করিতে পারিত তৎপ্রতি সম্যক্ দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। শুধু কৃচ্ছ্রসাধনের কচকচি দেশবাসীর নিকট সরকারকে বিরক্তিভাজন করিয়া তোলে এবং সরকারী নীতির প্রতি অনাস্থার সূচনা করে।

চায়ের রপ্তানী হ্রাস—রপ্তানি উপদেষ্টা পরিষদে শ্রীদেশাই বলেন যে, বিদেশী মুদ্রা অর্জনকারী পণ্য সমূহের মধ্যে চা এখনও প্রধান স্থান অধিকার করিয়া থাকিলেও ১৯৫৬ সালের তুলনায় ১৯৫৭ সালে উহার রপ্তানিও "যথেষ্ট হ্রাস" পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ১৪৩ কোটি টাকায়। বিশ্বের বাজারে ভারতীয় চায়ের দাম কম হওয়ায় ও রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় ইহা ঘটিয়াছে বলিয়া শ্রী দেশাই জানান। তিনি বলেন যে, আগামী এপ্রিল হইতে চা (বণ্টন ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ) আদেশ কার্যকরী হইতেছে। ভালো চা রপ্তানির ব্যবস্থা করাই ইহার উদ্দেশ্য।

ক্যানাডার চায়ের রপ্তানী বৃদ্ধির সম্ভাবনা

১৯৫৬-৫৭ সালে ক্যানাডা ২ কোটি পাউণ্ড ভারতীয় চা আমদানী করিয়াছিল। ক্যানাডায় মোট প্রয়োজন সাড়ে চার কোটি পাউণ্ড। ক্যানাডার চায়ের বাজারে ভারতীয় চায়ের প্রধান প্রতিযোগী সিংহল। ক্যানাডা সিংহল হইতে ৪২ শতাংশের অধিক চা আমদানী করে।

সম্প্রতি ক্যানাডার চা পর্ষদের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মিঃ ডি. এম্ ল্যাংটন ভারতে আসিয়াছিলেন এবং কলিকাতায় চা পর্ষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভ্যর্থিত হন। তিনি ভারতে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলে চা বাগান গুলি পরিদর্শন করেন এবং ইহাতে তিনি মুগ্ধ হন ; পরে তিনি দক্ষিণ ভারতের চা বাগান গুলিও পরিদর্শন করেন। মিঃ ল্যাংটন কানাডার চা পর্ষদের বার্ষিক বিবরণী হইতে সংশ্লিষ্ট অংশ পাঠ করেন এবং বলেন যে ক্যানাডার চা পর্ষদ পানীয় হিসাবে চায়ের জন প্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। তিন বৎসর পূর্বে এই পর্ষদটি গঠিত হইয়াছিল। ভারত ও সিংহল গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধি ও ক্যানাডার চা ব্যবসায়ীরা এই পর্ষদের সভ্য।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যয় বৃদ্ধি

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে যে, আগামী আর্থিক বৎসরে অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরে পরিকল্পনা বাবদ মোট ব্যয় প্রায় ৯৫০ কোটি টাকা হইবে ; তন্মধ্যে ৫০০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাসমূহের জন্য এবং অবশিষ্ট অর্থ রাজ্য সমূহের পরিকল্পনাগুলির জন্য ব্যয়িত হইবে।

এই ব্যয় বলিতে আর্থিক বৎসরের অর্থাৎ পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরের জন্য বরাদ্দ করা প্রকৃত ব্যয় অপেক্ষাও এক শত কোটি টাকা এবং পরিকল্পনার প্রথম বৎসরের জন্য বরাদ্দ করা প্রকৃত

ব্যয় অপেক্ষা দুই শত কোটি টাকা অধিক। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে।

জানা গিয়াছে যে আগামী আর্থিক বৎসরের ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণের সময়ে যাহাতে বরাদ্দ করা সমগ্র অর্থ ব্যয়িত হয় এবং কোন অর্থ অব্যয়িত না থাকে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য যত্ন লওয়া হইয়াছে। আগামী আর্থিক বৎসরে কতকগুলি অপরিহার্য কারণে ৫০ কোটি টাকা কম ব্যয় হইবে বলিয়া ধরিলেও, ভারত দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে মোটামুটি ২৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করিবে। যদি সরকারী ক্ষেত্রে মূল পরিকল্পনায় নির্ধারিত ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হয়, তাহা হইলে পরিকল্পনার শেষ দুই বৎসরে অবশিষ্ট ২৩০০ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইবে।

এখানকার কর্তৃপক্ষের নিশ্চিত বিশ্বাস, যদি পরিকল্পনাসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যায় দেশে খাদ্য উৎপাদন ও সঞ্চয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং মূল্য বৃদ্ধি দাবাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে এই পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা যাইবে। তাঁহারা বলেন যে, পরিকল্পনার সাফল্য খাদ্য ও সঞ্চয় ক্ষেত্রের সাফল্যের উপর নির্ভর করে। তাঁহারা আরও বলেন যে, যদি প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা নাও পাওয়া যায় এবং কয়েকটি পরিকল্পনা ছাটাই করিতে হয়, তাহা হইলেও পরিকল্পনার শিক্ষা স্বাস্থ্য, গৃহ সংস্থান প্রভৃতি সমাজ সেবামূলক স্কিমসমূহ ছাঁটাই করা হইবে না। কারণ এই সমস্ত স্কিমের জন্য বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন নগণ্য।

মুদ্রা স্ফীতি ও বৈদেশিক মুদ্রার সংস্থান যে পরিকল্পনার প্রগতির অন্তরায় আজ ইহা কর্তৃপক্ষ স্বীকার করিয়াছেন। রপ্তানী বৃদ্ধি পাইলে পরিকল্পনার প্রয়োজনে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হইত। মূল্য বৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব হইলে মুদ্রা স্ফীতি নিয়ন্ত্রণের সার্থকতা উপলব্ধি করা যাইত। ৯ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় বাণিজ্য শিল্প মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই রপ্তানী উপদেষ্টা পরিষদে বলেন যে সকল দিক দিয়াই, বিশেষ করিয়া বিদেশী মুদ্রা অর্জনের প্রধান দুইটি পণ্য চা ও পাটের ক্ষেত্রে, রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে।

শ্রী দেশাই বলেন যে, ১৯৫৬ সালে রপ্তানি মারফৎ আয় হইয়াছিল ৬১৯ কোটি টাকা। ১৯৫৭ সালের পুরা হিসাব পাওয়া না গেলেও এই বৎসরের আয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের বেশী হইবে না বলিয়াই মনে হয়।

সুতরাং নিয়ন্ত্রণ চলিতে থাকিবে এবং রপ্তানী যদি বৃদ্ধি না পায়, তবে তো বৈদেশিক মুদ্রা সংকটের সমাধান সুদূর পরাহত। অবশ্য জার্মানী ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে বেশ কিছু টাকা ঋণ হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' এই নীতি দীর্ঘকাল চলিতে থাকিলে ভারতের অর্থনৈতিক মর্যাদা কতখানি ক্ষুণ্ণ হইবে, তাহাও কর্তৃপক্ষের আজ চিন্তা করা প্রয়োজন। পরিকল্পনার সর্বাপেক্ষা অন্তরায় 'Magnitude of leakage'! ইহা বন্ধ করিতে না পারিলে পরিকল্পনার রূপায়ণ সার্থক হইবে না।

যুক্তরাষ্ট্রের বদান্যতা

সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে ভারতবর্ষ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সূত্র হইতে ৫০ কোটি হইতে ৬০ কোটি ডলার পাইতে চাহে। মার্কিণ সরকার ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রস্তাবে তন্মধ্যে প্রায় ৪০ কোটি ডলারই দেওয়া হইতেছে।

কলিকাতা ও মাদ্রাজ বন্দর উন্নয়ন—কর্তৃপক্ষ মহলের সংবাদে প্রকাশ, বিশ্ব ব্যাঙ্ক চলতি বৎসরের প্রথম কিস্তিতে কলিকাতা ও মাদ্রাজ বন্দরের উন্নয়নের জন্য অর্থ দিবেন। পরিবহনই ভারতের মুখ্য সমস্যা বলিয়া ব্যাঙ্ক মনে করেন। ইতঃপূর্বে ভারতের রেলপথসমূহের জন্য ঋণ দেওয়া হইয়াছে, এখন বন্দরের জন্য দেওয়া হইতেছে। এপ্রিল মে মাস নাগাদ বিদ্যুৎ শক্তি প্রসারের জন্য অর্থ দেওয়া হইবে। ইতিপূর্বে মার্কিণ সরকারের বিভিন্ন তহবিল হইতে ভারত বর্ষকে ২১ কোটি ডলার দিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে।

জাপানের উদারতা

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দ্রুত রূপায়ণের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ও জাপান সরকারের মধ্যে যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে জাপান ভারতকে ১৮ বিলিয়ান ধার দিবে। অর্থাৎ ১৮০ কোটি ইয়েনের ভারতীয় টাকার হিসাবে মূল্য দাঁড়াইতেছে মাত্র ২ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা হওয়া আবশ্যক। বাণিজ্য চুক্তির বিষয়সমূহের মধ্যে বাণিজ্য-শুল্ক, আমদানী ও রপ্তানী, বিদেশী মুদ্রা লেনদেন, পরস্পরের অধিবাসীদের আগমন, অবস্থান ভ্রমণ ও বাস, সর্বপ্রকার ব্যবসায় ও পেশামূলক কার্যকলাপ, জাহাজযোগে মাল বহন ও জাহাজ চলাচল প্রভৃতি রহিয়াছে। যাহাতে ভারত সরকার কিংবা ভারত সরকারের সুপারিশ প্রাপ্ত পক্ষসমূহ জাপান হইতে পণ্য ক্রয় করিতে পারেন, তজ্জন্য জাপানের এক্সপোর্ট ও ইম্পোর্ট ব্যাঙ্কের মারফত এই অর্থ দেওয়া হইবে।

খাদ্যশস্য তদন্ত কমিটির সুপারিশের প্রতি সরকারের গড়িমসি

সম্প্রতি কলিকাতায় এক সাক্ষাৎকারকালে খাদ্যশস্য তদন্ত কমিটির ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান শ্রীঅশোক মেহতা আক্ষেপের সহিত বলেন যে, খাদ্যশস্যের বাজার এবং মূল্যের স্থিরতা সম্পর্কে উক্ত কমিটির দুইটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশের প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে না। তিনি বলেন যে, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর কমিটি এবং সরকার যে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কিন্তু বাজারে বিক্রয়ের সুযোগ সুবিধার উন্নয়নের চেষ্টা করাও সমানভাবে প্রয়োজন।

শ্রীমেহতা আরও বলেন যে, সহরগুলিতে অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ঐ সকল অঞ্চলে মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধির ফলে নানারূপ অসুবিধা দেখা দিতেছে। বাজার এবং মূল্যের স্থিরতা সম্পর্কে উক্ত কমিটি যে দুইটি বোর্ডের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সেই প্রস্তাব সেইজন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন যে, উক্ত কমিটির হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, কয়েক কোটি অধিবাসী তথাকথিত সমস্যা পীড়িত অঞ্চলে বাস করিতেছে। ঐ সকল অঞ্চল সম্পর্কে ব্যাপক তদন্ত করা এবং একটি উপযুক্ত নীতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সরকারের এ বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন।

খাদ্যের উৎপাদন কিছুটা বৃদ্ধি পাইলেই দেশের খাদ্য সমস্যা মিটিবে বলিয়া শ্রীমেহতা মনে করেন না। তিনি বলেন, নানা কারণে খাদ্যের অতিরিক্ত উৎপাদন সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা টানা যায় না। জনসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং দেশের অধিবাসীদের মধ্যে ক্ষুধার অতৃপ্তি

রহিয়াছে। সুতরাং জনসাধারণের জীবনধারণের মানের উন্নতির সহিত খাদ্যশস্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে। তিনি আরও বলেন যে, ক্ষেত মজুরের বার্ষিক আয় যদি ৩৫০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে খাদ্যশস্যের চাহিদা চল্লিশ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া এক হিসাব করা হইয়াছে। ভারতের সকল অধিবাসীকে কর্ম নিযুক্ত করা হইলে চাহিদা এক কোটি ২০ লক্ষ টন অর্থাৎ বর্তমান মোট উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে।

যদি খাদ্যশস্য তদন্ত কমিটির সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্য এই সুপারিশগুলি কার্যকরী করা। শ্রীঅশোক মেহতা এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি নিজেই উপরোক্ত অভিযোগগুলি আনিয়াছেন। যদি সুপারিশগুলি কার্যকরী করা না হয়; তবে তদন্ত কমিটি নিয়োগের কি প্রয়োজন ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার কি তাঁহার অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত হইবেন?

আর্থিক সংবাদ

ভারতে পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্যমান

ভারত সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে (১৯৫৩ সালের মার্চ পর্যন্ত এক বৎসর = ১০০) পণ্যদ্রব্যের যে পাইকারী মূল্যমান নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় উহা গত ২৫শে জানুয়ারী (১৯৫৮) পর্যন্ত এক সপ্তাহে শতকরা ·৩ করিয়া ১০৫·৬ হয়। পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহা ছিল ১০৫·৫ (সংশোধিত)। উহা একমাস ও এক বৎসর পূর্বের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ·৭ ও ২ কম। জানুয়ারী মাসের (১৯৫৮) গড় মূল্যমান ছিল ১০৫·৯। পূর্ববর্তী মাসে উহা ছিল ১০৭ এবং ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে উহা ছিল ১০৭·৩।

আলোচ্য সপ্তাহে দিল্লীতে গোল আলুর দাম শতকরা ১৭, ফরাক্কাবাদে শতকরা ৫, শিমোগায় চাউলের দাম দাম শতকরা ৮, নাগপুরে কমলালেবুর দাম শতকরা ৮ ও মাদ্রাজে শতকরা ৭, মাছের দাম শতকরা ৬, দুধের দাম শতকরা ৫ ও ডিমের দাম শতকরা ১ বাড়িয়া গেলেও, কলিকাতায়

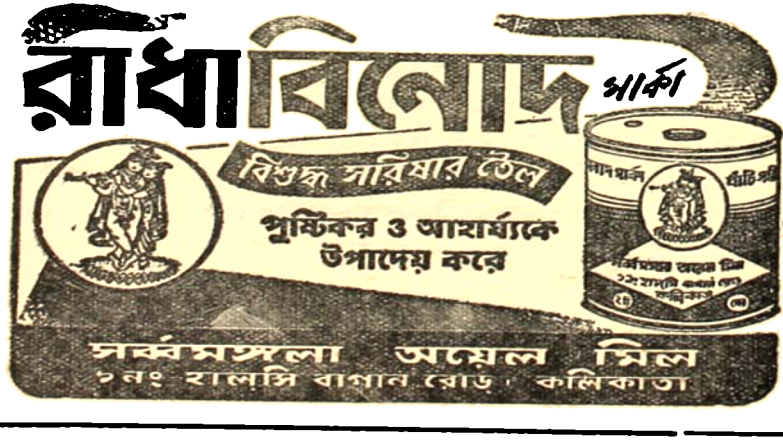

পেঁয়াজের দাম শতকরা ২৫, কানপুরে শতকরা ১৪, কলিকাতায় কমলালেবুর দাম শতকরা ৮, জগদ্দলপুর ও মারকারায় চাউলের দাম শতকরা ৭ করিয়া, ত্রিবান্দ্রমে শতকরা ৫, বোম্বাইতে মাংসের দাম্বু শতকরা ৭, আগ্রার বজরা, সরিষা তৈল ও মরিচের দাম শতকরা ৫ করিয়া, জোয়ার ও লঙ্কার দাম শতকরা ৪ করিয়া, ভুট্টা ও হলুদের দাম শতকরা ৩ করিয়া, যব, মশুর ও চীনাবাদাম তৈলের দাম শতকরা ২ করিয়া এবং গম, অড়হর, সরিষার তৈল, চা ও লবণের দাম শতকরা ১ করিয়া কমিয়া যাওয়ায় খাদ্যদ্রব্যের মূল্যমান শতকরা ·৩ কমিয়া ১০২·২ হইয়াছিল।

ঐ সপ্তাহে সিগারেটের দাম শতকরা ·৪ কমিয়া যাওয়ায় তামাকের মূল্যমান শতকরা ১ করিয়া ৯৪ হয়। আর রেড়ী তৈলের দাম শতকরা ২ ও কেরোসিনের দাম শতকরা ১ কমিয়া যাওয়ায় জ্বালানি, আলোক ও লুব্রিক্যাণ্টের মূল্যমান শতকরা ·২ কমিয়া ১১৪·২ হয়।

আলোচ্য সপ্তাহে কানপুরে তিসির দাম শতকরা ৫ ও কাঁসিতে তিলের দাম শতকরা ৫, রাই বীজের দাম শতকরা ৪, কার্পাস বীজের দাম শতকরা ২ ও কাঁচা কার্পাসের দাম শতকরা ১ কমিয়া যাওয়ায় শ্রমশিল্পের কাঁচা উপকরণের মূল্যমান শতকরা ·৬ কমিয়া ১১২·৭ হয়।

ঐ সপ্তাহে তিসি তৈলের দাম শতকরা ২ কমে এবং তামার দাম শতকরা ২, দস্তা ও নারিকেল দড়ির দাম শতকরা ১ করিয়া বাড়ে। ফলে আংশিক তৈয়ারী দ্রব্যের মূল্যমান শতকরা ·২ কমিয়া ১০৬·৬ হয়।

মাদ্রাজে তাঁতের লুঙ্গির দাম শতকরা ৫ এবং তৈল বীজের খইল, কাগজ ও নিউজপ্রিণ্টের দাম শতকরা ১ করিয়া কমিয়া যাওয়ায় পাকামালের মূল্যমান আলোচ্য সপ্তাহে শতকরা ·২ কমিয়া ১০৭·৬ হয়।

শ্রমিকদের জীবনধারণের ব্যয়মান—গত ১৯৪৯ সাল=১০০ এই ভিত্তিতে গত ডিসেম্বর মাসে (১৯৫১) শ্রমিকদের জীবনধারণের ব্যয়মান ভারতের ১২টি কেন্দ্রে কমিয়াছিল, একটি কেন্দ্রে বাড়িয়াছিল এবং তিনটি কেন্দ্রে অপরিবর্তিত ছিল।

ডিহরি-অন-শোন ও খড়্গপুরে শ্রমিকদের জীবনধারণের ব্যয়মান সবচেয়ে বেশী (৫ পয়েণ্ট) কমিয়া যথাক্রমে ১০৩ ও ১০৬ হইয়াছিল। ১৯৫৩ সাল=১০০ এই ভিত্তিতে সাংনায় ঐ ব্যয়মান ৪ পয়েণ্ট কমিয়া ৯৭, তিনসুকিয়া ও মার্কারায় ৩ পয়েণ্ট করিয়া কমিয়া ১১৭ ও ১১৫, দিল্লী, আজমীর, জামসেদপুর ও আকোলায় ২ পয়েণ্ট করিয়া কমিয়া ১১০, ১০০, ১২০ ও ৯৬, বহরমপুর, গৌহাটি ও লুধিয়ানায় ১ পয়েণ্ট করিয়া কমিয়া ১১২, ১০৫ ও ৯৪ হইয়াছিল।

এই সকল কেন্দ্রের মধ্যে ১১টি কেন্দ্রে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যমান কমিয়াছিল, ৩টি কেন্দ্রে জ্বালানি, আলোক ও বিবিধ দ্রব্যের মূল্যমান এবং ২টি কেন্দ্রে কাপড়চোপড়ের মূল্যমান করিয়াছিল।

কটকে খাদ্যদ্রব্য ও বিবিধ দ্রব্যের মূল্যমান বাড়িয়া যাওয়ায় ঐ ব্যয়মান ১ পয়েণ্ট বাড়িয়া ১১১ হয়। ১৯৬১ সালের আগষ্ট হইতে ১৯৫২ সালের জুলাই পর্যন্ত এক বৎসর=১০০ এই ভিত্তিতে শিলচর, জব্বলপুর ও বিওয়ারে শ্রমিকদের জীবনধারণের ব্যয়মান কিছু উঠানামা করিয়া যথাক্রমে ১০৪, ১০৯ ও ৯৪ হইয়াছিল।

ভারতে অভ্র উৎপাদন—গত ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিন মাসে ভারতে ১,৩০,৫৪৭ হন্দর অপরিশোধিত অভ্র উৎপাদিত হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরের ঐ তিন মাসে উৎপাদিত হইয়াছিল ১,২৫,৪৫৫ টন।

ভারতের মধ্যে বিহারে সবচেয়ে বেশী অভ্র (৬৯,৯৯০ হন্দর) উৎপাদিত হয়। রাজস্থান ও অন্ধ্রে উৎপাদিত হয় যথাক্রমে ৩৪,৮৪০ হন্দর ও ২৩,৫৬০ হন্দর।

১৯৫৭ সালের জানুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে এদেশে ৪,৪১,১৪২ হন্দর অপরিশোধিত অভ্র উৎপাদিত হইয়াছে। ১৯৫৬ সালের ঐ নয় মাসে ১৬,৮০৭ হন্দর কম অভ্র উৎপাদিত হইয়াছিল।

১৯৫৭ সালে অধিক মূল্যের খনিজদ্রব্য উৎপাদন—গত ১৯৫৭ সালের প্রথমার্ধে ভারতে ৫৭ কোটি টাকা মূল্যের খনিজদ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৫৬ সালের প্রথমার্ধে উৎপন্ন হইয়াছিল ৫০ কোটি টাকার দ্রব্য। আলোচ্য সময়ে অধিক মূল্যের খনিজ দ্রব্য উৎপাদনের কারণ হইল—ঐ সময়ে ক্রোমাইট, কয়লা, তাম্রপিণ্ড, সীসা ও দস্তা, লবণ বেশী পরিমাণে উৎপাদিত হইয়াছে এবং ম্যাঙ্গানিজ পিণ্ডের দাম বাড়িয়াছে।

ঐ সময়ে উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে কয়লার পরিমাণই বেশী—২ কোটি ১৬ লক্ষ টন। ১৯৫৬ সালের প্রথমার্ধের তুলনায় আলোচ্য সময়ে কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৯০ লক্ষ টন অধিক।

অন্য যে-সমস্ত খনিজদ্রব্য অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হইয়াছে সেগুলি হইতেছে ম্যাঙ্গানিজ পিণ্ড—৬ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা, লবণ ৬ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, স্বর্ণ ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, লৌহ ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, অভ্র ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, তাম্রপিণ্ড ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ও ইলমেনাইট ৮০ লক্ষ টাকা। ১৯৫৬ সালের প্রথমার্ধ=১০০ এই ভিত্তিতে আলোচ্য সময়ে খনিজ দ্রব্য উৎপাদনের সূচক সংখ্যা ১০৪·২।

ভারতের আভ্যন্তরীণ বারি-পরিবহন ব্যবস্থা

১। ভারতে বহুসংখ্যক ছোট বড় নদনদী রহিয়াছে। এগুলির কোন কোনটিতে বৎসরে বার মাস জল থাকে। কোন কোনটিতে বর্ষাকালে জল আসে। বারি সম্পদের দিক দিয়া ভারত ভাগ্যবান বলা যায়।

২। ভারতের বহুসংখ্যক নদনদীর যাত্র ৩ হাজার মাইল নদীপথে নৌ-চলাচল সম্ভব।

৩। নদীর এই সকল নাব্য অংশ ছাড়া ২৬৭০ মাইল নাব্য খাল আছে।

৪। সকলপ্রকার পরিবহন ব্যবস্থার মধ্যে বারি পরিবহনে সব চেয়ে কম ব্যয় হয়। রেলওয়ে ও সড়কের ব্যয়ের তুলনায় বারি সম্পদের জন্য মূলধন ও সংরক্ষণ ব্যয় অনেক কম। সে সব পণ্য আয়তনের প্রচুর সেগুলি, খাদ্যশস্য ও অন্যান্য খামারজাত দ্রব্য বহু পরিমাণে চলাচলের পক্ষে বারি পরিবহন অধিকতর উপযুক্ত।

৫। জলপথে কয়লা বেশ ভালভাবে চালান দেওয়া যায়।

৬। দেশের দ্রুত শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে এবং সড়ক ও রেল পরিবহন ব্যবস্থার উপর অত্যধিক চাপ পড়ায়, পরিবহনের বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে আভ্যন্তরীণ নদীনালার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ উপায় উদ্ভাবন করা দরকার। ৭। দেশের আভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল ব্যবস্থা উন্নয়নের ও সম্প্রসারণের সম্ভাবতা বিবেচনা করিবার জন্য পরিবহন মন্ত্রণালয় একটি আভ্যন্তরীণ বারি পরিবহন কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন।

'বর্তমান'
সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যামূলক শিক্ষণীয় পাক্ষিক পত্রিকা
প্রতি সংখ্যা—দুই আনা

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক নবগৌরাঙ্গ প্রেস, ১০৪, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিঃ, ৯ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

AN ACKNOWLEDGEMENT & ANNOUNCEMENT

The Management of ARTHIK PRASANGA have pleasure to announce the completion of the sixth year of publication and offer heartfelt thanks to all our readers, subscribers, contributors, advertisers and patrons for their cordial co-operation and patronage.

The Management of Arthik prasanga also regret to declare the increase of subscription rates from the beginning of the seventh year of its publication. Due to higher prices of printing paper, and other charges and requests from our readers to increase the volume, this slight increase has become inevitable. Management expect that this will be appreciated by the readers.

The rates of subscription for one year Rs. 9/-
" " " " " half year Rs. 5/-

For students :—

Annual subscription	Rs. 7/8/-	Special Number	Rs. 2/-
Half yearly "	Rs. 4/-	Single copy	As. -/12/-

The subscription year commences from Falgoon every year. For details please write to the Managing editor, Arthik Prasanga, 2, Private Road, Dum Dum, Calcutta-28.

The Management also think it fit to draw the attention of the readers and subscribers that Arthik Prasanga is posted on the 23rd of every English calender month. So any complaint about the non receipt of Arthik Prasanga must be made within 30 days from the date of posting. After that if any surplus copy is available, it will be sent free provided relevant postal charges at the bookpost rate is sent by the complainant.

Business Manager, Arthik Prasanga.

গার্হস্থ্য স্বয়ংক্রিয় সিনেমা প্রোজেক্টর

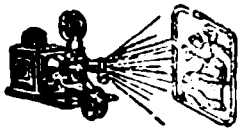

সত্যিকারের সিনেমা দেখিবার আনন্দ ঘরে বসিয়া উপভোগ করুন। এবং চিত্রগৃ (সিনেমা হলে) পর্দার বুকে যেমন আপনার প্রিয় তারকাদের চলাফেরা করিতে অভিনয় করিতে, নাচিতে এবং গান গাহিতে দেখেন ঘরে বসিয়াও পর্দার বুকে সে রকমই দেখিতে পাইবেন। টর্চের অথবা ইলেকট্রিক বাল্বের আলোর (এ-সি ডি-সি) সাহায্যে প্রতিফলিত হয়। ১০ ফুট পরিমিত রঙীন ও বিচিত্র ফিল্ম বিনামূল্যে দেওয়া হয়। অতি সুন্দর ভিলুয়া প্রোজেক্টারের মূল্য মাত্র ১৫৲। বিনামূল্যে বিস্তারিত ব্যবহার পদ্ধতি জানান হয় প্যাকিং ও ডাকমাশুল ৪৲। প্রতি টাকায় ৮ ফুট রঙীন ফিল্ম ও স্ক্রীনের মূল্য ৩৲ টাকা মাত্র।

স্বয়ংক্রিয় ছয়ঘড়া পিস্তল

কোন লাইসেন্সের আবশ্যক হয় না

আমেরিকার মডেলের ন্যায় আপনা হইতেই পর পর ছয়টী গুলি ছোড়া হয়, এইরূপ ডাবল সংযুক্ত পিস্তল। ইহার উচ্চ শব্দ এবং নির্গত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ডাকাতদিগকে এবং বন্য পশুদিগকে তাড়াইয়া দিতে সমর্থ হয়। সিনেমা-থিয়েটারের অভিনেতাদের অভিনয়ের পক্ষে ইহা সর্বোত্তম এবং উপযোগী, শত্রুর আক্রমণ প্রভৃতিতে এই পিস্তল আপনার সবচেয়ে উপযুক্ত সঙ্গী। বি. মূল্যে ২৫টি কার্তুজ দেওয়া হয়। মনোমত গ্যারান্টি দেওয়া হয়। মূল্য ৮৲ ডাকমাশুল ২৲। পিস্তলের খাপে মূল্য ৩৲। প্রতি টাকায় অতিরিক্ত ১০০ গুলি দেওয়া হয়।

দৈনন্দিন ব্যবহারোপযোগী পুস্তক সমূহ

ড্রইং এণ্ড পেন্টিংস—৩৲, পারফিউমারী মেকিং—৩৲, ইলেকট্রিক এণ্ড রেডিও গাইড—৩৲, দি আর্ট অফ ফটোগ্রাফি—৸৵০, টেলরিং এণ্ড কাটিং—৩৲। ১৪টি ভাষার মাষ্টার—৪৲, প্রতিটি পুস্তকের ডাক ব্যয়—৵০।

ANAND INDUSTRIES,
119, GOPALPURI ALIGARH U. P.

ডায়াপেপ্‌সিন

হজমের ব্যতিক্রম হইলে পাকস্থলীকে বেশী কাজ করান উচিত নহে। যাহাতে পাকস্থলী কিছু বিশ্রাম পায় সেরূপ কার্য্যই করা উচিত ডায়াপেপ্‌সিন সেই কার্য্যই করিবে। পাকস্থলীর কার্য্য কতক পরিমাণে ডায়াপেপ্‌সিন বহন করিবে এবং খাদ্যের সারাংশ লইয়া শরীরে বল আনিবে। শরীরে বল আসিলেই পাকস্থলীও বল লাভ করিবে ও তখন খাদ্য হজম করা আর তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইবে না। ডায়াপেপ্‌সিন ঠিক ঔষধ নহে, দুর্ব্বল পাকস্থলীর একটি প্রধান সহায়ক মাত্র।

ইউনিয়ন ড্রাগ
কলিকাতা

Who's Who of Arthik Prasanga.

PATRONS

Dr. P. N. Banerjea, Late Minto Professor of Economics, Calcutta University and formerly, member. Indian Legislative Council.

Sri Arun Kumar Sen, Principal, City College, Commerce Department. Member, Academic Council, Calcutta University.

Sri Bimal Chandra Sinha.

Sri S. C. Dey, President, Federations of Small & Medium Industries.

Sri B. K. Bhattacharya, Director, Union Drug Co. Ltd.

Sri S. Maitra, Managing Director, Sulekha works Ltd.

Prof. Kesabeshwar Basu, Member of the Senate, Calcutta University.

Sri T. Ghose, Director, Bureau of Industrial Statistics.

Dr. Dasrathi Banerjee, General Manager, National Rubber Manufacturers.

Sri J. P. Podder, Jaipuria Brothers Ltd.

EDITORIAL COUNCIL

Principal Sri Khagendranath Sen, President. Prof. Himanshu Roy.

Prof. Sris Chandra Das, Vice President.
" Prabhat Sarbadhikary.
" Ushanath Banerjee.
" Nirmalkumar Roy.
" Anath Bandhu Dutta
Sri Suresh Prasad Neogy
" Hemaranjan Basu.
" P. Agarwala.

Prof. D. Mukherjea, Editor.

Associated Editors.

Sri Achal Bandopadhyay. Sri Sukendu Bikas Dey

ADVISORY BOARD

Prof. Phaindranath Bhattacharjee, Surendranath College, Com. Dept.
" Rabindranath Sengupta, City College & Calcutta University.
" Santilal Mukherjee, City College.
" Amiya Banerjee, City College.
" Jitendra Krishna Mitra, Calcutta University.
" Ajit Kumar Das, City College & U. P. A.
" Lalit Kumar Mitra, City & Belur College.
" Shyamsundar Banerjee, Vidyasagar College.
" Sachhidananda Ghose, Scotish Church College.
" Sudhir Kumar Mukherjee, City College.
" Sudin Bhattacharya, Victoria & City College.
" Arun Banerjee, City & Scotish Church College.
" D. P. Choudhuri, City College.
" Benoy Sarker, City College.
" Kastur Chand Lalwani, Institute of Technology, Kharagpur.
" Swadesh Bhusan Bhuniya, City College.
Sri Soroj Roy, Agent, Hind Bank.
" Prakiti Ranjan Bhadhuri.
" Radindra Nath Bhattacharya Asst. Editor, Municipal Gazette.
" Abhas Dasgupta, Formerly of Commercial Section, Jugantar.
" B. N. Ghosal, Banerjea & Co.
" Gour Bhattacharya —Advertising Organiser.

Hony Auditors : M/s. Ghose Nandy & Co.

REGISTERED No. C 3462

আদর্শ পথ্য, পানীয় ও খাদ্য

লিলি বার্লি

সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ

স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত

লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

একাধারে
পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি

বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর
সকল ঋতুতে সমান উপযোগী

লিলি বার্লি মিলস্ লিঃ, কলিকাতা - ৪

REGISTERED No. C 3462

ভারতের গৌরব

হচ্ছে
তার
ঐতিহ্য
সংস্কৃতি
ও
সাধনা

লিলি বিস্কুট

এর দেশব্যাপী গৌরবের মূলে
বর্ত্তমান উহাদের অপূর্ব্বত্ব রয়

লিলি বিস্কুট কোং লিঃ কলিকাতা-৪